লিণ্ডবার্গ

নারায়ণ সান্যাল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

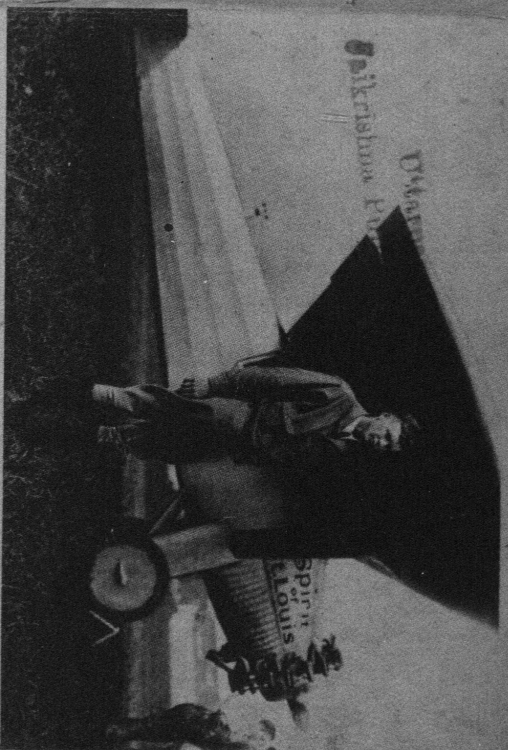
প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

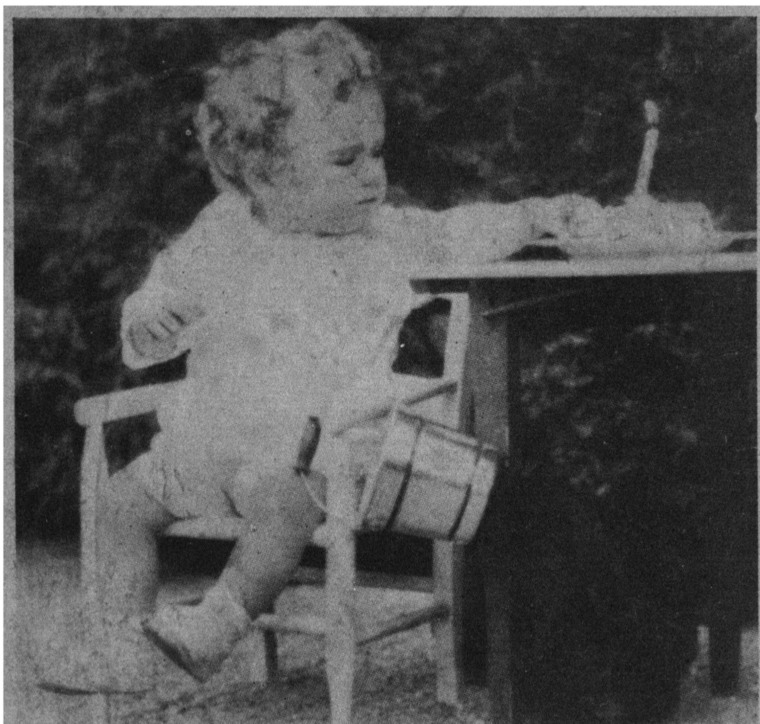
অনুজপ্রতিম

কবি শ্রীসুররজিৎ ঘোষকে—

'হোপওয়েল-ভিলা'—যে-বাড়ি থেকে খোকন চুরি যায়।

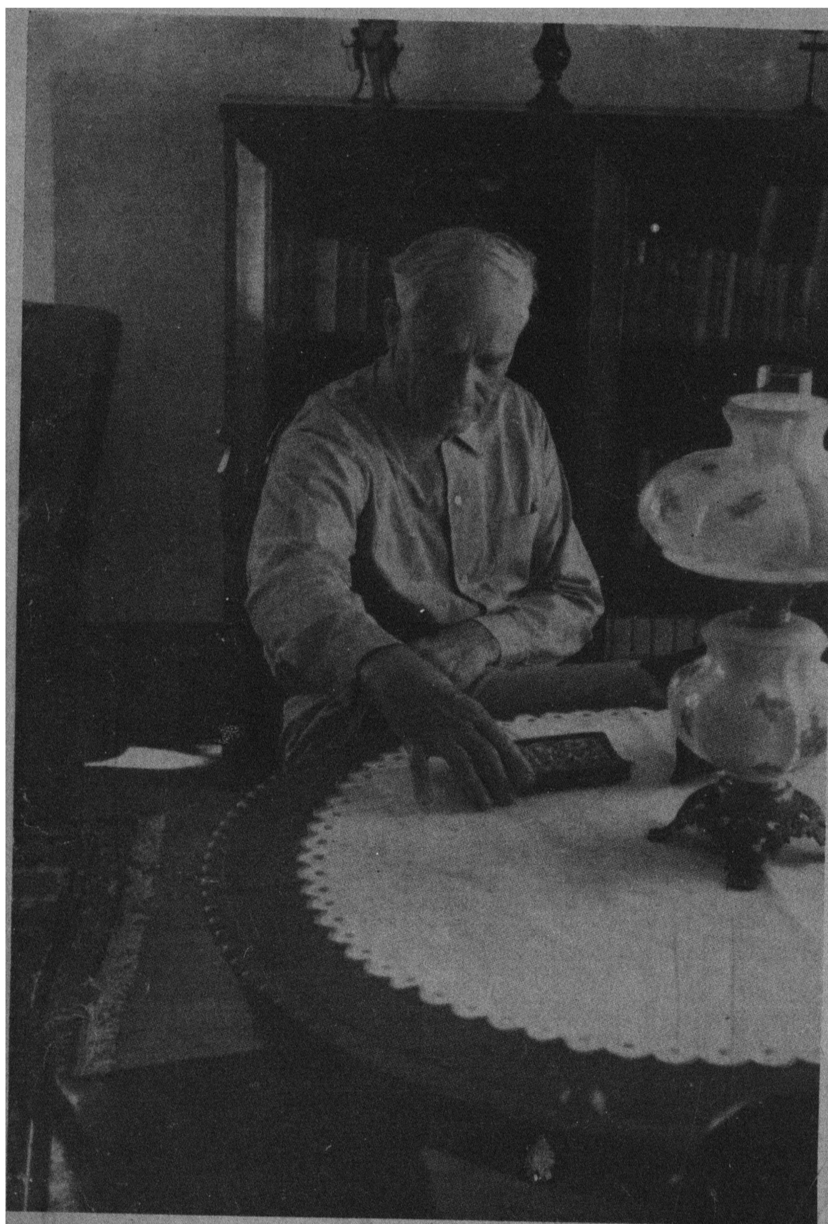


'স্পিরিট-অফ-সেণ্ট লুই'-এর
সামনে লিণ্ডি—১৯২৭



প্রথম জন্মদিনে তোলা খোকনের ছবি।

সিনিয়ার ও জুনিয়ার লিণ্ডবার্গ।



'লিণ্ডবার্গ স্মৃতিমন্দিরে' বৃদ্ধবয়সে কর্নেল লিণ্ডবার্গ তাঁর বাল্যস্মৃতিগুলি দেখছেন।

॥ এক ॥

আসন্ন বসন্তের যেন প্রথম কুহুধ্বনি !

বসন্তকাল সত্যই আসন্ন, কিন্তু শব্দটা কুহুধ্বনির মত মধুর নয়, বরং কেকারবের মত কর্কশ। মোটরের হুটার। জন রিভার্ড একটু অবাক হয়—টুরিস্ট সিজন এখনও শুরু হয়নি—এ মরশুমের প্রথম আগন্তুক বোধহয় এল। রিভার্ড উঠে যায় দ্বিতলের ব্যালকনিতে, দেখে নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটা টু-সীটার টুরিস্ট-কার। দুজনই যাত্রী, তবে যুগলে নয় ; দুটিই পুরুষ।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি। মিনেসোটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির স্থানীয় ম্যানেজার জন টি. রিভার্ড নেমে আসে এক তলায়। সদর দরজা খুলে গাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে টুরিস্ট দুজন ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন। একজন প্রৌঢ়, অপরজন বৃদ্ধ। প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু-পা এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন রিভার্ড-এর সঙ্গে। বললেন, সুপ্রভাত। আমার নাম অ্যাল্ডেন হুইটম্যান, নিউ-ইয়র্ক টাইমস্-এর রিপোর্টার। আপনার অসুবিধা না হলে লিণ্ডবার্গ-এস্টেটটা একটু ঘুরে দেখতে চাই—

: শ্যিওর ! এ বছরের আপনারাই প্রথম যাত্রী। সুতরাং সুস্বাগতম্ ! দেখুন, ঘুরে দেখুন। পত্রিকায় প্রবন্ধটা যখন লিখবেন তখন অধমের নামটাও উল্লেখ করতে পারেন। আমি হিস্টরিক সাইটস্ ডিভিসনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার জন. টি. রিভার্ড।

: ডিলাইটেড ট মীট ইউ মিস্টার রিভার্ড। আসুন আমার বন্ধুটির সঙ্গেও আপনার পরিচয় করিয়ে দিই—

কিন্তু কোথায় বন্ধু? ওর সঙ্গী সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে গজ-দশেক এগিয়ে গেছেন, একটা ঝোপের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসেছেন এবং টেলি-ফোটো লেন্সের সাহায্যে পাইন গাছের মগডালে-বসা একটা হুপিকে বধ করছেন! তাঁর গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট—এই শীতেও কোট নেই—হাতে ক্যামেরা ছাড়াও কাঁধে একটি বাইনোকুলার ঝুলছে। বছর সত্তর বয়স, চোখে চশমা নেই কিন্তু—টাকও নেই, একমাথা ফেনশুভ্র কেশ।

রিভার্ড হাসতে হাসতে বলে, ওঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নিউ-ইয়র্ক টাইমস্‌-এর রিপোর্টার যে বিনা ক্যামেরাম্যান লিণ্ডবার্গ-ভিলায় আসবেন না এটুকু অনুমান করা শক্ত নয়।

হুপিটাকে কালার্ড স্লাইডে বন্দী করা শেষ হয়েছে। বৃদ্ধ ফিরে দাঁড়ালেন। হুইটম্যান কিছু বলার আগেই বলে ওঠেন, সেজন্য আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে পারছি না কিন্তু মিস্টার রিভার্ড। আমার পরিচয় আমি দু-কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছি!

রিভার্ড বলে, কোনটা আগে দেখবেন বলুন? বাগান না বাড়ি? বাড়িটা তালাবন্ধ আছে। আগে যদি সেটাই দেখতে চান তাহলে দরজা খুলে দিই। আর যদি বাগানটা এক চক্কর ঘুরে আসতে চান—

: বাগানটা কত বড়?—প্রশ্ন করেন হুইটম্যান।

: একশ' দশ একর। সবটা ঘুরে দেখতে সময় লাগবে···

: কী আছে দ্রষ্টব্য, ঐ বাগানে?

একটু দার্শনিকের মত শোনালো রিভার্ড-এর উত্তরটা, বলতে পারেন কিছুই নেই, লিণ্ডবার্গের স্মৃতি ছাড়া। শিশু লিণ্ডবার্গ, বালক লিণ্ডবার্গ, কিশোর লিণ্ডবার্গের দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে তবে দেখতে পাবেন অসীম সৌন্দর্য! ওখান থেকে মিসিসিপি নদীর দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব! একটা কথা—বাগানটা ষাট-সত্তর বছর আগে যা ছিল হুবহু তাই রাখবারই চেষ্টা করেছি আমরা। যেখানে যে গাছ মরে গেছে,

সেখানে ঠিক সেই জাতের গাছ রোপণ করেছি। যেখানে যতটা আগাছা ছিল, সেখানে ঠিক ততটা আগাছাই সযত্নে জিইয়ে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ বাগানটাকে কৃত্রিমভাবে সাজানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্য—দর্শক যেন এখানে এসে সেই পরিবেশটিই খুঁজে পায় যে পরিবেশে চার্লস্ লিণ্ডবার্গ জুনিয়ার তাঁর বাল্যকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন ; অর্থাৎ···

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলেন, একটা কথা ! বারে বারে লিণ্ডবার্গ দ্য জুনিয়ারের প্রসঙ্গ উঠে পড়ছে কেন ? এ স্মৃতি-মন্দির তো তার বাবার ?

: তা হোক ; কিন্তু পুত্রের পরিচয়েই তো পিতার খ্যাতি !

: আই বেগ টু ডিফার ! আমি তো সিনিয়ার লিণ্ডবার্গকেই চিনি —তিনি ছিলেন মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত একজন বিখ্যাত কংগ্রেস-ম্যান ! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাতে আমেরিকা জড়িয়ে না পড়ে এজন্য জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তিনি···

এবার তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ রিভার্ড বলে ওঠে, আর জুনিয়ার লিণ্ডবার্গের নামই শোনেন নি বোধকরি ?

: না ! কী ছিল সে ছোকরা ?

: ছোকরা নয় ! তিনি প্রায় আপনারই বয়সী !

: বেঁচে আছে ?

: আছেন ! কোথায় আছেন তা অবশ্য জানি না। শুনেছি বর্তমানে হনলুলুর কাছাকাছি।

: কিন্তু কীজন্য বিখ্যাত সে ?

রিভার্ড এ কথার জবাব দেয় না। হুইটম্যানের দিকে ফিরে বলে, মাপ করবেন, আপনিও কি চার্লস্ লিণ্ডবার্গ দ্য জুনিয়ারের নাম শোনেন নি ?

হুইটম্যান অপাঙ্গে একবার দেখে নেয় তার সহযাত্রীর দিকে। বলে, আমি রিপোর্টার। অমন অদ্ভুত কথা আমি কেন বলব ? আর

লিণ্ডবার্গের কীর্তি-কাহিনী জানা না থাকলে এখানে আসবই বা কেন বলুন ?

একটু শাস্ত হয় রিভার্ড। বৃদ্ধ ক্যামেরাম্যানের দিকে ফিরে বলে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, অ্যাডমিরাল পীয়ারী, এডমণ্ড হিলারী কিংবা নীল আর্মস্ট্রং-এর নাম শুনেছেন ?

রীতিমত তিরস্কার। বৃদ্ধ কিন্তু অপমানিত হয়েছেন বলে মনে হল না। বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে ! বছর পঁয়তাল্লিশ আগে ঐ নামের একজন ছোকরা বৈজ্ঞানিক কোথায় যেন উড়ে গিয়েছিল···

: 'কোথায় যেন উড়ে গিয়েছিল' নয়, তিনি প্রথম, একা, অতলাস্তিক অতিক্রম করেছিলেন—১৯২৭ সালে !

: এতক্ষণে মনে পড়েছে।

রিভার্ড তখন মনে মনে ভাবছে, সে যদি নিউইয়র্ক-টাইমস্ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হত তাহলে ঐ নির্বোধ ক্যামেরাম্যানটিকে ডিসচার্জ করত। হোক ক্যামেরাম্যান, পত্রিকা অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মী চার্লস্. এ. লিণ্ডবার্গের নাম জানবে না এটা বরদাস্ত করা যায় না। রিভার্ডকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশের দশকে চার্লস্ লিণ্ডবার্গ ছিলেন পঞ্চাশের দশকে হিলারী অথবা ষাটের দশকে নীল আর্মস্ট্রং-এর মতই বিশ্ববিখ্যাত। শুধু তাই নয়, তার পরের চল্লিশ বছরে তাঁর নাম অন্তত হাজার বার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। নানা কারণে। বেচারী রিভার্ড স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বৃদ্ধের অজ্ঞতা সম্পূর্ণ একটা অভিনয়—তাঁর কৌতুকপ্রবণতার আর একটা পরিচয়।

এতক্ষণে ওঁরা পৌঁছেছেন লিণ্ডবার্গ-ভিলায়।

বিজলিবাতি নেই। টেলিফোন নেই। বৈঠকখানায় সাবেকী আসবাবপত্র। দেওয়ালে কয়েকটি গ্রুপ ফটো। একটি তৈলচিত্র। ডাইনিং 'হলে' টেবিলে ছুরি কাঁটা-প্লেট সাজানো রয়েছে—যেন এখনই আহার্য পরিবেশিত হবে। হুইটম্যান টেবিল থেকে চীনামাটির একটি

প্লেট তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। রিভার্ড বললে,—এই 'ডিনার-সেট'টা সিনিয়ার লিণ্ডবার্গ কিনেছিলেন তাঁদের হনিমুনের সময়, সানফ্রান্সিস্কোতে।

রান্নাঘরে এখনও আছে সেই আদিম যুগের কাঠের উনান।

বসবার ঘরে গদিমোড়া একটি চেয়ার দেখিয়ে রিভার্ড বলল, এটি সিনিয়ার লিণ্ডবার্গ ওয়াশিংটনে খরিদ করেন, প্রথমবার নির্বাচিত হবার পরে। দ্বিতলে গৃহস্বামিনী ঈভাঞ্জেলিন লিণ্ডবার্গের শয়নকক্ষ। সেখানে অনেকগুলি পারিবারিক পোট্রেট। বাপের-মায়ের-খোকনের। তারপর ওরা এল বালক লিণ্ডির ঘরে। তার ছেলেবেলার বইপত্র টেবিলে সাজানো। 'হাত-দেওয়া-বারণ' বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য করে রিভার্ড নিউইয়র্ক টাইমস্-এর রিপোর্টারের হাতে তুলে দিল কিছু খাতা। বেচারী সত্যই শ্রদ্ধা করে লিণ্ডবার্গকে। হিরো ওয়ার্শিপ! সে আন্তরিকভাবে চায়—এ সব বিবরণ ফলাও করে ছাপা হোক। হুইটম্যান একটি স্কেচবই বাড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ ক্যামেরাম্যানের দিকে। বলে, ফটো নেবে নাকি?

বৃদ্ধ জবাব দেয় না। পাতা উল্টে স্কেচ খাতাটা দেখে। ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে যথাস্থানে রেখে দেয়।

টেবিলে বালক লিণ্ডবার্গের অনেক স্মৃতিচিহ্ন—টয় সোলজার্স, ব্যাট-বল, ছবির বই, এয়ারগান। দেওয়ালে টাঙানো আছে একটি লাইসেন্স—বন্দুকের, মালিক লিণ্ডবার্গ জুনিয়ার।

গ্যারেজে পাশাপাশি দুখানি গাড়ি—ফ্যামেলি কার। প্রাচীনতরটি স্যাক্সন সিক্স ১৯১৬ মডেলের। রিভার্ড বলে, একটা কথা। এই যে গাড়িটা দেখছেন, এর এঞ্জিন এবং বডিটা 'অরিজিনাল' বটে কিন্তু আউটফিট,—অর্থাৎ গদি, সীট, হুড সব নতুন!

: কেন?

: লিণ্ডবার্গের ঐতিহাসিক অভিযান যখন সাফল্যমণ্ডিত হল তখন, জানেন তো নিউইয়র্কে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক

জমায়েত হয়েছিল! ব্রডওয়ে দিয়ে যখন তাঁকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন পার্শ্ববর্তী বাড়ির জানলা থেকে তাঁর উপর যে রঙিন কাগজের কুচি আর পুষ্প বর্ষণ করা হয় তার ওজন প্রায় দু-হাজার টন! এমন জাতের অভিনন্দন কে কবে পেয়েছে বলুন? সেই জনতার একটা অংশ এই স্যাক্সন সিক্স গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে স্রেফ লুট করে। গদি-পর্দা-হুড সব ছিঁড়ে নিয়ে যায় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখতে। আমরা বাধ্য হয়ে পুরানো ফটোগ্রাফের সঙ্গে মিলিয়ে এটাকে মেরামত করেছি।

সমস্ত বাড়িটাই ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিভার্ড বলে, এবার আপনারা বাগানটা বরং ঘুরে দেখুন। ভারি সুন্দর দৃশ্য—

বৃদ্ধ হঠাৎ বলে ওঠেন, হুইটম্যান, আজ রাতটা এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?

হুইটম্যান তৎক্ষণাৎ বলে, আমার আপত্তি নেই। তোমার যেমন অভিরুচি।

রিভার্ডও সায় দেয়, হাতে সময় থাকলে একদিন কাটিয়ে যাওয়াই ভাল। এখান থেকে লিট্‌ল্ ফল্‌স্ শহর আধ ঘণ্টার ড্রাইভ। সেখানে ভাল মোটেল আছে।

বৃদ্ধ তখন তাঁর ক্যামেরা ফোকাস করছিলেন। ভিয়্যু ফাইণ্ডারে নিবদ্ধদৃষ্টি অবস্থাতেই বলে ওঠেন, পাগল! লিট্‌স্ ফল্‌সে যাব কোন দুঃখে। থাকলে এখানেই থাকব রাতটা! কি বল হুইটম্যান?

হুইটম্যান জবাব দেওয়ার আগেই জন রিভার্ড বলে ওঠে, এখানে? এখানে তো কোন হোটেল বা মোটেল নেই—

: না না! এখানে মানে এই বাড়িতে—

রিভার্ড বুঝে উঠতে পারে না—বৃদ্ধ বদ্ধ উন্মাদ কি না। এ বাড়িটা জাতীয় সম্পদ—লিণ্ডবার্গ স্মৃতি-মন্দির! লোকটা বলে কি? এখানে থাকতে চায়!

তার চেয়েও অবাক কাণ্ড হুইটম্যান বলেন, তুমি থাকতে চাও তো থাক, আমি বাপু লিট্‌ল্ ফল্‌সের কোন হোটেলে রাত কাটাবো!

বৃদ্ধ এক গাল হেসে বলেন, আমিও সেটাই চাই। তোমাকে কেন বিড়ম্বনায় ফেল্‌ব? আমি একাই থাকব এখানে—

হুইটম্যান পুনরুক্তি করে, তোমার যেমন অভিরুচি!

এতক্ষণে রাগ চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে জন রিভার্ড-এর। গম্ভীরভাবে বলে, এক্সকিউজ মি, মিস্টার হুইটম্যান, আপনারা ভুলে যাচ্ছেন···

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রিপোর্টার হুইটম্যান বলে, জানি! কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি। আমার বন্ধুর পুরো পরিচয়টা আপনাকে দিতে পারিনি। সেটা এবার দিই—এঁর পুরো নাম: ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ। এঁকে এক রাত এ বাড়িতে থাকতে দিলে হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি আপত্তি করবে না!

॥ দুই ॥

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেই একটি রাত চার্লস্ লিণ্ডবার্গ কাটিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাল্য-স্মৃতি বিজড়িত লিণ্ডবার্গ-ভিলায়। শেষবারের মত। মৃত্যুর তিন বছর আগে। তাঁর জীবনীকার লিওনার্ড মস্‌লে তারিখটা উল্লেখ করেননি। সেটা যদি চৌঠা ফেব্রুয়ারী হয়, তাহলে বলা যেতে পারে সে রাত্রিটা তাঁর উনসত্তরতম জন্মদিন। না, এ বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। জন্মেছিলেন দাদামশাইয়ের বাড়িতে, ডেট্রয়েটে—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ তারিখে।

ক্যামেরাধারী বৃদ্ধের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল জন রিভার্ড—এ কথা বলাই বাহুল্য। কী-ভাবে তাঁর পরিচর্যা করবে ভেবে পায়নি। সে রাত্রে আগন্তুক দুজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিল—কিন্তু সায়মাশ-গ্রহণ তার কোয়াটার্সে হয়নি। অর্ধশতাব্দীর পরে মাত্র একবারের জন্যে লিণ্ডবার্গ-ভিলায় ডাইনিং রুমে মোমবাতি জ্বালা হল : চানা-নক্সামণ্ডিত ডিনার-সেটে আহার্য পরিবেশিত হল—যে ডিনার সেট ওঁর বাবা কিনেছিলেন হনিমুন-ট্যুরে—সদ্যোপরিণীতা ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড লজ লিণ্ডবার্গকে দেওয়া প্রথম প্রণয়োপহার। 'ল্যাণ্ড লজ' ওঁর দাদামশায়ের উপাধি—লিণ্ডির মা তাঁর কুমারী-জীবনের পরিচয়টুকু চিরকাল নামের মাঝখানে বহন করতেন। নৈশাহার সমাপ্ত করে হুইটম্যান ফিরে গেল নিকটবর্তী শহরে—লিট্‌ল্ ফল্‌স্-এর কোনও মোটেলে রাত্রিবাস করতে। রিভার্ড ফিরে গেল তার কোয়াটার্সে। যাবার আগে বৃদ্ধকে বললে, আপনাকে স্যার, তাহলে দোতলার ঘরখানায় বিছানা পেতে দিই?

দোতলার ঘরখানা বলতে গৃহস্বামিনী ঈভাঞ্জেলিনের শয়নকক্ষ। লিণ্ডির খাটে শোওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—দৈর্ঘ্যে সেটি দীর্ঘদেহী

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে আশ্রয় দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়; বালক লিণ্ডির মাপে সেটি তৈরী।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বললেন, না। আমি এই এক তলাতেই শোব। ঐ রান্নাঘরের সামনে একফালি বারান্দাটায়। মেজেতেই শোব, আমার সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ আছে।

: এখানে? , মাটিতে?

: হ্যাঁ। চিন্তার কিছু নেই। ওখানে অনেক রাত কাটিয়েছি আমি। আমার অভ্যাস আছে—অসুবিধা হবে না।

চাক্ষুষ না দেখা থাকলেও একরোখা জেদী মানুষটাকে চিনতে বাকি নেই। রিভার্ড আর প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। তবু সৌজন্যবোধে বলে, তাহলে স্যার মেজেতে কিছু ম্যাট্রেস—মানে মোটা গদি পেতে দিতে বলি?

হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন, না। যেখানে যতটা আগাছা ছিল, সেখানে ততটাই আগাছা জিইয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। নয় কি?

রিভার্ড বুদ্ধিমান। বুঝতে পারে বৃদ্ধের ইচ্ছাটা কোন খাতে বইছে। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগেকার এক বিস্মৃতপ্রায় রাত্রির অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চান তিনি। মহাকালের অতলান্তিক বিস্মরণ সমুদ্রের বিস্তারকে অগ্রাহ্য করে একক বৈমানিকের এ এক উজানী উড্ডীয়ন।

রিভার্ড শুধু বলে, রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়বে জেনারেল। আমার বাসা থেকে তাহলে কিছু কম্বল পাঠিয়ে দিই?

: কেন? মায়ের ঘরে পূর্বদিকের ওয়াড্রবের উপর তাকে তো অনেকগুলো কম্বল ছিল—গ্রে রঙের; সেগুলো নেই?

রান্নাঘরের সামনে ঐ একফালি বারান্দায় রাতটা কাটিয়েছিলেন। মেজেতে স্লিপিং-ব্যাগ পেতে, এয়ার-পিলো মাথায়, গায়ে গ্রে-রঙের কম্বল চাপিয়ে। ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে ঘনিয়ে এল রাত। ঠিক এভাবে ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে এখানে রাত কাটাতো বালক লিণ্ডি। পাশে

শুয়ে থাকত ওর পোষা কুকুর 'ওয়াগুস্', মাথার কাছে টোটা-ভরা বন্দুক। বন্দুকটা উপহার পেয়েছিল দাদামশায়ের কাছ থেকে—পয়েন্ট টু-টু বোরের সিঙ্গল-সট্ একটা স্টিভেন্স্। ও যে এভাবে এখানে একা শুয়ে রাত জাগত তা ওর মা-ও টের পেত না। মাকে সেসব কথা বলত না লিণ্ডি। মা ভয় পাবে। হাজার হোক মেয়েছেলে তো! মাকে সে কোনদিনই বলেনি কী-ভাবে বিল টম্সন আর লিণ্ডি ডাকাতদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

উজান-উজান—আরও উজান! স্মৃতির শেষপ্রান্তে পৌছালে লিণ্ডবার্গ দেখতে পায় একটা জ্বলন্ত বাড়ি। দাউদাউ করে পুড়ে যাচ্ছে একটা লগ্-কেবিন। কতই বা বয়স তখন ওর? তিন কি চার। না তিনই;—কারণ ওদের সে বাড়িটা পুড়ে যায় ১৯০৫ সালে। এখনও—এই উনসত্তর বছর বয়সেও চোখ বুজলে ও দেখতে পায় সেই আগুনের লেলিহান শিখা—ওর মা ওকে বুকে জড়িয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে ছুটে পালাচ্ছে। হলপ করে বল্‌তে পারবে না সেটা ওর স্মৃতি, না-কি বারে বারে শুনে শুনে দৃশ্যটার একটা মনগড়া ছবি ওর মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে আছে। তিন বছর বয়সের স্মৃতি কি মানুষে মনে রাখতে পারে?

তার পরেই ওরা উঠে আসে এই লিণ্ডবার্গ-ভিলাতে। বাবা, মা, লিণ্ডি আর ওর বড় বোন। বড় বোন অবশ্য বৈমাত্রেয়। ওর বিমাতা মে লা ফণ্ড মারা যান ১৮৯৮ সালে। তার তিন বছর পরে ওর বাবা বিবাহ করেন ওর মাকে—ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড লজকে। ওর বাবা চার্লস অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ সিনিয়ার, ছিলেন আইনজীবী—সুইডেন থেকে এসেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ আমেরিকাতে। ঈভাঞ্জেলিনের সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক ছিল সতের বছরের। তখন বুঝতে পারেনি, বড় হয়ে বুঝেছে—কী একটা কারণে ওর বাবা মায়ে বনিবনাও হয়নি। বিবাহের পরের বছরই ওর জন্ম। ও মায়ের একমাত্র সন্তান। তার পরেই ওর বাবা ওয়াশিংটনে চলে যান। লিণ্ডি মানুষ হয়েছে শুধুমাত্র

তার মায়ের স্নেহচ্ছায়ায়। ন-মাসে ছ-মাসে, পরে দু-তিন বছর পর পর ওর বাবা বাড়ি আসতেন; কিন্তু সেটা শুধু সামাজিক কারণে। লোকে যেন এ নিয়ে পাঁচ কথা না বলে। ধর্মে ওঁরা রোমান ক্যাথালিক—বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নই ওঠে না। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে মায়ে-পোয়ে ট্রেনে চেপে পূবমুখো রওনা দিতেন—লিট্‌ল্‌ ফল্‌স্‌ থেকে শিকাগো হয়ে ডেট্রয়েটে, লিণ্ডির মামাবাড়ি। দিন পনের সেখানে কাটিয়ে ওঁরা যেতেন ওয়াশিংটনে—কংগ্রেসম্যান লিণ্ডবার্গ সিনিয়রের বাড়িতে শীতকালটা কাটাতে। তখন বুঝত না, পরে বড় হয়ে বুঝতে শিখেছে বাবা আর মা আলাদা ঘরে শুতেন—ওঁদের আন্তর বিচ্ছেদটা কোনদিনই মিটে যায়নি। ফেরার পথে আবার কিছুদিন ডেট্রয়েটে কাটিয়ে বসন্তের গোড়ার দিকে ওঁরা ফিরে আসতেন লিট্‌ল্‌ ফল্‌স্‌-এ—মিনেসোটা প্রদেশে, মিসিসিপি নদীর ধারের এই নির্জন লিণ্ডবার্গ-ভিলায়।

লিণ্ডির বাল্যকালের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আপনারা 'হাক্‌লবেরি ফিন' আর একবার পড়ে নিতে পারেন। তফাত এই—হাক্‌লবেরির পিছটান ছিল না, লিণ্ডির ছিল—মায়ের একজোড়া সতর্ক চোখ। স্বামীসুখবঞ্চিতা তিনি, তাই আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছিলেন একমাত্র সন্তানকে।

লিণ্ডির যখন দশবছর বয়স তখন 'ইণ্টারনাল-কম্বাসশন এঞ্জিন' ওর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ রেখাপাত করল। নামটা গালভারি হলেও ব্যাপারটা আজ অচেনা নয়—মোটর গাড়ি। ওর বাবা এসে হাজির হলেন একটি 'মডেল টি' ফোর্ড গাড়ি চেপে। সে জাতের গাড়ি হয়তো সকৌতুকে আপনারাও দেখেছেন 'ভিণ্টেজকার র‍্যালি'তে। লিণ্ডিও দেখেছিল, সকৌতুকে নয় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে। অবাক কাণ্ড! স্টার্ট দিলেই ঝকর্‌-ঝকর্‌ করে চার-চাকার গাড়িটা চলতে থাকে। ওর বাবা গাড়ি চালানো শিখেছিলেন, কিন্তু জুত করতে পারেন নি। ওর মা চেষ্টা করেও রপ্ত করতে পারলেন না। লিণ্ডি

গাড়িটার যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে বুঝে নিল সহজেই; কিন্তু মুশকিল হল অন্যত্র। সীটে বসলে বেচারী ক্লাচে পা পায় না। ছুটি কাটিয়ে ওয়াশিংটনে ফিরবার সময় ওর বাবা গাড়িটা লিণ্ডবার্গ-ভিলার গ্যারেজেই রেখে গেলেন। আপনারা বাড়ি তৈরী করে নাম দেন, সে আমলে গাড়ি কিনলেও লোকে নামকরণ করত। ওদের গাড়িটার নাম রাখা হল "মারিয়া"!

বললে বিশ্বাস করবেন না, রাতারাতি বালক লিণ্ডির কাঁধে চাপল এক ভূত—'নাইটহুড শিভালরি'-র দৈত্য! লেডি-ইন-ডিস্ট্রেস্, অর্থাৎ রাজকুমারী গ্যারেজ-দুর্গের বন্দীশালায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাকে উদ্ধার করতেই হবে! লিণ্ডির অক্লান্ত সাধনা অবিশ্বাস্য। রোজ ভোরবেলা উঠে সে নির্জন জঙ্গলে চলে যেত, ঠ্যাঙে দড়ি বাঁধত, দড়ির অপরপ্রান্ত বেঁধে দিত একটা গাছের গুঁড়িতে। তারপর লাগাতো টান! ওর ধারণা, এভাবে টানতে টানতেই ওর ঠ্যাঙজোড়া লম্বা হয়ে যাবে। কিলিয়ে যদি কাঁঠাল পাকানো যায়, তবে টেনে ঠ্যাঙ লম্বা করা যাবে না কেন?

তা সে যাই হোক, ঠ্যাঙ-টানা ব্যায়ামের গুণেই হোক অথবা বয়স বৃদ্ধির জন্যেই হোক, বছরখানেকের মধ্যে, অর্থাৎ ওর এগারো বছর বয়সে একদিন ওর চরণস্পর্শে ধন্য হল মারিয়ার ব্রেক-ক্লাচ্-অ্যাক্সিলেটর। গ্যারেজ থেকে ঠেলতে ঠেলতে বার করল গাড়িটা। বসল সীটে। চাবি ঘোরালো আইনমাফিক। তারপর অ্যাক্সিলেটারে চরণস্পর্শমাত্র পাষাণী অহল্যার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। কে বলবে 'মারিয়া' এক বন্দিনী রাজকুমারী নয়, একাদশবর্ষীয় লিণ্ডি নয় রাজপুত্র! দুজনের সে দুর্বার অভিসার দেখবার মত। পরিণত বয়সে লিণ্ডবার্গ তাঁর বাল্যের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার কিছুটা অনুবাদ শোনাই "১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে, গাড়ি চালানোটা অভ্যাস হয়ে গেলে মাকে নিয়ে প্রায়ই বার হয়ে পড়তাম সারাদিনের মত—কখনও ব্রেনার্ড, কখনও সেন্ট ক্লাউড, সোয়ানভিল, রয়ালটন,

ফোর্ট রিপ্‌লে—আশপাশের কোন নির্জন হ্রদ বা ঝরনার ধারে বসে মায়ে-পোয়ে পিকনিক সারতাম। কখনও হয়তো গাছতলায় মা বিশ্রাম নিত; তখন বন্দুক ঘাড়ে আমি বেলে-হাঁস শিকার করে ফিরতাম। টিপ আমার ভালই ছিল, খালি হাতে ফিরতে হত না বিশেষ। রাস্তাঘাট অধিকাংশই কাঁচা; কিন্তু মারিয়ার জানও ছিল কড়া। তাছাড়া 'মারিয়া' আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল—পারত-পক্ষে বিপদে ফেলত না।"

সে বছর সিনিয়র লিণ্ডবার্গ যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁকে অবাক হতে হল। স্টেশনে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে একাদশবর্ষীয় পুত্র। গাড়ি নিয়ে হাজির। স্টেশন থেকে লিণ্ডিই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল লিণ্ডবার্গ-ভিলায়। সেটা ছিল নির্বাচনের বছর—ওর বাবা নিজের নির্বাচনী এলাকায় এসেছিলেন বস্তুত প্রচারকার্যে। এতাবৎ-কাল ঘোড়ায় চেপে সেটা করতে হয়েছে। এবার বালক লিণ্ডি তার মারিয়াকে নিয়ে হামেহাল হাজির। প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন ওর বাবা, কিন্তু অচিরেই বালক লিণ্ডি প্রমাণ দিল সে শুধু কষ্টসহিষ্ণু নয়, সত্যই সুদক্ষ ড্রাইভার। দিবারাত্র সে বাবাকে নিয়ে ঘুরত সেই কয় মাস।

নির্বাচনের ব্যাপারটা লিণ্ডি ঠিক বুঝত না। ও বিষয়ে মাথাও ঘামাতো না। তবে কিছু কিছু তার মনে আছে। তার কারণ জটিল তথ্যটা ওর বাবা গাঁয়ের সাধারণ মানুষদের সরলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিচিত্র ভঙ্গিতে গল্প ফাঁদতেন। একটা কৌতুককর উদাহরণ দিই:

সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটি 'বিল' এনেছিলেন কংগ্রেসে, তার নাম "রেসিপ্রোকাল ট্রেড ট্রিটি উইথ ক্যানাডা" অর্থাৎ কানাডা-রাজ্যের সঙ্গে পারস্পরিক-সাহায্যের বাণিজ্য চুক্তি। ওর বাবা এ বিলের বিরোধী পক্ষ। তাঁর মতে এই পারস্পরিক-সাহায্য-প্ল্যানে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে—আমেরিকা এবং কানাডা। তার চেয়ে

যে-যার রাজ্যে ব্যবসা করুক। বিষয়টা জটিল। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ অর্থনীতির এসব কচকচি বুঝতে পারত না। একটি ঘরোয়া সভায় বিষয়টা সরল করে বোঝাতে ওর বাবা যে গল্পটা বলেছিলেন, সে গল্প আজ ষাট বছরেও ভোলেনি লিণ্ডি।

ওর বাবা বললেন, ব্যাপারটা কেমন জান? শোন বুঝিয়ে বলি:

একজন পর্যটক একবার একটি কৃষকের কাছে রাত্রের জন্য আশ্রয় চাইল। চাষী ভদ্রলোকের বাড়িতে মাত্র দুটি কামরা। একটায় সে শোয় তার যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে; পাশের ঘরে থাকে তার পাঁচ বছরের বাচ্চাটা। কৃষকটি বলল, আপনাকে তাহলে খোকনের ঘরে বিছানা পেতে দিই। ভিনদেশী অতিথি বললে, তা তো বটেই। যা হোক আহারাদি সেরে বাতি নিবিয়ে যে যার মত শুয়ে পড়ল। সারাদিন ধকল গেছে, অতিথি বিছানায় পড়েই ঘুমিয়ে কাদা। কিন্তু শেষ রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। একবার যে বাথরুমে যেতে হয়। সারাদিন যা জল খেয়েছে এবার তা উদর থেকে মুক্তি চাইছে। তখন মনে পড়ল, বাথরুমটা গৃহকর্তার শয়নকক্ষ সংলগ্ন। অর্থাৎ কৃষক-দম্পতির ঘরের ভিতর দিয়েই তাকে যেতে হবে। কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না। বাইরে এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, রাতটাও অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বাইরের দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়ারও উপায় নেই। অতিথি ঠাণ্ডা মাথায় এ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সমাধান দেখতে পেল সে! তার পাশের খাটে অঘোরে ঘুমাচ্ছে পাঁচ-বছরের খোকন! তার তো সাতখুন মাপ! অতিথি খুব সাবধানে খোকনকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল এবং নিজে শুয়ে পড়ল তার ছোট্ট খাটে! ব্যস! পাঁচ মিনিটেই কাজ সারা! সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান!

গল্প শুনে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে ওঁর নির্বাচক মণ্ডলী। মেয়েরাও হাসল, অট্টহাস্য নয়, রুমালে মুখ লুকিয়ে, পরস্পরের গা টেপাটেপি

করে। হাসল না শুধু লিণ্ডি—তার কান দুটো লাল হয়ে ওঠে বাপির ঐ অশ্লীল গল্পটা শুনে। স্টিয়ারিঙে হাত দিয়ে বসেছিল অদূরেই। কথাকোবিদ লিণ্ডবার্গ বললেন, এ কী! গল্পটা শেষ না হতেই আপনারা হাসছেন কেন?

সামনের সারির একজন বৃদ্ধ শ্রোতা বলে ওঠেন, মানে? গল্প এখনও শেষ হয়নি? আমরা ভেবেছি ভিনদেশী অতিথির তলপেটের মতো তোমার গল্পটাও পাঁচ মিনিটে সারা হয়ে গেছে!

: না। যায়নি। তারপর সেই অতিথি উঠে এলেন নিজের বিছানার কাছে। খোকনকে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিলেন তার ভেজা বিছানায়। আর আরাম করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েই দেখেন—এ ছ্যাছ্যাছ্যা! ঐ পাঁচ মিনিটেই খোকন তাঁর বিছানাটাকে একেবারে সপসপে করে ছেড়েছে!

আবার উঠল হাস্যরোল! এবার বালক লিণ্ডিও না হেসে থাকতে পারল না। ওর বাবা বললেন—একেই বলে 'পারস্পরিক-সাহায্য-প্ল্যান'—রেসিপ্রোকাল ট্রেড ট্রিটি! তোমরা যদি ভেবে থাক কানাডায় গিয়ে তোমাদের সমস্যার সমাধান করে আসবে, তবে জেনে রেখ ক্যানাডিয়ানরাও তোমাদের বিছানায় এসে—

সেবার নির্বাচনে তিনি আবার জিতলেন। খুশী হয়ে লিণ্ডিকে বললেন, অনেক খাটুনি গেছে তোর! বল কী প্রাইজ চাস্?

লিণ্ডি একগাল হেসে বলেছিল, আমার কিছু চাই না বাপি! তবে খাটুনি তো মারিয়ারও বড় কম যাইনি। ঘুরতে ঘুরতে বেচারীর হাড়-মাস কালি হয়ে গেছে। তুমি ওকে এক কোট রঙ করিয়ে দাও বরং, সেটাই আমার প্রাইজ!

একেই বলে—নাইটহুড শিভালরি!

১৯১৪ সাল। য়ুরোপখণ্ডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমেরিকায় তার ঢেউ এসে পৌঁছায় নি। কিন্তু ঐ বছরই, মনে আছে লিণ্ডির,

ওদের উপর পর পর কবার আক্রমণ হল। কে বা কারা ওদের উপর গুলিবর্ষণ করছে।

> "The first shooting incident I recall was a bullet whinning past our heads as my mother and I were standing on the north-side of our house. We immediately went inside. The shooting was obviously to scare and not to kill—almost certainly done for amusement—allthough a man walking along the road to the north of our farm was hit in the leg by a bullet." [যতদূর মনে পড়ে, প্রথমবার গুলিবর্ষণের সময় আমি আর মা বাড়ির উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম; হঠাৎ একটা বুলেট আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল। তৎক্ষণাৎ আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বেশ বোঝা গেল, উদ্দেশ্য হত্যা করা নয়, ভয় দেখানো—খুব সম্ভবত কোনও মস্তানি রসিকতা। যদিও সে বুলেটে আমাদের খামারবাড়ির উত্তর দিকের রাস্তায় একজন পথচারী পায়ে আঘাত পায়।]

: মা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। বাবা বাড়িতে থাকেন না। আমি আর মা—এতবড় বাড়ি আর বাগান। আমিই মাকে পরামর্শ দিলাম—এ-কথা বাপিকে জানানোর দরকার নেই। অতদূর থেকে তিনি আর কী ব্যবস্থা করবেন? মা বাধ্য হয়ে মেনে নিল। আমি ভাবতে বসলাম—কে এ কাণ্ডটা করছে? কেন করছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা কী-ভাবে এটা বন্ধ করা যায়। আমি আর তখন বাচ্চা নই—বারো বছর বয়েস আমার। চিন্তা করতে করতে কতকগুলি সূত্র আমার নজরে পড়ল। প্রথম কথা, আমার মা সুন্দরী, একা থাকেন। তিনি মিশুকে নন; হয়তো একা থাকেন বলেই

প্রতিবেশীদের বিশেষ পাত্তা দেন না। কাউকে নিমন্ত্রণ করেন না, কারও নিমন্ত্রণ রাখতে যান না। অথচ একটি টাট্টু ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝেই তাঁকে শহরে যেতে হয়—সংসারের প্রয়োজনে, খামার-বাড়ির প্রয়োজনে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, পর পর তিনটি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটল মা ঐভাবে ঘোড়ায় চেপে শহরে যাবার ঠিক পরেই। মাকে বললাম সে কথা। বললাম, এর পর থেকে আমিই যাব শহরে। মা রাজী হয়ে গেল।

দ্বিতীয় কথা—আমারও দোষ আছে। বিশ-বাইশ বছরের কয়েকটি প্রতিবেশী মস্তান আমাকে দলে টানতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। আমি মদ খেতাম না। সিগারেট ফুঁকতাম না, মেয়েদের পিছনে লাগা, টিট্‌কারী দেওয়া একদম বরদাস্ত হত না। ফলে ওদের প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সে জন্যও এটা হতে পারে।

তৃতীয়ত বাপি ইলেকশানে জিতেছেন। এখান থেকে বছরে বছরে তিনি নির্বাচনে জিতে চলেছেন। এটা তাঁর শত্রুপক্ষের কাজও হতে পারে।

কারা করছে, কেন করছে জানা নেই—তবে প্রতিকারটা জানা ছিল। তাই মাকে লুকিয়ে প্রতিরাত্রে রান্নাঘরের মেজেতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকতাম। পাশে ঘুমাতো আমার একান্ত সেবক—"ওয়াগুস্"। আর মাথার কাছে দাদামশাইয়ের দেওয়া পয়েন্ট টু-টু বোরের সিঙ্গল সট স্টিভেন্স। আরও একটা মারণাস্ত্র ছিল—দশগজি একটা ছোট্ট কামান। তাতে মানুষ মারা যেত কিনা জানি না; কিন্তু বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শব্দ হত।

ওর কিছুদিন পরেই ঘটল গুলিবর্ষণ-পর্যায়ের নিদারুণতম ঘটনাটি।

মিসিসিপি নদীতে ভেসে আসত কাঠের গুঁড়ি। হাজার-হাজার নয়, লাখে লাখে। কখনও কখনও আমাদের বাড়ির কাছে সেই ভাসমান গুঁড়িগুলো জট পাকিয়ে যেত। তখন তার উপর দিয়ে

দিব্যি মাঝনদী পর্যন্ত চলে যেতাম আমরা। আমরা মানে, আমি এবং আমার বাল্যের সাথী বিল জনসন। বিল আমারই বয়সী, চাষীর ছেলে, আমার শাগরেদ। নদীতে ঘুরবার জন্য আমরা দুজনে একটা কাঠের ভেলাও বানিয়ে ছিলাম। সেটা নিয়ে মাঝে মাঝে আমরা নদীবক্ষে ভ্রমণে যেতাম। একদিন আমরা দুই বন্ধু ভেলায় চেপে ফিরে আসছি, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ দুম-দাম বন্দুকের শব্দ! একরাশ ছররা আমাদের কান ঘেঁষে ছুটে গেল! ভেলাটা তখন কিনারের কাছাকাছি। আমরা দুজনেই ঝুপঝাপ জলে নেমে পড়ি। তারপর নদীর পাড় থেকে পড়ি-তো-মরি ছুটতে থাকি বাড়ি পানে। শত্রুপক্ষদের আমরা দেখতে পাইনি, তবে ঝোপের ভিতর থেকে ওদের উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্য কানে এসেছিল।

এই সুযোগ। বাড়িতে পৌছেই আমি তুলে নিলাম বন্দুকটা। বিল্-এর হাতে ধরিয়ে দিলাম সেই দশ গজি কামানটা। বললাম, বিল্, ইটস্ নাউ অব নেভার!

বিল তার ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে শুধু বললে, ইয়াপ্!

দুজনে ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম অকুস্থলে। যাতায়াতে আমাদের দশ মিনিটও লাগেনি। ওদের পালাবার তাড়া ছিল না। আমরা ফিরে এসে ওদের দেখতে পেলাম। দলে তারা পাঁচ-ছয় জন। একজন যুবক, আর বাকি কজন আমাদেরই বয়সী—ঐ মস্তানের চ্যালাচামুণ্ডা, শাগরেদ। যুবকটির কাঁধে একটা রাইফেল ঝুলছে। ওরা নদীর পূব-পাড় ধরে মার্চ করে চলেছে। যুবকটি গান গাইছে। তার চ্যালাচামুণ্ডা কোরাসে গান ধরছে। সুরটা আজও মনে আছে আমার—"Shoot the old Nigger up the Tree!"

[মগ্‌ডালে ঐ লুকিয়ে আছে নিগারটা!
মার-মার-মার! দে টেনে তোর ট্রিগারটা!]

মুহূর্তমধ্যে আমি উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম মাটিতে। বিল জনসন ঠিক আমার পাশেই। টিপ্ আমার অব্যর্থ! স্থির করলাম লোকটাকে

প্রাণে মারব না। তবে ওর মাথার হ্যাটটাকে পেড়ে নামাতে হবে! মার-মার-মার! দে টেনে তোর ট্রিগারটা!

এক-দুই-তিন! ক্রুম্!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিল্ জনসনের কামানটা গর্জন করে উঠল!

সে একটা দৃশ্য বটে! 'ওরে-বাবারে! মেরে ফেল্লে রে!' সে কী দৌড়! .

ব্যস্! এরপব আর কোনদিন বীরপুঙ্গবের দল লিণ্ডবার্গ-ভিলায় টার্গেট প্র্যাকটিস্ করতে আসেনি! যে যেভাবে বোঝে। ওদের এই পদ্ধতিতেই বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল 'পারস্পরিক সাহায্য প্ল্যানের' কুফল! আমার বিছানায় তুমি যদি 'ইয়ে' করে যাও তবে তোমার বিছানাও শুক্নো থাকবে না বাছাধন! যে কাঠায় মাপ, সে কাঠায় শোধ!

ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধেব বয়স বাড়ছে। ১৯১৫-১৯১৬-১৯১৭! উইলসন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁর উপর চাপ আসতে থাকে—আমেবিকা যেন অবিলম্বে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। কংগ্রেসম্যান লিণ্ডবার্গের দৃঢ়মত আমেরিকার উচিত নিরপেক্ষ থাকা। তাঁর ধারণা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আমেরিকার সমূহ ক্ষতি; তাঁর বিশ্বাস সাধারণ মার্কিন নাগরিক মনে প্রাণে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় না—বরং সেটা চাইছে একজাতের কোটিপতি, যারা যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে চলেছে আজ কয়েক বছর। অনেক আশা নিয়ে যে-সব যুদ্ধবাজ ধনকুবের পর্বতপ্রমাণ যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে রেখেছে তারাই চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ুক এ যুদ্ধে। এই সময় লিণ্ডবার্গ যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারে কায়মনবাক্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য সরল "It is true that Europe is ablaze and the destruction of life and property is tremendous, but nothing should be destroyed here as a result of the war, so why should

we allow the European war to destroy our reason ?"
[স্বীকার করি, ইউরোপ জ্বলছে, সেখানে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে অপরিমিত হারে ; কিন্তু সে যুদ্ধে তো এখানে, আমাদের এ মহাদেশে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না, হবে না। তাহলে ইউরোপের যুদ্ধের দোহাই দিয়ে আমরা বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিই কেন ?]

বালক লিণ্ডি এসব বিষয়ে মাথা ঘামাতো না। রাজনীতির কিছুই সে বোঝে না। সে তখন অন্য বিষয়ে ব্যস্ত। মারিয়ার যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে এই ক-বছরেই। প্রথম যুগের মোটর গাড়ি—অকালেই এল তার বার্ধক্য-জরা এবং মৃত্যু।

তার চেয়েও শোচনীয় সংবাদ সেবার ওর বাবা নির্বাচনে হারলেন। শুনে মুষড়ে পড়ল লিণ্ডি, যদিও তার নেপথ্যে যে আরও একটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছে তা বেচারী সে সময়ে জানতে পারেনি। এবার নির্বাচনী প্রচারের সময় বাবা ওর মাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, মিনেসোটার বাড়ি বন্ধ করে পাকাপাকিভাবে ওয়াশিংটনে এসে থাকতে। রাজধানীতে কংগ্রেসম্যান লিণ্ডবার্গের তখন প্রচুর প্রতিপত্তি। হোমরাচোমরা রাজনীতিবিদদের বাড়িতে তাঁর নিত্য ডিনার পার্টি। সমাজে প্রতিপত্তি রাখতে হলে তাঁদের ফিরে নিমন্ত্রণ করা দরকার। অথচ কার্যত-ব্যাচিলার লিণ্ডবার্গ তাঁদের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে পারেন না। সেজন্য তিনি স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঈভাঞ্জেলিনও স্বীকৃত হয়েছিলেন। সঙ্কোচে তখনও ছেলেকে বলা হয়নি—গোপনে মালপত্র বাঁধাছাঁদাও সারা। এমন সময়েই এল ঐ দুঃসংবাদ। এবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন মিনেসোটার চিরবিজয়ী চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ। তিনি পেয়েছেন ১৫০,৬২৬টি ভোট ; আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জে. এ. এ. বার্নকুইস্ট পেয়েছেন ১৯৯,৩২৫টি। আমেরিকা যুদ্ধে নামল—লিণ্ডবার্গ রাজনীতির আসর থেকে সরে এলেন বিস্মৃতির অন্ধকারে। এমন দুঃসময়ে ঈভাঞ্জেলিন এসে দাঁড়াতে পারলেন না স্বামীর পাশটিতে।

এসব নেপথ্য কাহিনী জানতে পারল না বালক লিণ্ডি। বরং সে উৎসাহিত হল যখন তার মা বলল, 'এখানকার একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। চল, আমরা ক্যালিফোর্নিয়া ঘুরে আসি।'

লিণ্ডি তো একপায়ে খাড়া। আরও মজার কথা মা বলেছে, ওরা ট্রেনে চেপে যাবে না। নতুন গাড়ি কেনা হবে এজন্য। তখনই কেনা হয় ঐ 'স্যাক্সন সিক্স' গাড়িটা। লিণ্ডির মামা—চার্লস্ ল্যাণ্ডও এসে যোগ দিলেন। ওঁরা তিনজনে রওনা দিলেন পশ্চিমমুখো।

দূরত্বটা বড় কম নয়। মিনেসোটা থেকে লস্‌এঞ্জেলেস—সাদা বাঙলায় কলকাতা থেকে বোম্বাই। ওর মামা গাড়ি চালাতে জানেন না। চৌদ্দ বছর বয়সে লিণ্ডি তার মা, শাগরেদ 'ওয়াণ্ডস্' আর মামাকে নিয়ে ঐ দীর্ঘপথ একা চালিয়ে পাড়ি দিয়েছিল পাক্কা চল্লিশ দিনে। রাস্তার বারো আনাই কাঁচা—সময়টা বর্ষাকাল। কতবার যে কাদার দয়ে চাকা ফেঁসেছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে ওর মামা বেশীদিন থাকেননি—কয়েক সপ্তাহ পরেই ফিরে গেলেন ডেট্রয়েটে।. মায়ে-পোয়ে ওরা একটা কটেজ ভাড়া নিল রেডেণ্ডো বীচ-এ। মায়ের নির্দেশে ওখানকার স্কুলেও নাম লেখাতে হল। স্কুলের খাতা অনুযায়ী লিণ্ডিকে ভাল ছেলের দলে ফেলা যায় না ; ফিজিক্স এবং মেকানিক্সে খুব ভাল নম্বর পেলেও অন্যান্য বিষয়ে [illegible] নম্বর পাশ-ফেলের গোধূলিরাজ্যে।

জায়গাটা ওঁদের খুব ভাল লেগেছিল। রোজই দুজনে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসতেন, দুজনে মিলে ঝিনুক কুড়াতেন। গাড়িটা বেলাভূমিতে রাখা থাকত, তাতে বোঝাই করতেন ঝিনুক। এত বস্তা বস্তা ঝিনুক দিয়ে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হত জানি না ; কিন্তু ওটা ছিল ওঁদের খেলা, খেয়াল—পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক এবং তার প্রোষিতভর্তৃকা মায়ের। ঐ ঝিনুক-কুড়ানো ব্যাপারেই, মনে আছে লিণ্ডির, তিনি জীবনে প্রথম এবং শেষবার পুলিসের খপ্পরে পড়েন। আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তাঁকে।

সেদিনও ওঁরা যথারীতি এসেছেন সমুদ্রের ধারে। ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। থলিটা আজ রীতিমত ভারী হয়েছে। লিণ্ডি বললে, এক কাজ করি। তুমি এই থলিটা পাহারা দাও, আমি গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বার করে আনি।

সেদিন বিকালে ওরা পদব্রজেই এসেছিল সমুদ্রের ধারে। মা পাহারায় থাকল, ছেলে গেল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে আনতে। ওয়াগুস্‌ও চলল তার পিছন পিছন। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বার করে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখে হেডলাইট দুটো জ্বলছে না। হাতে সময় থাকলে ও হয়তো ইলেকট্রিক কানেকশানটা পরীক্ষা করত—এসব ছোটখাটো মেরামতি কাজ সে নিজেই করে; কিন্তু মনে পড়ল মা একা দাঁড়িয়ে আছে নির্জন সমুদ্রপাড়ে ঘন অন্ধকারে। তাই লিণ্ডি উইণ্ডস্ক্রীনের উপর স্পট-লাইটটা চট করে খাটিয়ে নিয়ে রওনা দিল। কিন্তু বিধি বাম। এক কদম গেছে কি না গেছে, বংশীধ্বনি কানে গেল। আরক্ষাপুঙ্গব ওর গাড়ি রুখেছে। নোট বুকে ওর গাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে সেপাইসাহেব বললে, 'বিনা হেডলাইটে গাড়ি হাঁকাচ্ছ, থানায় যেতে হবে।'

লিণ্ডি বললে, তার মা একা দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ধারে, তারই প্রতীক্ষায়।

সেপাইসাহেব আদ্যোপান্ত শুনে অনুমতি দিল, কিন্তু পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে থানায় হাজির হবার টিকিটটাও ধরিয়ে দিল।

আদালতে বিচারক তদন্তে দেখলেন—আপাতদৃষ্টিতে অপরাধটা যত গুরুতর মনে হয়েছিল, আসলে সেটা তার চেয়েও বেশি। ওর গাড়িতে হেডলাইট ছিল না, এটাই একমাত্র অপরাধ নয়, গাড়ির চালকের বয়স মাত্র চৌদ্দ। নেহাত নাবালক সে। যে আমলের কথা তখনও মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রথা চালু হয়নি; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন কেউ স্টিয়ারিঙে বসতে পারবে না—এমন নির্দেশবহ আইন কেতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে—সে তথ্যটা না জানা ছিল লিণ্ডির,

না তার মায়ের। বিচারক বললেন, গুরুতর অপরাধ! ছোকরার বয়স মাত্র চৌদ্দ, আর তাকে গ্যারেজ থেকে বীচ পর্যন্ত পাক্কা তিন মাইল গাড়ি চালাতে দেখা গেছে! ওর তো সাতদিনের জেল হওয়ার কথা!

লিণ্ডি সবিনয়ে হাত দুটি জোড় করে বললে, ধর্মাবতার! বিশ্বাস করুন, আমি খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারি! আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তিন মাইল কী বলছেন স্যার! আমি একাই মিনেসোটা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঐ গাড়ি চালিয়ে এসেছি—পাক্কা দু-হাজার মাইল· ·

বিচারকের চোখ জোড়া নাটা-নাটা হয়ে ওঠে। দর্শকের সারির প্রথমেই বসে আছেন আসামীর গর্ভধারিণী। বিচারক তাঁর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, এ কথা সত্য?

ঈভাঞ্জেলিন সবিনয়ে বলেন, আদ্যন্ত সত্য কথা ধর্মাবতার!

বিচারক গম্ভীর হয়ে বলেন, দু-হাজার মাইল! তবে তো সাত-দিন নয়, ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত!

তা অবশ্য হয়নি। ঈভাঞ্জেলিন বুদ্ধি করে এই সুযোগে আসামীর পিতৃ পরিচয়টুকু দাখিল করেন। এক্স-কংগ্রেসম্যান চার্লস্ অগস্টাস লিণ্ডবার্গ ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর জনক। আরও বললেন, আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এ অপরাধের মূল কারণ। বিচারক নরম হলেন। অপরাধী ও তার জননীকে সাবধান করে লিণ্ডিকে বেকসুর খালাস দিলেন।

খালাস তো পেল। গাড়িটা আদালত থেকে বাড়িতে আনবে কেমন করে? বেচারী লিণ্ডি। মাকে বসালো স্টিয়ারিঙের সামনে। নিজে বসল তাঁর কোলঘেঁষে। মা ধরল স্টিয়ারিং, ছেলে ধরল মায়ের হাত। সীটের নিচে কার ঠ্যাঙ কখন অ্যাক্সিলারেটার-ব্রেক ক্লাচ্ টিপছে তা অবশ্য রাস্তায়-দাঁড়ানো পুলিস দেখতে পাচ্ছে না। সে এক রীতিমত সার্কাসী-কসরত! ভাগ্য ভাল, আইনরক্ষা করতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি!

জায়গাটা পছন্দসই ছিল দুজনেরই ; কিন্তু দীর্ঘদিন সেখানে থাকা গেল না। বছরখানেক পরে, ১৯১৭ সালের বসন্তকালে হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম এল ডেট্রয়েট থেকে—ঈভাঞ্জেলিনের মা মৃত্যুশয্যায়। ক্যান্সার হয়েছে তাঁর। ওঁরা ফিরে এলেন ডেট্রয়েটে। সেখানে কিছুদিন থেকে দিদিমা একটু সুস্থ হলে- তাঁকে নিয়ে ওর মা ফিরে এলেন লিট্‌ল্ ফল্‌সে লিণ্ডবার্গ-ভিলায়। লিণ্ডির দিদিমা আরও দুবছর বেঁচে ছিলেন। মেয়ের সেবা-যত্নেই ছিলেন জীবনের শেষ দুই বছর ঐ লিণ্ডবার্গ-ভিলাতেই।

দেশে ফিরে এসে আবার স্কুলে ভর্তি হতে হল লিণ্ডিকে। সেই পুরনো স্কুলে। ইতিমধ্যে আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ওয়াশিংটন থেকে ওর বাবা নির্দেশ দিয়েছিলেন—যুদ্ধ মানেই দুর্দিন এগিয়ে আসছে। সংবৎসরের জন্য খাদ্য মজুত রেখ। খামারের দিকে নজর দাও—গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দাও।

লিণ্ডি আর ছেলেমানুষ নয়। খামারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তার কাঁধে। প্রতিটি গরু-ভেড়া-হাঁস-মুরগীর খবরাখবর তার নখদর্পণে। চাষের কাজেও সে বেশ দড়। ঝাড়াই-মাড়াই তদারকী করা, হাটে গিয়ে সওদা বেচে আসা, বীজ ধান কিনে আনা, জমিতে সার দেওয়া সবই তাকে দেখতে হয়। অর্থাৎ মার্ক টোয়েনের 'হাক্‌ল্‌বেরি ফিন্' রূপান্তরিত হয়েছে হার্ডির 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউডে'র নায়কে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করতে হয় তাকে। তার মধ্যে ঐ এক বিচিত্র ঝকমারি—স্কুলে হাজিরা দেওয়া। লিণ্ডি পড়া তৈরী করে আসে না, লিণ্ডি হোম-টাস্ক করে না, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় না—মাস্টার মশাইদের অভিযোগ একের পর এক জমতে থাকে। মায়ের কাছে হপ্তায় হপ্তায় চিঠি আসে! মা বোঝেন, স্বচক্ষেই তো দেখছেন—কী উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে লিণ্ডি। শুধু কি উদয়াস্ত—রাত জেগে সে হিসাব মেলায়, খামারের খাতাপত্র দেখে।

কাকে কত মজুরী দিয়েছে, কত আয়, কত ব্যয়। কেরোসিনের টেমি জ্বেলে সে খামারবাড়ির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ফাঁদে। একদিন কিনে নিয়ে এল তে-চাকার একটা ট্রাক্টার—বাপকে না জানিয়েই।

১৯১৮ সাল তক্ দেখা গেল স্কুলে লিণ্ডির খাতায় নম্বর যা জমা পড়েছে তাতে তার পক্ষে 'স্কুল-লিভিং-সার্টিফিকেট' আশা করা চলে না। সংবাদটা লিণ্ডির কাছে মর্মবিদারক! তার সহপাঠীরা, তার বিবেচনায়—নিতান্ত নাবালক। জানে শুধু হুল্লোড় করতে, আর সহপাঠিনীর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতে। হ্যাঁ, ওরা কম্পোজিশান লেখায় দড়, আঁক করতে জানে, ইতিহাসের সাল-তারিখ অথবা ভৌগোলিক নামের তালিকা মুখস্থ আউড়ে যেতে পারে। কিন্তু ওরা কি জানে একটা 'রেড-পোল্ড' গাই দিনে কতটা দুধ দেয়? একটা ডুরক-জার্সি শুয়োর দিনে কতটা খায়? একটা শ্রপশায়ার জাতের ভেড়া কতটা পশম বছরে পয়দা করে? কিংবা একটা লেগ-হর্ন জাতের মুরগী, অথবা তুলোস্ হাঁস হপ্তায় কটা ডিম পাড়ে? নাবালক! নাবালক সব!

তবু কর্তৃপক্ষের এমনই ব্যবস্থা ঐ চ্যাঙড়া ছেলেগুলো পাস করে কলেজে ভর্তি হবে আর লিণ্ডির নামে দেওয়া হবে মস্ত একটা ঢ্যারা!

ভাগ্য সুপ্রসন্ন! ঐ সময়ে একটা সার্কুলার এল—যুদ্ধের প্রয়োজনে যারা কায়িক পরিশ্রমে 'অধিক খাদ্য ফলাও'-প্রকল্পে একটা ন্যূনতম মান লাভ করবে তাদের বিনা পরীক্ষাতেই স্কুলত্যাগের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। ব্যস্! মুশকিল আসান! লিণ্ডি নাম লেখালো খাতায়। এবার দেখা যাক কে ওকে হারায়? বল কতটা মাটি কোপাতে হবে, কতগুলো গরুর দুধ দুইতে হবে, কতটা জমি চাষ করতে হবে?

মাস্টারমশাইরা স্বীকার করলেন—ন্যূনতম মান নয়, ও পাড়ায় সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। খাদ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতায়

লিণ্ডির ধারে কাছে কেউ যেতে পারল না। ১৯১৮ সালে তাকে দেওয়া হল পাস করার সার্টিফিকেট!

ঐ সময়েই একদিন সে হাটে গেছে পাইকিরি দরে তার উৎপন্ন ফসল বেচতে। হঠাৎ শুনল এক ভদ্রলোক নিলামদারের টুলটা টেনে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন: ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের নিলাম কাজে বাধা দিচ্ছি বলে ক্ষমাপ্রার্থী! আমি এইমাত্র শহর থেকে একটি সুসংবাদ পেয়েছি। সেটা সবাইকে জানাতে চাই—আজ, এই এগারোই নভেম্বর, ১৯১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে!

॥ তিন ॥

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, আর ঠিক সেই সময়েই শুরু হল গৃহযুদ্ধ। আমেরিকায় নয়, লিণ্ডির জীবনে। ত্রিপাক্ষিক লড়াই। স্কুল জীবন শেষ হয়েছে, এবার লিণ্ডি কী করবে? মায়ের ইচ্ছা সে কোনও কলেজে ভর্তি হোক—হয় কৃষিবিদ্যা, নয় এঞ্জিনিয়ারিং একটা কিছু ডিগ্রি নিয়ে সে ফিরে আসুক। পাকাপাকিভাবে মিনেসোটাতেই বসুক। মায়ে-ছেলেয় সংসারটাকে জমজমাট করে তুলবেন। লিণ্ডির বিয়ে দেবেন—ছেলে, ছেলের-বউ, নাতি নাতনী।

বাপের ইচ্ছাটা অন্যরকম। ও বরং আইনের পরীক্ষা দিক। তারপর ওয়াশিংটনে কোন অফিসে কাজ-কাম ধরে নেবে। ওঁর অনেক জানা-চেনা দপ্তর আছে, সেখানে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। লিণ্ডির বৈমাত্রেয় দিদি থাকে তার মামার বাড়ি, সেদিক থেকে সিনিয়ার লিণ্ডবার্গের কোন চিন্তা নেই।

তৃতীয় পক্ষ লিণ্ডি স্বয়ং। তার ইচ্ছাটা একেবারে অন্য ধাঁচের। কৈশোরেই তার মস্তকটি অজান্তে যিনি চর্বণ করে বসে আছেন তিনি ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এডগার ওয়ালেস্। 'এভরিবডিস্ ম্যাগাজিন' নামে এক সাময়িক পত্রিকায় তিনি জবর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে লিখছিলেন—নাম, 'ট্যাম ও' দ্য স্কুটস্'। কাহিনীর নায়ক একজন তরুণ স্কচম্যান, দুর্ধর্ষ বৈমানিক সে। রয়্যাল ফ্লাইং কোরে নাম লিখিয়ে সে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধে যায় এবং এক নম্বর বৈমানিক হয়ে ওঠে। ঐ গল্পটি পড়তে পড়তেই কিশোর লিণ্ডবার্গ তাব জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করে ফেলেছে। তাকে বিমানচালক হতে হবে। শুধু বৈমানিক নয়, ফাইটার-প্লেনের চালক। নিরীহ ভূ-পৃষ্ঠবাসীদের মাথায় বোমা ঝেড়ে আসার মধ্যে সে নেই—সে লড়াই করতে চায়

সমানে সমানে। তোমারও এক হাতে গান-বটন, অপর হাতে মৃত্যু—আমারও তাই! কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! বিমান বাহিনীতে নাম লেখানোর আগেই বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেল—'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।'

অগত্যা। কলেজে নাম লেখাতে হল। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে ওখানে কেন? দুটি কারণে। প্রথমত ওর মা ছেলেকে দূরে পাঠাতে রাজী নন। চোখের আড়ালে যেতে দেবেন না। তাই আগেভাগেই তিনি সেখানকার একটি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি জোগাড় করে নিয়েছেন। ছেলেকে হস্টেলে থাকতে দেবেন না, সে থাকবে মায়ের কাছেই। দ্বিতীয় কারণটা চার্লস লিণ্ডবার্গ নিজেই পরিণত বয়সে লিখেছেন, "I chose the University of Wisconsin probably more because of its lakes than because of its high engineering standards" [ভাল পড়াশুনা হয় বলে নয়, আমি উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছিলাম তার কারণ ভারি সুন্দর একটা হ্রদের ধারে থাকতে পারব বলে।]

মিনেসোটা খামারবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে চুকিয়ে ফেলা হল না। বিক্রি নয়, লীজ। বাড়িটা ওদেরই থাকল, যাতে ছুটি-ছাটায় এসে উঠতে পারে। গরু-ঘোড়া-হাঁস-মুরগী-শুয়োর সমেত তিন বছরের জন্য খামারবাড়ি ও জমি লীজ দেওয়া হল এক প্রতিবেশীকে। সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসবার সময় লিণ্ডি বুঝতে পারল—নিজের অজান্তে সে কী পরিমাণ ভালবেসে ফেলেছিল ওদের—ঐ গরুর পাল, হাঁস-মুরগীর দল, পাকা গমের ক্ষেত, ট্রাকটার, মায় ঐ ওজন কাঁটাটাকেও!

কিন্তু কলেজে পড়াশুনা করা ওর ধাতে নেই। বছরখানেক কলেজের খাতায় ওর নাম ছিল। তার পরেই সিদ্ধান্তে এল, কলেজে গিয়ে লেকচার শোনা ওর পোষাবে না। এক বছরে ও কি কিছুই

শেখেনি ? তা নয়। শিখেছে। সবচেয়ে বেশি ভালো করে শিখেছে মোটর বাইক চালানো। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় আকাশে ওড়ার সম্ভাবনা যখন রইল না তখন মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা করল লিণ্ডি। পাইলটের বদলে হল মোটর বাইক চালক। দিবারাত্র বাইকে চেপে কলেজ ক্যাম্পাস্ দাবড়ে বেড়াতো। কলেজে মাত্র দুজন বন্ধু হয়েছিল ওর—রিচার্ড এবং ডাড্‌লে। অন্য কোনও গুণের জন্য নয়, একটি মাত্র কারণে—ওদের দুজনেরও ছিল মোটর বাইক। তিন বন্ধুতে লেক মেণ্ডোটার আশপাশের সব কটা গ্রাম, শহর, জঙ্গল চষে ফেলল।

ডাড্‌লে তার বন্ধুর বিষয়ে পরবর্তীকালে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছে :

কলেজের যিনি প্রিন্সিপ্যাল তাঁর বাড়িটা ছিল একটা টিলার উপর। বাঙলো থেকে রাস্তাটা ঢালু পথে কয়েক শ' গজ সোজা নেমে এসেই একেবারে ডাইনে মোড় নিয়েছে। রিচার্ড কথাপ্রসঙ্গে শুধু বলেছিল, ধর কোনও মোটর সাইক্লিস্ট উপর থেকে ঐ খাড়া পথে সোজা নেমে আসছে, এমন সময়ে তার ব্রেক ফেল করল। তাহলে অবস্থাটা কি হবে ?

ডাড্‌লে বললে, কী আবার হবে—সোজা গিয়ে সামনের বেড়াটায় ধাক্কা খাবে। তুঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে একটা ঠ্যাঙ বা হাত খোয়াবে। না থাকলে ঐ কলেজ সিমেটারিতে একটা পাথরের ফলক বসানো হবে।

লিণ্ডি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঢালু রাস্তাটা দেখে নিয়ে বললে, তৃতীয় একটা সম্ভাবনাও আছে। লোকটার যদি ব্যালেন্সজ্ঞান এবং হিম্মৎ থাকে তবে ঐ বিদ্যুৎবেগেই সে ডাইনে মোড় নিয়ে টাল সামলে চলে যাবে।

দু বন্ধুও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিনজনেই মোটর বাইক চালায়। ওরা আবার একবার রাস্তাটা দেখে নিয়ে বললে, অসম্ভব। ব্রেক

ফেল করলে উপর থেকে নেমে এসে এখানে পৌঁছে যে গতিবেগ হবে তাতে কিছুতেই ব্যালেন্স রেখে ডাইনে মোড় নেওয়া যাবে না।

লিণ্ডি শুধু বললে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তোরা দাঁড়া এখানে। আমি করে দেখাই।

ওরা দুজনেই লাফিয়ে ওঠে: ক্ষেপেছিস্! এ যে অনিবার্য মৃত্যু!

কিন্তু পাগলাকে রোখা গেল না। মোটর বাইকটাকে ঠেলতে ঠেলতে সে পাহাড়ের মাথায় উঠল। রুদ্ধনিশ্বাসে নিচে অপেক্ষা করছে ওর দুই বন্ধু। লিণ্ডি প্রতিজ্ঞা করেছে, ব্রেক সে ব্যবহার করবে না—অর্থাৎ তার ব্রেক যেন 'ফেল' করেছে। ঢালু পথে রওনা দিল সে। দ্রুত—আরও দ্রুত—বিদ্যুৎগতিতে সে যখন নেমে আসছে তখন দুই বন্ধুর আতঙ্ক তুঙ্গশীর্ষে উঠেছে; কিন্তু না, ব্রেক ব্যবহার করল না লিণ্ডি—বাঁক নিল ডাইনে। পারল না। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল দ্বিচক্রযান। পড়ল গিয়ে খানায়। দু-বন্ধু ছুটে গেল ওর কাছে। না, গাড়িটা ভাঙেনি। লিণ্ডির জামা ছিঁড়ে গেছে, কাঁধের কাছে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, একটা চোখ নীল হয়ে উঠেছে। হাড়-গোড় ভাঙেনি কিছু। ধরে তুলতে হল না। নিজেই উঠল, টেনে তুলল মোটর বাইকটাকে।

ডাড্‌লে বললে, বদ্ধ উন্মাদ তুই! প্রাণে বেঁচে গেছিস্ নেহাত বাপ দাদাদের পুণ্যে।

লিণ্ডি বলে, দোষটা আমারই। মোড় নেবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমি মোটরটা চালু করতাম তাহলে ব্যালেন্সটা থাকত।

: খোদায় মালুম, কি হলে কি হত—এখন চল। টিনচার আয়োডিন··

তাকে থামিয়ে দিয়ে লিণ্ডি বলে, যাব মানে? আমি তো আর একবার চেষ্টা করব! এবার সময় বুঝে মোটরটা স্টার্ট করলেই ঠিক কাটিয়ে নিতে পারব। তোরা এখানেই দাঁড়া!

কিছুতেই ঠেকানো গেল না তাকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং মোটর বাইকটাকে ঠেলতে ঠেলতে আবার উঠল টিলার মাথায়। আশ্চর্য! একইভাবে আবার সে নেমে এল; একইভাবে নিশ্বাস রুদ্ধ করল ওর দুই বন্ধু অন্তিম মুহূর্তটিতে; কিন্তু একই ঘটনা ঘটল না। খণ্ড-মুহূর্তে বাঁক নেবার সময়েই লিণ্ডি মোটরটায় স্টার্ট করল। একটা ধাক্কা খেল এঞ্জিনটা এবং নির্বিঘ্নে সে বাঁক নিয়ে চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে।

এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে চার্লস লিণ্ডবার্গ একা অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যখন বিশ্বরেকর্ড করলেন তখন তার সহপাঠী ডনাস্ ডাড্লে কথাপ্রসঙ্গে একজন সাংবাদিককে জানিয়েছিলেন এই ঘটনার কথা। উপসংহারে বলেছিলেন, লিণ্ডির পক্ষেই অমন দুঃসাহসিক কাজ সম্ভবপর। অতলান্তিক পাড়ি দেওয়া তো তুচ্ছ—তার চেয়েও বড় জাতের রেকর্ড রেখে গেছে লিণ্ডি আমাদের কলেজে।

সাংবাদিক নোটবই বাড়িয়ে ধরে বলেছিল: সেটা কী জাতের স্যার?

: লিণ্ডি আমার সঙ্গে একই ক্লাসে চৌদ্দ মাস পড়েছিল। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার সব কথাই জানি। আমাদের ক্লাসে বাইশজন ছাত্রী ছিল। এই চৌদ্দ মাসের ভিতর একবারও সে কোন সহপাঠিনীর সঙ্গে 'ডেট' করেনি, বাইশজনের মধ্যে একজনকেও চুমু খায়নি, একজনের সঙ্গে হেসে কথা বলেনি! এটা উইস্কন্সিন য়ুনিভার্সিটির একটা আনব্রোকন রেকর্ড! কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত রেকর্ড কেউ করতে পারেনি। ও ছেলের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

সে কথা সত্যি। জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছরের মধ্যে চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ শুধু একটি মহিলার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, হেসে কথা বলেছে, জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়েছে। সেই ভদ্রমহিলার নাম ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড লজ লিণ্ডবার্গ। ওর গর্ভধারিণী

জননী! অথচ মজা হচ্ছে এই লিণ্ডি ছিল অত্যন্ত সুপুরুষ—ছয় ফুটের উপর লম্বা, সুগঠিত দেহ। দুর্ধর্ষ বেপরোয়া তরুণদের প্রতি মেয়ে-মহলের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকেই, তার উপর ওর পরুষব্যঞ্জক সুতনু এবং সর্বোপরি ওর হাসির জন্যে অনেক মেয়েই ঝুঁকেছিল ভাব করতে। সে আমলে 'লিণ্ডবার্গ-স্মাইল' বলে একটা শব্দই চালু হয়ে গিয়েছিল ইংরাজী সাহিত্যে।

নিরুপায় হয়ে একদিন লিণ্ডি এসে মায়ের কাছে খোলাখুলি সব কথা বলল। বলল, কলেজ তার ভাল লাগে না, আর পড়াশুনা করবে না সে। এবার কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রথমটায় মা তো কিছুতেই রাজী নয়; কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি চিনতেন। একরোখা, জেদী, যা-ধরবে-তা-করবে। শেষে বললেন, বেশ, তাহলে বল্ কী করতে চাস্?

: আমি নেব্রাস্কা কোম্পানিতে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখেছি। ওরা ট্রেনিং দিতে রাজী।

: নেব্রাস্কা কোম্পানি! কি তৈরী করে তারা? কিসের শিক্ষানবিশী?

: নেব্রাস্কা এয়ারক্রাফ্‌ট্ কোম্পানি। অর্থের বিনিময়ে ওরা বিমানচালনা শেখায়। পাঁচ শ' ডলার ফি।

: তুই···তুই···পাইলট হবি?

: ছেলেবেলা থেকে সেই স্বপ্নই আমি দেখে এসেছি মা!

অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারেননি ঈভাঞ্জেলিন। তারপর মনস্থির করে বলেন, ঠিক আছে। তোর ইচ্ছায় বাধা দেব না। উড়তেই যদি সাধ হয়ে থাকে তবে আমি শেকল পরাব না তোর পায়ে।

লিণ্ডি জড়িয়ে ধরেছিল তার মাকে। অস্ফুটে বলেছিল, আমি জানতাম মামণি! তুমি অনুমতি দেবেই। তাই তো তোমাকে না জানিয়েই দরখাস্ত করে বসে আছি!

॥ চার ॥

পয়লা এপ্রিল, ১৯২২।

মোটর বাইকে চেপে লিণ্ডি এসে পৌঁছালে নেব্রাস্কা এয়ারক্রাফ্‌ট কোম্পানিতে। যা ভেবেছিল মোটেই তা নয়। ছোট্ট কোম্পানি। মালিক রে পেজ রীতিমত সন্দেহভাজন ব্যক্তি। লিণ্ডবার্গ নিজের পরিচয় দিতেই সে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে দিল। করমর্দনের জন্য নয়, গ্রহণের মুদ্রায়। বললে, প্রতিশ্রুত পাঁচ শ' ডলারের একশ' আগাম দেওয়া আছে, বাকি চার শ'?

লিণ্ডি একটু আহত হল এ জাতীয় অভ্যর্থনায়। তবে কণ্ট্রাক্ট হচ্ছে কণ্ট্রাক্ট। বিনা বাক্যব্যয়ে সে বাকি টাকা হস্তান্তরিত করে দিল তৎক্ষণাৎ।

রে পেজ-এর শিক্ষায়তনে একটিই এয়ারোপ্লেন আছে—শিক্ষকও সবে ধন নীলমণি একজন—আই. বিফ্‌ল্‌। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড ছাত্রও সে একা। বিফ্‌ল ছিল ইউ. এস. আর্মি এয়ার কোরের পাইলট। যুদ্ধান্তে বেকার বসেছিল। এই কোম্পানিতে শিক্ষকতার কাজ ধরেছে। মুশকিল হচ্ছে—এই যুদ্ধে ওর প্রাণের বন্ধুটি ওর চোখের সামনেই নিহত হয়; আর তার পর থেকেই বেচারীর স্নায়ুতন্ত্রে কি একটা বখেড়া দেখা দিয়েছে। তাই বিফ্‌ল্‌ পারতপক্ষে আকাশে উড়তে চায় না। ভাবখানা—জমিতে দাঁড়িয়ে যা শিখতে চাও, এস না, তা শিখিয়ে দিচ্ছি। আবার আকাশে উড়তে চাও কেন?

শিক্ষানবিশীর জন্য দেয় পাঁচশ' ডলার তো প্রথমেই দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর উপায় কি? বিফ্‌ল্‌কে ধরেই ব্যাপারটা শিখে নিতে হবে। লিণ্ডিও নাছোড়বান্দা। অগত্যা ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে আকাশে উড়তে হচ্ছিল বিফ্‌ল্‌কে।

মাস কতক এভাবেই গেল। ততদিনে আটঘণ্টা আকাশ-চারণ লেখা হয়েছে লিণ্ডির খাতায়। একা নয়, শিক্ষকের সঙ্গে। এবার সে ধরে পড়ল ওকে একলা আকাশে যেতে দিতে হবে—যাকে বলে 'সোলো-ফ্লাইট'। বিফ্‌ল্ বললে, একা উড়তে চাও যত খুশি ওড় না। আমাকে কেন? প্লেনের মালিক রে পেজ; তার অনুমতি পেলেই উড়তে পার।

· কিন্তু তুমি সুপারিশ না করলে সে আমাকে প্লেন ছেড়ে দেবে কেন?

: আমি সুপারিশ করলেও দেবে না। তুমি কিশ্যু খবর রাখ না। রে পেজ-এর এ ব্যবসা মোটেই চল্‌ছিল না। সে তলে তলে প্লেনটা বেচে দিয়েছে। আগামীকালই ক্রেতা ডেলিভারি নিতে আসবে!

: সে কি! শর্ত অনুযায়ী আমার শিক্ষা সমাপ্ত না হতেই?

: শেখা তো তোমার হয়েই গেছে! কেন ফালতু ঝামেলা করছ? ঘরের ছেলে ঘরে যাও!

: তার মানে! একবারও সোলো ফ্লাইট হয়নি তো আমার!

বিফ্‌ল্ বললে, দ্যাখ ছোকরা! আমার পিছনে এমন ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর না। চুক্তি তোমার আমার সঙ্গে হয়নি। যার সঙ্গে হয়েছে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করগে যাও!

রাগে আগুন হয়ে তার সঙ্গেই ফয়নালা করতে গেল লিণ্ডি। কিন্তু রে পেজ নির্বিকার। বললে, শর্ত ছিল তোমাকে প্লেন চালানো শেখাতে হবে। তা আমরা শিখিয়ে দিয়েছি। প্লেন নিয়ে একা যদি উড়তে চাও তাহলে প্লেনের দামটা আগে জমানত রাখতে হবে।

লিণ্ডি বুঝল—কী জাতীয় ব্যবসাদারের পাল্লায় পড়েছে সে।

পরদিন সত্যই এলেন সেই খরিদ্দার ভদ্রলোক। রোডস্টার গাড়িটাকে হ্যাঙ্গারের কাছে পার্ক করে নেমে এলেন এয়ার ফিল্ড-এ। মাঝবয়সী ভদ্রলোক, কেতাদুরস্ত সাজ-পোশাক। নামটা আগেই শুনেছিল—এরল্ড বাহ্ল। তিনিও বৈমানিক। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে প্লেন

নিয়ে যান। নানান কসরত দেখিয়ে টাকা রোজগার করেন। লিণ্ডি বেশ বুঝতে পারে কোনক্রমে ঐ ভদ্রলোককে তোয়াজ করে ওঁর দলে যদি ভিড়ে পড়তে পারে তাহলেই তার স্বপ্ন সফল হবার কিছু সম্ভাবনা থাকে। না হলে তার বিহঙ্গ-বাসনা কোনদিনই সফল হবে না।

ভদ্রলোক বিমানটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, ঠিক আছে।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল লিণ্ডি। বললে, স্যার, আমাকে আপনার দলে নেবেন ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, না বাপু, আমার কোন লোকের দরকার নেই।

লিণ্ডি পুনরায় বলে, মাইনে দিতে হবে না স্যার, খোরাকিও নয়, মানে ··

ভদ্রলোক চলতে শুরু করেছিলেন। এ কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, ব্যাপারটা কি ? মাইনে চাও না, খোরাকি চাও না, তবে আমার দলে ভিড়ে পড়বার উদ্দেশ্যটা কি ? সুযোগ বুঝে আমার ক্যাস ছিন্‌তাই ?

এতক্ষণে যার সঙ্গে কথা বলছেন তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন। এবং তখনই মুগ্ধ হয়ে যান। 'সুন্দর মুখের সর্বত্র জয় !' একটু নরম স্বরে বলেন, তোমার নামটা কি ভাই ? কেন আমার দলে আসতে চাও ?

: আমার নাম স্লিম লিণ্ডবার্গ ; না 'স্লিম' আমার নাম নয়, কলেজে ছেলেরা ঐ নামে ডাকত। আমি ঢ্যাঙা কিনা ! আমার পুরো নাম চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ !

: আই সী ! কিন্তু ঐ নামে একজন কংগ্রেসম্যান ছিলেন না ?

: হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা। তিনি সি. এ. লিণ্ডবার্গ সিনিয়ার। আমি জুনিয়ার।

: কিন্তু তুমি এভাবে সার্কাসের দলে আসতে চাইছ কেন ? তুমি তো বড়লোকের ছেলে !

আমি বৈমানিক হতে চাই। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে এখানে শিক্ষানবীশ হয়েছিলাম। আমার যা কিছু সঞ্চয়—পাঁচশ' ডলার—এদের দিয়েছি; কিন্তু এরা এই প্লেনটা আপনাকে বেচে দিচ্ছে, আমার শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই।

এরল্ড বাহ্‌ল বললেন, দেখ ভাই। আমার লোকের সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু মাহিনা বা খোরাকি যদি না চাও··· ভাল কথা, কী কাজ জান তুমি ?

: এখনও আমার সোলো-ফ্লাইট হয়নি, তবে যন্ত্রপাতির কাজ ভালই জানি। মোটর গাড়ির মেকানিজম্ সব জানি। আপনার ড্রাইভার, ক্লিনার, মায় ঘরদোর সাফা করা সব কাজই করতে রাজী। শুধু আমাকে ওড়াটা শিখিয়ে দিন।

বাহ্‌ল বললেন, তুমি নেহাত নাছোড়বান্দা হে ছোকরা! বেশ ভিড়ে পড় আমার সার্কাসের দলে! দেখি ভাগ্য তোমার কোথায় নিয়ে যায়।

একগাল হাসলে লিণ্ডি। যে হাসি এককালে স্বনামে বিখ্যাত হয়েছিল মার্কিন মুলুকে।

যে-আমলের কথা তখন পশ্চিমখণ্ডে এয়ারোপ্লেন ছাড়া কোন মেলা বা কার্নিভাল অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হত। একজাতের বৈমানিক সে যুগে পয়দা হয়েছিল যাদের বলে 'বার্নস্টর্মিং পাইলট'—তারা প্লেন নিয়ে আকাশে উঠে নানান কসরত দেখাতো। তারপর মেলার একান্তে রাখা হত প্লেনটা। আমেরিকা হলে পাঁচ ডলার, ইংলণ্ডে হলে পাঁচ শিলিং দিয়ে টিকিট কেটে শহর-গঞ্জের মানুষ আধঘণ্টার জন্য আকাশে উড়ে বেড়াতো। এক একবার শহর গঞ্জে এত ভিড় হত যে, বিমান চালককে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবে প্লেন চালাতে হত। এছাড়া আকাশে কসরত দেখানোও ছিল এক জাতের বিলাস। য়ুরোপে যে বৈমানিক সে আমলে এভাবে কসরত

দেখিয়ে সবচেয়ে বেশি রোজগার করতেন তাঁর নামটা সবাই জানে—ঐ কসরতের জন্য নয়, অন্য কারণে। তিনি স্বনামধন্য হেরম্যান গোয়েরিং, পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন বিশ্বত্রাস হিটলারের দক্ষিণহস্ত।

এলগু বাহ্‌ল ছিলেন একজন সুদক্ষ বৈমানিক। শহর গঞ্জে ঘুরে ঘুরে নানান কসরত দেখাতেন তিনি, এবং জয়রাইড-এর টিকিট বেচে মানুষের বিহঙ্গবাসনা চরিতার্থ করার অবকাশে নিজের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটাকে বর্ধিত করতেন। লিণ্ডিকে নিয়ে লম্বা ট্যুরে বার হলেন তিনি—নেব্রাস্কা, কানকাস, কলোরেডো হয়ে সানফ্রান্সিস্কোর দিকে। অচিরেই লিণ্ডি তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ছোকরা সর্বঘটে আছে। সারাদিন খাটছে—ঝাড়পোঁচ করছে আকাশ-যান, তেল দিচ্ছে যন্ত্রে, টুকটাক মেরামতি লেগেই আছে, আবার মেলাতলায় কোথাও কিছু নেই টুলটা টেনে নিয়ে তালঢ্যাঙা লোকটা চোঙামুখে হাঁকাড় পাড়ছে : আয়েন, আয়েন বাবুমশয়রা, আয়েন মা লক্ষ্মীরা—পাঁচ পাঁচ ডলারে স্রেক বন্‌কি চিঁড়িয়া বনে যান।

সবাই যেমন দেখে, লিণ্ডিও ছেলেবেলা থেকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত—একটা খাড়া পাহাড় থেকে সে পড়ে যাচ্ছে! পড়ছেই—পড়ছেই—হুহু করে নিচের দিকে পড়ছে! এ স্বপ্ন আমরা সবাই দেখেছি—কেন দেখি তা জানতে হলে গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' পড়ে দেখতে হবে। তা লিণ্ডি তো সে বই পড়েনি—ফ্রয়েড-য়ুঙ তার কাছে অচেনা। ওর ধারণা ছিল বাইরে ও যতই বেপরোয়া সাহসী হোক, সবার অজান্তে ওর মনের গভীরে একটা ভীতু লিণ্ডি মুখ লুকিয়ে বসে আছে। সেই ভয়কাতুরে অবচেতনবাসীটা ওর জন্মশত্রু। কাউকে কখনও তার কথা বলেনি, কিন্তু নিজে তো জানে! একদিন সে এসে বাহ্‌লকে বললে, স্যার, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি একটা কসরত দেখাবো। আপনি যখন প্লেন নিয়ে শহরের উপর দিয়ে উড়ে যাবেন, তখন আমি কক্‌পিট থেকে বেরিয়ে প্লেনের ডানার উপর হেঁটে চলে বেড়াব।

বাহ্‌ল অবাক হয়ে বলেন, কেন? তাতে কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে?

: বিজ্ঞাপন! লোকে দেখবে। মেলায় ভিড়টা জবর হবে!

বাহ্‌ল অবাক হলেন। ছোকরা পাগল নাকি? মুখে বললেন, বেশি ঝুঁকি নিওনা বাপু।

যে কথা সেই কাজ। অবচেতন মনের ভীতুটার নাকের ডগায় বুড়ো আঙুল নেড়ে লিণ্ডি সে কসরত দেখালো। অতি সন্তর্পণে সে ককপিট থেকে উঠে গেল চলন্ত প্লেনের ডানায়। প্রচণ্ড বায়ু বেগ— কিন্তু স্থানচ্যুত হল না লিণ্ডি। নিচে হাজার হাজার লোক বাহবা দিল। তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। অবচেতন ভীতুটা যে হার মেনেছে এতেই সে খুশি।

সেদিন সন্ধ্যায় বাহ্‌ল বললেন, স্লিম, এর পর যদি তোমাকে খোরাকি-মজুরি না দিই তাহলে অধর্ম হবে। কাল থেকে তুমি আর অবৈতনিক নও। বুঝলে?

কিন্তু মাস কতক পরেই বাহ্‌ল-এর ট্যুর শেষ হয়ে গেল। এখন শীতকাল, উৎসবের মরশুম খতম। অগত্যা চাকরিও খতম হল লিণ্ডির।

ঐ সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটল। নেব্রাস্কা স্টেটের লিঙ্কল্‌ন শহরে এসে উপস্থিত হলেন এক 'বার্নস্টর্মিং দম্পতি—প্রৌঢ় বৈমানিক চার্লি হার্ডিন এবং তাঁর সুন্দরী, সুতনুকা যুবতী স্ত্রী ক্যাথরিন। ওঁরা এসেছিলেন সেই নেব্রাস্কা এয়ারক্রাফ্‌ট কোম্পানির একচ্ছত্র মালিক রে পেজের আমন্ত্রণে। চার্লি শুধু দক্ষ বৈমানিক নয়, প্যারাসুট লম্ফনে সে অভ্যস্ত। সে প্যারাসুট তৈরীও করত—সে এবং তার স্ত্রী। বৈমানিকদের বিক্রি করত। তার স্ত্রী ক্যাথরিন পূর্বাশ্রমে ছিল সার্কাসে ট্রপিজ খেলোয়াড়। বর্তমানে সে একটা অদ্ভুত খেলা দেখায়। ওর স্বামী যখন শহরের উপর দিয়ে উড়ে যায় ও তখন শুধু মাত্র দাঁত দিয়ে

একটা তার কামড়ে শূন্যে দুলতে থাকে। অত্যন্ত দুঃসাহসিক খেলা। মানুষজন ছুটে আসে রাস্তায়, ট্রাফিক জাম হয়ে যায়। হাজার ঊর্ধ্বমুখী ক্যামেরা শুধু ক্লিক্-ক্লিক্ করতে থাকে।

জনারণ্যের একান্তে দাঁড়িয়ে স্লিম লিণ্ডবার্গও দেখল। সুতনুকা ক্যাথরিনের মৃত্যুঞ্জয়ী কসরত। আর দেখল হার্ডিন-এর প্যারাসুট-লাফ। প্রথম দৃশ্যটি নয়, দ্বিতীয়টিই তাকে মুগ্ধ করল। ওর মনে হল সেই ক্রনিক দুঃস্বপ্নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ওকে প্যারাসুট জাম্পিং করতে হবে। চার্লি হার্ডিন তার বিজ্ঞাপনে লিখেছে—সে শুধু প্যারাসুট জাম্পিংই জানে না—'ডবল' জাম্পিং-এর কসরতও জানে। 'ডবল-লাফ' আরও কঠিন জাতের। একক ঝাঁপে দক্ষতা কিছু নেই প্রয়োজন শুধু দুর্জয় সাহসের। 'জয়-রাম' বলে শূন্যে ঝাঁপ দেবার পর তাকে আর কিছু করতে হয় না—বাদবাকি কলকব্জার ব্যাপার। বায়ুচাপে প্যারাসুট আপনিই খুলে যায়। কিন্তু ডবল্-ঝাঁপে লম্ফ প্রদানকারীর দক্ষতার প্রয়োজন। সাহসও ডবল হওয়ার দরকার। কারণ এবার বিমানকে আরও অনেক অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। ঝাঁপ খাওয়ার পর এক নম্বর প্যারাসুট খুলে গেলে তিন চার সেকেণ্ড সে বাতাসে ভাসবে; তারপর নিজে হাতে দড়ি কেটে এক নম্বর প্যারাসুটকে মুক্তি দেবে। তৎক্ষণাৎ শূন্যমার্গ থেকে দ্বিতীয়বার পতন! আবার বায়ুচাপে যদি প্যারাসুট ঠিক সময়ে খুলে যায় তবেই নিরাপদে সে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করবে।

লিণ্ডি মনস্থির করল। এই প্যারাসুট জাম্পিংই অনিবার্য বিশল্যকরণী, ওর দুঃস্বপ্নের দাওয়াই।

চার্লির ঝাঁপ—সিঙ্গল জাম্প অবশ্য—দেখে সে-রাত্রে চার্লস্ লিণ্ডবার্গ দিনপঞ্জিকায় লিখেছিলেন, "A few gossamer yards grasping onto air and suspending below them with invisible threads, a human life, a man who by stitches, cloth and cord, has made himself a god of the sky for those

immortal moments..” [মাকড়সার জালের মত স্বচ্ছ কয়েক গজ কাপড়ের একটা ছাতা অদৃশ্য সুতায় ঝুলিয়ে রেখেছে একটি মানবসন্তানকে—শূন্যে সে দুলছে! এক মুঠো সুতো, একটুকরো কাপড়, আর সেলাইয়ের কারিগরী—ব্যস্‌ আর কিছু নয়! কয়েকটি মৃত্যুঞ্জয়ী খণ্ডমুহূর্তের জন্য সেই মানবশিশু হয়ে উঠছে নীলাকাশের এক দেবদূত!]

পরদিন লিণ্ডি এসে হাজির হল চার্লির ডেরায়। ডেরা বলতে ঐ এয়ারস্ট্রিপেরই একটি হ্যাঙার। মধ্যাহ্নভোজ সমাপ্ত করে ওরা কর্তাগিন্নি প্যারাস্যুট সেলাইয়ে বসেছিল। চারিদিকে মসলিনের টুকরো, সুতো, দড়ি—এককোণায় ক্যাথরিন একটা সেলাই-এর পা-কল চালাচ্ছে। লিণ্ডি ঘরে ঢুকে মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাসল। সেই বিখ্যাত ‘লিণ্ডবার্গ-স্মাইল’। চার্লি মুখ তুলে চাইল। ক্যাথরিনের সেলাই-কল নির্বাক হয়ে গেল।

: গুড আফটারনুন! আমার নাম স্লিম লিণ্ডবার্গ। একটা প্রয়োজনে এসেছিলাম।

: বলুন, কী করতে পারি আমরা?

: কাল আপনি যখন লাফ দেন তখন আমি দেখেছি। আমি অভিভূত!

ভ্রূকুঞ্চিত হল ক্যাথরিনের। লিণ্ডি যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। আজ না পাক, কিন্তু গত কালকেও সে কি দেখেনি উড়ন্ত আকাশযানের তলায় ঝুলন্ত একটি নারীদেহ—ট্রপিজ খেলোয়াড়দের খাটো চোলি আর আঁটো জাঙ্গিয়ায় যার যৌবন নীলাকাশের মর্মমূলে বিদ্ধ হয়েছিল?

: থ্যাঙ্কস্‌ ফর দ্য কম্‌প্লিমেণ্টস্‌। সে কথাই কি জানাতে এসেছেন? —বললে চার্লি।

: না। আমিও ঐভাবে লাফাতে চাই, মানে ঠিক ঐভাবে নয়, আমি চাই ডবল্‌ জাম্প!

এবার চার্লির ভ্রূতেও জেগেছে কুঞ্চন। গম্ভীরভাবে সে বলে, ডব্‌ল্‌ জাম্প! এর আগে কতবার সিঙ্গল-জাম্প লাফিয়েছেন?

আবার 'লিণ্ডবার্গ-স্মাইল': না, মানে, আমি কখনও প্যারাসুট জাম্প করিনি।

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল চার্লি, তবে ডব্‌ল্‌-জাম্পের প্রশ্নই ওঠে না!

: আপনার আপত্তিটা কিসের? রিস্‌ক্‌ তো আমার?

আর স্থির থাকতে পারল না ক্যাথরিন। স্বর্গ থেকে গ্রীক দেবতা 'অ্যাপোলো' মর্ত্যে নেমে এসে হঠাৎ কেন প্রথমেই দ্বৈতলম্ফনের ঝুঁকি নিতে চাইছে জানবার কৌতূহলটাই প্রবল হল। উঠে দাঁড়াল, একপা এগিয়ে এসে বললে, আমার নাম মিসেস্ ক্যাথরিন হার্ডিন্···

: জানি! কাল্‌কে আপনার কসরতও দেখেছি!

: ও! তাই নাকি! কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে বলুন তো। হেলে ধরার আগেই কেন হঠাৎ কেউটে ধরতে চাইছেন আপনি?

আবার সেই বিচিত্র হাসির আলিম্পনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল চার্লস্ লিণ্ডির একুশ বছরের তারুণ্য। বললে, আমি যে নিজের সঙ্গে বাজি ধরে বসে আছি!

তোলপাড় করে উঠ্‌ল ক্যাথরিনের হৃদয়। সামলে নিয়ে বললে, নিজের সঙ্গে বাজি! সেটা কিরকম? কিসের বাজি?

: এক বোতল শ্যাম্পেন! জিতলে আমি আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেন উপহার দেব, আর হারলে এক বোতল শ্যাম্পেন উপহার দেব আমাকে আমি!

চার্লি বললে, হিসাবটায় গল্‌তি আছে! হারলে তুমি আর তোমার কফিনে এক বোতল শ্যাম্পেন···

: আঃ! চুপ কর তুমি! —মাঝপথেই স্বামীকে থামিয়ে দেয় ক্যাথরিন।

পরদিন পড়ন্ত বেলায় লিণ্ডি এসে হাজির হল ওদের হ্যাঙারে।

বললে, বিমান ও বৈমানিক সে হাজির করেছে। এবার সে প্যারাস্যুট-জোড়া ডেলিভারি নেবে। চার্লিও তৈরী। ওরা বেরিয়ে এল বাইরে। লিণ্ডি উঠে বসল কক্‌পিটে। চার্লি আর তার স্ত্রী রইল মাটিতে। দু-বাণ্ডিল প্যারাস্যুট নিয়ে লিণ্ডি উঠে গেল আকাশে।

ডবল্‌-জাম্প-এ অনেকটা উঁচুতে উঠ্‌তে হবে। পাক খেতে খেতে বিমানটা যখন দু' হাজার ফুট উঠেছে তখন বিমানচালক ওকে ইঙ্গিত করল। দু-বাণ্ডিল প্যারাস্যুট নিয়ে লিণ্ডি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল বিমানের ডানায়। দু-হাজার ফুট! নিচে মানুষজন দেখা যাচ্ছে না, বাড়ি-ঘর খেলাঘরের মত। বিসর্পিল রেখায় একটা নদীর আভাস। প্রচণ্ড বাতাসে ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটা চোখ খুলে রেখেছে পাইলটের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পরে বৈমানিক ইঙ্গিত করল। ঠিক তখনই, মনে হল লিণ্ডির, ওর অন্তরবাসী সেই কাপুরুষটা বলে উঠ্‌ল···ন্‌না!

প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল লিণ্ডি সেই অবচেতনবাসীর নাকে। অর্থাৎ লাফ দিল মহাশূন্যে:

ঠিক স্বপ্নে যা দেখে! ও পড়ছে—নিচে পড়ছে; জোরে, আরও জোরে, বিদ্যুদ্‌বেগে।

হঠাৎ! আঃ কী আরাম! মাথার উপরে খুলে গেছে এক নশ্বরী ছাতা! কী আশ্চর্য! লিণ্ডি ভাসছে। মেঘের মত, কাপাসের তুলোর মত, স্নো-ফ্লেকের মত। কী আরাম! প্যারাস্যুট-জাম্পারের কাছে এ প্রাপ্তির আনন্দ ডার্বি-সুইপ জেতার চেয়েও বেশি। লিণ্ডি এখন অনন্তকাল এভাবে বাতাসে ভাসতে রাজী!

বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল! কী কথা ছিল? প্রথমবার ছাতা খুলে যাবার পর সে মনে মনে দশ গুণ্‌বে—এবং দশ গোণার সাথে সাথে প্রথম ছাতার দড়ি কেটে দেবে। তাহলেই দ্বিতীয় প্যারাস্যুট নিরাপদে খুলবার সময় হাতে থাকবে! কিন্তু সে তো কিছুই গণেনি। কতক্ষণ ভাসছে সে? ভূপৃষ্ঠ থেকে এখন যা দূরত্ব

তাতে প্রথম প্যারাসুটটার দড়ি কাটা কি নিরাপদ? কে বলে দেবে ওকে? দড়িটা কাটবে? ঠিক তখনই ওর অন্তরবাসী ভীরুটা দ্বিতীয়বার চীৎকার করে উঠ্‌ল : ন্‌না!

তৎক্ষণাৎ মনস্থির করল লিণ্ডি! মরতে হয় তো মরবে—তা বলে ঐ ভীরু কাপুরুষটার কাছে কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। পকেট থেকে ছুরিটা বার করে নির্মমহস্তে সে কেটে ফেলে দিল এক নম্বর ছাতাটা।

তৎক্ষণাৎ দুবাহু বাড়িয়ে পৃথিবী ওকে আলিঙ্গন করতে চাইল। ভীমবেগে পৃথিবী ছুটে আসছে ওঁর দিকে। বাতাসে পাক খাচ্ছে লিণ্ডি—কোনটা উর্ধ্ব, কোনটা অধঃ বোধ নেই—ওর চতুর্দিকেই যেন মহাশূন্য। অস্তায়মান সূর্যটা আকাশে পাক খাচ্ছে—চলন্ত গাড়ির একচোখো হেডলাইটের মত! কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাসুটটা খুলছে না কেন? এই খণ্ড মুহূর্তটির সম্বন্ধে লিণ্ডবার্গ তাঁর দিনপঞ্জিকায় লিখেছেন, "But why *doesn't* it tighten? It didn't take so long before—Air rushes past—my body tenses—turns—falls—good God!" ["দড়িতে এখনও টান পড়ল না কেন? প্রথমবার তো এত সময় লাগেনি? বাতাস পাশ দিয়ে ছুটেছে—আমার সারা দেহ শক্ত হয়ে উঠেছে—পাক খাচ্ছি—পড়ছি—হায় মঙ্গলময় ঈশ্বর!"]

মাটি থেকে সামান্য উপরে হঠাৎ খুলে গিয়েছিল দ্বিতীয় ছাতা। যথেষ্ট দূরত্বে নয়; তাই বেশ সবেগেই সে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। ছুটে এল ওর বন্ধু বাড গার্নে এবং হার্ডিন দম্পতি! ধরে তুলতে হল না। লিণ্ডি নিজেই উঠে দাঁড়াল। লিণ্ডি-স্মাইল!

চার্লি বললে, দড়িটা কাটতে যথেষ্ট দেরি হয়েছিল তোমার!

: জানি! দোষটা আমারই। ও ভুল আর কখনও হবে না।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে লিণ্ডি আর তার বন্ধু গিয়ে বসল তাদের মোটরে। চার্লি ফিরে গেল তার হ্যাঙারে। আর ক্যাথরিন এগিয়ে এসে বললে, নাও এটা ধর!

অবাক হয়ে লিণ্ডি বলে, কী ওটা ? কী ধরব ?

: এক নম্বর 'তুমি' বাজি হেরেছ, তাই দু-নম্বর 'তুমিকে' এটা তুমি দেবে !

ম্যাগনাম সাইজ এক বোতল ফরাসী শ্যাম্পেন ! সেই শ্যাম্পেন বিশল্যকরণী সেবনের পর চার্লস্ লিণ্ডবার্গ সারাজীবনে আর পতনের দুঃস্বপ্ন দেখেননি।

পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকা আমাকে মাপ করবেন—আমি উপন্যাস রচনা করছি না। তথ্যনির্ভর জীবনী লিখছি। তাই সুতনুকা ক্যাথরিন হার্ডিন-এর প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে আর আলোচিত হবে না। বাকিটা আপনারা মনে মনে রচনা করে নিন বরং। ইঙ্গিত তো আমি যথেষ্টই রেখে গেছি—বলেছি, চার্লি হার্ডিন প্রৌঢ়, ক্যাথরিন তার যুবতী স্ত্রী। সুন্দরী, বেপরোয়া, যৌবনমদে মদির। সাধারণীকরণ সূত্র শুনিয়েছি : বেপরোয়া ডানপিঠে ছেলেদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা দুর্বলতা থাকেই। জানিয়েছি—স্লিম লিণ্ডির দেহাবয়ব ক্যাথরিনের চোখে গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর মত মনে হয়েছিল। সর্বোপরি ছিল : লিণ্ডবার্গ স্মাইল !

বিশ্বাস করুন, মিসেস্ ক্যাথরিন হার্ডিন-এর ডায়েরি আমি পড়িনি। কিন্তু লিণ্ডির দিনপঞ্জিকায় ক্যাথরিনের উল্লেখ পাইনি। তাঁর জীবনীকার মস্‌লে বলছেন : "But Slim Lindbergh was neither attracted by her charms (and she was quite pretty) nor impressed by her gravity-defying acrobatics.···He never referred to Kathryn in any of his writings except as an adjunct of her husband." [কিন্তু স্লিম লিণ্ডবার্গ মেয়েটির আকর্ষণীশক্তিতে আদৌ আকৃষ্ট হয়নি (সে সত্যিই ছিল খুব সুন্দরী) এমনকি তার মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে অগ্রাহ্য করা কসরতেও নয়।···তার রচনায় কোথাও ক্যাথরিনের উল্লেখ নেই, একমাত্র স্বামীর সহযোগী হিসাবে ছাড়া]

॥ পাঁচ ॥

এরপর বেশ কিছুদিন সে নানান সার্কাস-দলে, অর্থাৎ গগনচারী 'বার্ন-স্টর্মিং' দলে কসরত দেখিয়েছে। ওর নামই হয়ে গেল 'Daredevil Lindbergh' [বেপরোয়া লিণ্ডবার্গ]। দিনপঞ্জিকায় যদিও কারণটা লিপিবদ্ধ করেনি—জানি না এর সঙ্গে ক্যাথরিনের কোনও যোগসূত্র আছে কিনা—লিণ্ডি ক্যাথরিনের কসরতও দেখিয়েছি কয়েকবার। অর্থাৎ উড়ন্ত প্লেনে দাঁত দিয়ে ঝুলন্ত মানুষ!

সবচেয়ে অবাক করা খবর—কিউপিড লিঞ্চ নামে একজন বৈমানিক 'লুপিং দ্য লুপ' করতেন। তাঁর কাছে লিণ্ডি এসে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করল। কিন্তু তার আগে 'লুপিং দ্য লুপ' কাকে বলে সেটা বোঝানো দরকার। আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ "বিহঙ্গ-বাসনা" থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি শোনাই:

"আমরা এতক্ষণ একটা সাধারণ মনোপ্লেনের মৌলিক মডেল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে এছাড়া আরও অনেক যন্ত্রপাতি থাকে একটা বাস্তব প্লেন-এ। কিন্তু অত সব জটিলতার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। মোটকথা দেখা গেল, ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিতে আর হেলতে, কিংবা উপরে-নিচে উঠতে বা নামতে পাইলটকে দুটি হাত ও দুটি পায়ের কাজ একই সঙ্গে করতে হচ্ছে। এছাড়া তাকে কানে শুনতে হচ্ছে রেডিও-নির্দেশ, চোখে দেখতে হচ্ছে নানান ইণ্ডিকেটরের রীডিং, মস্তিষ্ক সজাগ রাখতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।

"এর উপর যদি বলা যায়—শূন্যে ডিগ্‌বাজি খাও, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? ডিগবাজি খাওয়ার অর্থ—এই মুহূর্তে তুমি উঠ্‌ছ, এই মুহূর্তে তুমি উল্টে যাচ্ছ এবং পরমুহূর্তেই তুমি উল্টো হয়ে নামছ! হাত-পায়ের কেরামতি প্রতি মুহূর্তেই বদলাতে হবে। এবং

হবে যখন তুমি শির-পা হয়ে উল্টে আছ! ভাবলেই হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যায়!

"সব মানুষ সাঁতার জানে না, সাঁতার তাকে কষ্ট করে শিখতে হয়। অপরপক্ষে সব পাখিই আকাশে উড়তে পারে—এমু বা উট-পাখিদের কথা বাদ দিয়ে বল্‌ছি। তবু মানুষ চিৎ সাঁতার কাটতে পারে, কিন্তু কোন পাখিই আকাশে চিৎ হয়ে ভাসতে পারে না। কারণটা কি? পাখিদের দেহের ভারকেন্দ্র শরীরের এত নিচের দিকে যে, আকাশে ওরা চিৎ হতে পারে না। ওদের ডানা আর দেহের গড়ন এমন যে, ওরা শুধু উবুড় হয়েই আকাশে ভাসতে পারে। এয়ারোপ্লেন বস্তুত বিহঙ্গ-বাসনার ফলশ্রুতি। তার দেহের গড়ন পাখির অনুকরণে, পাখির মতই সে উড়তে শিখেছে। তাই এয়ারোপ্লেনের ভারকেন্দ্রও তার দেহের নিচের দিক ঘেঁষা। অসংখ্য বিহঙ্গের মধ্যে গিরিবাজ লক্কা পায়রা যেমন এক ব্যতিক্রম—খণ্ড-মুহূর্তের জন্য আকাশে চিৎ হয়ে সে ডিগ্‌বাজি খেতে পারে, তেমনি গতিবেগ প্রচণ্ড হলে এবং বৈমানিকের যথেষ্ট দক্ষতা থাকলে সেও আকাশে প্লেনটাকে ডিগবাজি খাওয়াতে পারে। তাকেই বলি 'লুপিং দ্য লুপ্‌'। ইদানীং অনেক বৈমানিকই জেট-প্লেন নিয়ে 'লুপিং দ্য লুপ' করেছেন। বস্তুত জেট-প্লেনের গতিবেগ এত প্রচণ্ড যে, ব্যাপারটা প্রায় ছেলেখেলা হয়ে পড়েছে আধুনিক বৈমানিকদের কাছে। কিন্তু ভুললে চলবে না—রাশিয়ান পাইলট নেস্‌তেরফ্‌ এ কেরামতি প্রথম দেখিয়ে ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, যখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিবেগই ছিল মারাত্মক গতি! তাই বল্‌ব বৈমানিক 'নেসতেরফ্‌' আকাশ-জয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। "আমাদের স্বর্গে ওঠার একটি ধাপ তিনি প্রথম ডিঙিয়েছিলেন।"

নেসতেরফ্‌ থেকে লিণ্ডবার্গ এক যুগের তফাত—দশ বারো বছরের ব্যবধান। ততদিনে 'লুপিং দ্য লুপ্‌' আর কোনও যুগান্তকারী বিস্ময় নয়। সেদিক থেকে বৈমানিক কিঞ্চ্‌কে আমরা অভিনন্দিত করছে

পারি না; কিন্তু লিণ্ডি তার কাছে যে প্রস্তাবটা করল তা ভেবে দেখার। লিণ্ডি তাকে বললে,—'তুমি যখন লুপিং দ্য লুপ করবে তখন আমি বসে থাকব নিরবলম্বভাবে ঐ প্লেনের ডানায়!' এবং সেটাই যে দেখিয়েছিল উইওমিঙ (Wyoming)এর একটি মেলায়।

এতদিনে লিণ্ডবার্গ একজন দক্ষ বৈমানিক। টাকা-পয়সা জমিয়ে সে ইতিমধ্যে একটা প্লেনও কিনে ফেলেছে—নব্বই অশ্বশক্তির একটি কার্টিস্ 'জেনী' প্লেন। ঘণ্টায় সেটা সর্বোচ্চ সত্তর মাইল বেগে চলতে পারে, মাটি থেকে সতের শ' ফুট উপরে উঠ্‌তে পারে। 'মারিয়া'র সঙ্গে যদি ওর 'কাফ্‌ল্যাভ' অর্থাৎ বাল্যপ্রেম হয়ে থাকে তবে বলতে হবে কার্টিস্ জেনী যৌবরাজ্যে তার প্রথম প্রেমিকা। এই প্লেনটি নিয়ে সে মধ্য আমেরিকা চষে বেড়াতে থাকে। নানান রকম কসরত দেখায়, মেলায় গিয়ে 'জয়-রাইড'-এর টিকিট বেচে। যাত্রীদের বিহঙ্গ-বাসনা চরিতার্থ করে।

দুর্ঘটনা কি হয়নি? হয়েছে। ধরা যাক্ সেবার টেক্সাস্-এর ঘটনাটা।

শহরের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ও দেখল ওর প্রেমিকা 'জেনী' ক্ষুধার্ত। পেট্রল কম। শহরের একটি জনবিরল পার্কে সাবধানে ও নেমে পড়ল। লোকজন এল ভিড় করে। লিণ্ডি প্লেন থেকে নেমে কাছাকাছি একটা পেট্রল-স্টেশন থেকে ক্যানে করে পেট্রল নিয়ে এসে ক্ষুধার্ত জেনীকে শান্ত করল। নামতে যতটা জায়গা লাগে উড়তে তার চেয়ে বেশি লাগে। মাপজোখ করে লিণ্ডি দেখল পার্ক থেকে ওড়া যাবে না। পার্কের সামনে একটি রাস্তার ও-প্রান্ত থেকে তাকে স্টার্ট নিতে হবে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, রাস্তার ধারে একটা টেলিগ্রাফ পোস্ট আছে যেখানে রাস্তার বিস্তারটা মাপ-অনুযায়ী ওর প্লেনের বিস্তারের চেয়ে মাত্র তিন ফুট বেশি। এতটুকু ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সে নির্ভুলভাবে গলে যেতে পারবে কি না এ নিয়ে

দর্শকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। লিণ্ডি বললে, সে চেষ্টা করে দেখতে পারে কিন্তু···

জনতা বলে, কিন্তু তো আছেই। তুমি লড়ে যাও ভাই। আমরা তো আছিই—কাছেই টেক্সাস হস্‌পিটাল। সব দায়-দায়িত্ব আমাদের।

একজন বৃদ্ধ ধমক দিয়ে ওঠে, হাসপাতালের কথা উঠ্‌ছে কেন? তুমি লড়ে যাও ভাই! আমরা নয়ন সার্থক করি!

পাগ্‌লাকে 'লা'-ডোবাতে কেউ বারণ করল না। সুতরাং লড়ে গেল লিণ্ডি। দু-পাশে সার দিয়ে দাঁড়ালো দর্শকদল। রাস্তার দূরতম প্রান্ত থেকে জেনীকে স্টার্ট দিল লিণ্ডি। স্থির লক্ষ্যে সে ভীমবেগে এগিয়ে আসছে···

একটা কথা কারও খেয়াল হয়নি। রাস্তাটা মসৃণ নয়; কাঁচা রাস্তা। পীচের নয়, পাকাও নয়। ঐ টেলিগ্রাফ পোস্ট থেকে গজ দশেক আগে একটা ছোটখাটো খন্দে পড়ল একটি চাকা। ফলে লিণ্ডি যতই স্থির লক্ষ্যে থাকুক—অভিমানী জেনী একটু বেঁকে গেল। ব্যস্! প্রচণ্ড জোরে তার একটি পাখ্‌না ধাক্কা মারল টেলিগ্রাফ পোস্টে। জেনীর কোন ক্ষতি হয়নি, হল পার্শ্ববর্তী দোকানটার। টেলিগ্রাফের পোস্টটা উপড়ে পড়ল তার উপর। শো-কেস ভাঙল। কাচের তাকে সাজানো একরাশ চীনামাটির বাসন ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে পড়ল।

লিণ্ডি থামালো প্লেনটা। কক্‌পিট থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, দোকানের মালিক কে? কত ক্ষতি হয়েছে?—হিপ-পকেট থেকে মানিব্যাগটা সে টেনে বার করে।

ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে আসে সেই বৃদ্ধ: "A great moment, a great moment! It was worth every broken plate in the store. [এ আমার জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। তুমি যা দেখালে ভায়া, তার দাম ঐ কটা ভাঙা কাপডিশের অনেক বেশি!]

বৃদ্ধ কোনও ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করে।

এর কিছুদিন পরেই লিণ্ডি খবর পেল ওর বাবা পুনরায় ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। খবরের কাগজে খবরটা পেয়েই সে তার জেনীকে নিয়ে উড়ে চললো বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

ওর বাবা তো ওকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। সেবার মারিয়ার সাহায্যে লিণ্ডি বাবাকে জিতিয়ে দিয়েছিল, এবারও জেনীর সাহায্যে নিশ্চয় জিতিয়ে দেবে। সেটা ১৯২৩ সাল। লিণ্ডির বয়স তখন একুশ। এতদিনে সে অনেক কিছু বুঝতে পারে—সে এতদিনে জেনেছে, কেন সেবার ওরা গাড়ি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েছিল। এবার সে দুর্ঘটনা সে কিছুতেই হতে দেবে না। এবার বাপিকে সে জিতিয়ে দেবেই! শুধু তাই নয়—এবার বাপির বিজয় উৎসব পালন করতে হোস্টেস হতে হবে ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ডলজ লিণ্ডবার্গকে। সোজা কথায় সে মা-মণিকে আর একা একা লিণ্ডবার্গ ভিলায় থাকতে দেবে না। দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে—একে অপরের উপর নির্ভরশীল হলেই এ বয়সে শান্তিতে থাকবেন। অন্তত সেজন্যও বাপিকে এবার নির্বাচনে জয়যুক্ত হতে হবে। লিণ্ডি যা ধরে তা করে ছাড়ে। এবারও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এবার আক্রমণ এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে—যার বিরুদ্ধে কোন হাতিয়ার নেই।

নির্বাচনের জয়-পরাজয় নিরর্থক হয়ে গেল। ফলাফল ঘোষিত হবার আগেই। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় সিনিয়ার লিণ্ডবার্গকে ভর্তি করা হল মিনেসোটার সেন্ট, ভিনসেণ্ট হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে বললেন—ব্রেন-টিউমার। সে আমলে তা ছিল শল্য-চিকিৎসার বাইরে। ২৪শে মে ১৯২৪ সিনিয়ার লিণ্ডবার্গ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

॥ ছয় ॥

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬।

তার মানে প্রায় আড়াই বছর পরের কথা।

ইতিমধ্যে অনেক জল বয়ে গেছে মিসিসিপি দিয়ে—অনেক অনেক কাঠের গুঁড়ি ভেসে গেছে লিণ্ডবার্গ-ভিলার ধার দিয়ে। ঈভাঞ্জেলিন এখন আছেন ডেট্রয়েটে—মাঝে মাঝে লিট্‌ল্ ফল্‌সে আসেন। তখন ঘরদোর সাফা করানো হয়। লিণ্ডবার্গ-ভিলায় মোমবাতি জ্বলতে দেখা যায়। কিন্তু বছরের বেশির ভাগ সময়েই তিনি তাঁর পৈত্রিক আবাসে ডেট্রয়েটে কাটান। ছেলের সঙ্গে দেখা হয় ন-মাসে ছ-মাসে। সে যদি প্লেন নিয়ে ও পাড়ায় যায়।

লিণ্ডিও অনেক ঘাটে জল খেয়েছে ইতিমধ্যে। বার্নস্টর্মিং বা বিমানের কায়দা দেখানোর ব্যবসাটা আর লাভজনক নয়। এ কয় বছরে অনেক অনেক প্রতিযোগী ভিড়ে পড়ছিল ব্যবসাটায়। লোকেও আর প্লেনে চড়ায় তেমন উৎসাহী নয়; ওটা যেন ক্রমে গা-সওয়া হয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে জেনীকে বেচে দিয়েছিল লিণ্ডি। আমেরিকার সৈন্যবিভাগে এয়ার-কোরে নাম লিখিয়েছিল। পুরো কোর্স নিয়ে সে রিজার্ভ ফোর্সে আছে। ঐ সময় একটি কোম্পানি সারা আমেরিকায় বিমানে ডাক বিলি করার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিল। তাদের প্রয়োজন হল বৈমানিক। স্লিম লিণ্ডবার্গ এখন সেখানেই চাকরি করছে। শিকাগো থেকে সেণ্ট লুই। যাওয়া আর আসা। ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে বিরাম নেই—'হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন জোনাকিরা দেয় আলো।' রানার লিণ্ডি নিরলস উড্ডয়নে একক যাত্রী—শিকাগো থেকে সেণ্ট লুই, সেণ্ট লুই থেকে শিকাগো।

যে কথা বলছিলাম। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬। বিকেলবেলা।

চার্লস লিণ্ডবার্গের হাতে কোন কাজ ছিল না। সকালে মেলব্যাগ পৌঁছে দিয়েছে। আজ রাত্রে বিশ্রাম—আছে শিকাগোর কংগ্রেস হোটেলে। কাল ভোরে আবার ডাকব্যাগ নিয়ে রওনা দেবে সেন্ট লুইয়ের দিকে। নেহাত সন্ধ্যাটা কাটাতে সে ঢুকে পড়ল একটা সিনেমা হলে। সিনেমা দেখা ওর ধাতে নেই। কস্মিন্‌কালেও যায় না। বিখ্যাত হবার পর একবার একটি ডিনার পার্টিতে একজন ওর সঙ্গে আমেরিকার সুপার স্টার লিলিয়ান গীস্‌-এর পরিচয় করিয়ে দেয়। গীস্‌ ছিলেন সে আমলে দু-নম্বর মার্কিন অভিনেত্রী। গ্রেটা গার্বো যদি 'ভেনাস্‌' তবে গীস্‌ ঔজ্জ্বল্যে 'জুপিটার'! লিণ্ডবার্গ সৌজন্য-রক্ষার্থে তাঁকে হাউ ডু-য়ু-ডু করে জনান্তিকে ধর্মপত্নীকে প্রশ্ন করেছিলেন: মহিলাটি কে?

বলাবাহুল্য চাপা ধমক শুনতে হয়েছিল পরিবর্তে।

যাক, সে তো অনেক পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় লিণ্ডি যে ছবিটি দেখতে গেল তার নাম—ওর দিনপঞ্জিকায় দেখছি—'হোয়াট প্রাইস গ্লোরি?' নামটা উল্লেখ করে গেলাম দুটি কারণে। প্রথমত, এই ছবিটি দেখতে গিয়েই তার জীবনে একটা প্রকাণ্ড দিক-পরিবর্তন হল। দ্বিতীয়ত, ছবিটির নামের মধ্যে অলক্ষ্য ভাগ্যদেবতার একটা নিদারুণ তির্যক্‌ ব্যঙ্গ ছিল—যে কথা পাঠক অনুধাবন করবেন ক্রমশ। সেদিন লিণ্ডি আদৌ খেয়াল করেনি, ছবিটার টাইটেল What Price Glory? অর্থাৎ "বিখ্যাত হওয়ার কী মূল্য?"

সিনেমা শুরু হওয়ার আগে একটা নিউজ রীল। হঠাৎ নিজের সীটে সোজা হয়ে বসল লিণ্ডি—বিষয়টা এয়ারোপ্লেন সংক্রান্ত। রূপালী পর্দায় ভেসে উঠল প্রকাণ্ড একটা বাই প্লেন—নিউইয়র্ক লং আইল্যাণ্ডে সেটি তৈরী হচ্ছে—ডিজাইনার ঈগর সিকর্স্কি। হ্যাঙার থেকে সেটা যখন বেরিয়ে এসে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন প্রেক্ষাগৃহের একটি মাত্র দর্শকের চোখ অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। সিকর্স্কির প্লেনে আছে তিনটি এঞ্জিন, চারজন যাত্রীকে

বইতে পারে। তার পরেই পর্দায় দেখা গেল একজন খর্বকায় বৈমানিক। সে আমলে চিত্র সবাক ছিল না, বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল ঐ খর্বকায় ব্যক্তিটির নাম কাপিতান রেনি ফংক। বৈমানিক! বৈমানিক? অত বেঁটে? হাসি পেল লিণ্ডির। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা মানুষটা যখন ঐ বিশালকায় আকাশযানে চড়ে বসল তখন পর্দায় লেখা পড়ল: রেনি! 'এস্ পাইলট'! এই বিমানে তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে চড়ে যাবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সংকল্প! অতলান্তিক পাড়ি দেবেন একবারও না থেমে।

ক্লোস আপ। কাপিতেন রেনির হাসি হাসি মুখ।

ক্যাপসান: 'প্যারিস! আমি এসে গেছি!'

নিউজ রীল শেষ হল চিত্র-নির্মাতার শুভেচ্ছায়: কাপিতান রেনি ফংক অর্টেগ প্রাইজ জিতবেন এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস! আমাদের শুভকামনা রইল।

অর্টেগ পুরস্কার! সেটা কি? লোকটা কেন ঐ বিশাল এয়ারো-প্লেনটা নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে না-থেমে প্যারিস উড়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প? মাথায় উঠল সিনেমা দেখা। অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সামনেই খবরের কাগজের স্টল। দীর্ঘদিন ও দৈনিকপত্র পড়ে না। খানকতক কাগজ কিনে সরে এল রাস্তায়, বিজলিবাতির তলায়। কী আশ্চর্য! সব কাগজেই খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। খবরের কাগজের ধার ধারে না এবং নিতান্ত একা থাকতে অভ্যস্ত বলে লিণ্ডি এত বড় খবরটা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

'অর্টেগ পুরস্কার' ঘোষণা করেছেন বিখ্যাত ফরাসী ধনকুবের রেমণ্ড অর্টেগ। নিউইয়র্কে তাঁর একাধিক আকাশচুম্বী হোটেল আছে। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী প্রাইজটা দেওয়া হবে "Who shall cross the Atlantic in a land or water aircraft, heavier than air, from Paris or the shores of France to New York,

or from New York to Paris or the shores of France, without stop." [যে ব্যক্তি কোন একটি আকাশযানে, বেলুনে নয়, নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস অথবা ফ্রান্সের যে-কোন ভূখণ্ড থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত না থেমে উড়ে যেতে পারবে]

প্রাইজটার মূল্যমান পঁচিশ হাজার ডলার। অর্থাৎ আজকের হিসাবে বারো লক্ষ টাকা !

প্রাইজটা ঘোষিত হওয়ার পিছনেও আছে একটি নাটকীয় ঘটনা।

বিশ্বযুদ্ধের পরে, ১৯১৯ সালে আমেরিকার এয়ারো ক্লাব ক্যাপ্টেন রিকেনবেকারকে সংবর্ধনা জানাতে একটি ডিনারের আয়োজন করে। ক্যাপ্টেন রিকেনবেকার ছিলেন একজন ace pilot—পশ্চিম রণাঙ্গনে দুর্ধর্ষ বৈমানিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সায়মাশান্তিক ভাষণে সকলেই ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সৌহার্দ্যের উপর জোর দেন—যুদ্ধকালে যেমন দুজনে হাতে হাত মিলিয়েছিল শান্তির সময়ে সৌহার্দ্যটা তার চেয়েও বেশি হবে এমন একটা বক্তব্য ছিল সকলের বক্তৃতায়। রিকেনবেকার তাঁর ভাষণে বললেন, সেদিন আর দূরে নয় যখন মানুষ না-থেমে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করবে।

তার পরেই ছিল ফরাসী ধনকুবের অর্টেগ-এর ভাষণ। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি ঐ পুরস্কার ঘোষণা করে বসলেন।

সে আজ সাত বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে কেউ সে দুঃসাহস দেখায়নি। ১৯১৯ সালে জন অ্যালকক্ এবং আর্থার ব্রাউন অবশ্য নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে উড়ে যান। "বিহঙ্গ বাসনা" গ্রন্থে সে-কথা বিস্তারিত বলেছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু তাঁরা গিয়েছিলেন ১৯০০ মাইল—নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসের দূরত্ব অন্তত-পক্ষে সাড়ে তিন হাজার মাইল।

সেই মুহূর্তটি থেকেই সম্পূর্ণ বদলে গেল লিণ্ডি। দৃঢ় সংকল্প করল

মনে মনে, যেমন করেই হোক, ঐ প্রাইজ তাকে জিততেই হবে"।
একটু খোঁজখবর নিতেই জানা গেল বর্তমান পরিস্থিতি।

অর্টেগ প্রতিযোগিতার আসরে তখন তিনজন প্রতিযোগী। সমস্ত পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—কে প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হবে, কে পাবে প্রাইজ।

এক নম্বর প্রতিযোগী—ঐ যার ছবি ও দেখল সিনেমায়। কাপিতান ফংক। তাঁর আকাশযান অতি বিশাল। অতলান্তিক পাড়ি জমাবার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত। ডিজাইনার, আগেই বলেছি, ঈগর সিকর্স্কি। কাপিতান ফংক একজন দক্ষ বৈমানিক—যতই কেন না খর্বকায় হন তিনি। ইউরোপ-খণ্ডে বহুবার দূরপাল্লায় ইতিমধ্যেই পাড়ি জমিয়েছেন, বিশ্বযুদ্ধেও একজন 'এস্ পাইলট' হিসাবে সম্মানিত। কিন্তু কয়েকটি খটকা লেগে থাকল লিণ্ডবার্গের মনে। চার-চারজন যাত্রী নেবার কী দরকার? অহেতুক ওজন বৃদ্ধি। তারপর শোনা গেল, ওঁদের সবরকম ব্যবস্থাই রাজকীয়—দু-দুটো রেডিও সেট চলেছে সাথে, একটা সর্ট ওয়েভ; একটা লঙ ওয়েভ। সঙ্গে চলেছে বিছানা, পালা করে যাতে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, মায় উনুন—রান্না করে খাওয়ার উপকরণ। নাঃ! ব্যবস্থাটা আদৌ মনঃপূত হল না লিণ্ডির। ওঁদের ঘোষিত ওজনটা বড় বেশি—আটাশ হাজার পাউণ্ড! তিন-এঞ্জিন-ওয়ালা প্লেনের পক্ষেও সেটা যেন বাড়াবাড়ি—লিণ্ডির মতে।

দু-নম্বর প্রতিযোগী বিখ্যাত বৈমানিক কমাণ্ডার রিচার্ড বায়ার্ড স্বয়ং। তিনি নাকি পূর্ব বৎসর উত্তর-মেরুর উপর দিয়ে উড়ে এসেছেন। তিনি কোন জাতের প্লেন নিয়ে উড়বেন সে সংবাদ এখনও গোপন রেখেছেন। তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেকেই আশান্বিত।

তিন-নম্বর প্রতিযোগী লেফটানেণ্ট কমাণ্ডার নোয়েল ডেভিস। তিনিও দুর্ধর্ষ বৈমানিক!

যতদূর জানা যায় তিনজনেই প্রস্তুত। যে কোনদিন তাঁরা নিউইয়র্ক থেকে উড়তে পারেন। ফ্রান্স থেকে উল্টোমুখে উড়ে আসবার জন্যও

অনেকে প্রস্তুত হচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ সঠিকভাবে পাওয়া গেল না।

লিণ্ডি যতই চিন্তা করে, ততই ওর মনে হয় এ পুরস্কার সেই জিতবে, যদি সে মনোমত একটা প্লেন জোগাড় করতে পারে। শিকাগো-সেণ্ট লুইয়ের মধ্যে ডাকহরকরা যাতায়াত করে আর মনে মনে হিসাব কষে। সুযোগ পেলেই খাতা পেনসিল নিয়ে বসে যায় নক্শা আঁকতে। কী জাতের প্লেন হবে, কতটা পেট্রোল নিতে হবে, কতটা রসদ, যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র।

উৎসাহের আতিশয্যে একদিন সে এসে হাজির হল আর্ল টমসনের কাছে। টমসন একজন প্রভাবশালী এবং ধনী জীবনবীমার দালাল। মনের কথা খুলে বললে লিণ্ডি। বললে, কিছু টাকার জোগাড় হলে সে ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চায়। এমন একখানা প্লেন চাই যাতে সে একা—সম্পূর্ণ একাই, ঐ অতলান্তিকে পাড়ি জমাবে। স্বভাবতই প্রথমটা টমসন পাত্তা দেননি। লিণ্ডি তখন বললে, আপনি যদি ব্যবস্থা করে দেন স্যার, তবে আমি এজন্য আমার শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজী। ব্যাঙ্কে আমার মাত্র দু-হাজার ডলার আছে।

টমসন বললেন. ভেবে দেখি।

কথাটা কানে গেল মেজর ল্যামবার্টের। সেণ্ট লুই এয়ারপোর্ট যাঁর নামে। শুনে তিনি নিজে থেকেই বললেন, দেখাই যাক না চেষ্টা করে। লিণ্ডির দু হাজারের সঙ্গে আমার একটা হাজার ডলারের চেক জমা করে নাও।

ফ্রাঙ্ক রবার্টসন, লিণ্ডির 'বস্', শুনে বললেন, ঠিক আছে, আমিও কিছু দেব, কিন্তু এভাবে হবে না। চল, তোমাকে নিয়ে যাই কোন সংবাদপত্রের মালিকের কাছে। খবরের কাগজ পিছন থেকে মদৎ না দিলে এসব কাজ হয় না।

সেণ্ট লুই শহরের সবচেয়ে নামকরা দৈনিক সংবাদপত্র পোস্ট-ডিস্প্যাচ। কিন্তু সম্পাদকমশাই আদৌ উৎসাহিত হলেন না। যখনই

শুনলেন লিণ্ডবার্গ একা অতলান্তিক পাড়ি দিতে চাইছে এবং কোন হাল্‌কা-ধরনের একক-ইঞ্জিন আকাশযানে, অমনি তিনি মুখ বাঁকালেন। রবার্টসন ওর হয়ে সুপারিশ করলেন যথেষ্ট : কিছু হল না। শেষবেলা সম্পাদকমশাই বলেই ফেললেন : দেখুন মশাই,—প্যারাসুট নিয়ে লাফানো, প্লেনের ডানার উপর হাঁটা অথবা 'লুপিং দ্য লুপে'র সময় কক্‌পিটের বাইরে থাকার জন্য যতবার বলেন ততবার হাততালি দিতে রাজী আছি ; অতলান্তিক পাড়ি দেওয়া একেবারে অন্য জাতের জিনিস। আমার কাগজের একটা সুনাম আছে। আমি এ ধাষ্টামোর মধ্যে নেই। সোজা কথা!

সব বড় শহরেই যেমন হয়, সংবাদপত্র একাধিক এবং তাদের রেশারেশি লেগেই আছে। পোস্ট-ডিস্‌প্যাচ চার্লস্ লিণ্ডবার্গের উৎসাহে বরফগলা ঠাণ্ডা জল ঢেলেছে সংবাদ পেয়ে দু-নম্বর কাগজ 'গ্লোব-ডেমক্রাট'-এর হ্যারি নাইট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। হ্যারল্ড বিক্সবি—আর একজন প্রভাবশালী ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টও ওকে পাঠিযে দিলেন একটা চেক—ওর প্রচেষ্টায় চাঁদা-স্বরূপ। লিণ্ডির উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং দৃঢ় সংকল্পে শেষবেশ আর্ল টমসনও এসে দাঁড়ালেন ওর পাশে। লিণ্ডি হিসাব করে দেখল, এতদিনে তার জমার খাতে পড়েছে পনের হাজার ডলার! কম নয়! এ টাকায় একটা প্লেন খরিদ করা চলে বটে।

কিন্তু কী জাতের প্লেন?

না 'ফকার' নয়! ফকার খুব নামকরা কোম্পানি—কিন্তু সে কোম্পানির সেল্‌সম্যানের সঙ্গে ইতিপূর্বেই এক হাত হয়ে গেছে। মেজর ল্যামবার্টের আহ্বানে সেই সেল্‌সম্যান ভদ্রলোক একদিন এসেছিলেন ওদের দপ্তরে। লিণ্ডির পরিকল্পনা শুনে মাথা নেড়ে বলেছিলেন 'মিস্টার ফকার এ জাতীয় হঠকারিতার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে রাজী হবেন না।'

ফকারের পরেই উল্লেখযোগ্য নাম—'রাইট বেলাঙ্কা'। তাদের

প্লেন ওর পছন্দসই। দামও পনের হাজার ডলারের নিচে। সুতরাং মনস্থির করে সে নিউইয়র্কে টেলিগ্রাম করল। নিউইয়র্কেই ঐ কোম্পানির হেড অফিস। বড়কর্তা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'সাক্ষাতে কথাবার্তা বলুন।' চেক নিয়ে লিণ্ডি ছুটল নিউইয়র্কে। রাইট বেলাঙ্কা কোম্পানির বড়কর্তা চার্লস্ লেভিন। মহা সমাদরে তিনি লিণ্ডিকে অভ্যর্থনা করলেন। হ্যাঁ, লেভিনও মনে করেন তাঁর তৈরী সিঙ্গল-এঞ্জিন প্লেন দক্ষ বৈমানিকের হাতে পড়লে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিতে পারে। এ পরিকল্পনায় অংশ নিতে তিনি রাজী। তাঁর প্লেনই যদি অর্টেগ প্রাইজ জেতে তবে কোম্পানির যথেষ্ট সুনাম হবে। না, দাম তিনি পনের হাজার ডলারের বেশি দাবী করবেন না মিস্টার লিণ্ডবার্গের কাছে। তাঁর শুধু একটিমাত্র শর্ত : কে প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে যাবে তা তিনিই স্থির করবেন!

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে লিণ্ডির। সে বুঝতে পারে, লেভিন তলে তলে কথাবার্তা চালাচ্ছেন তার অপর কোন প্রতিযোগীর সঙ্গে। এক নম্বর প্রতিযোগী কাপিতান ফংক বেছে নিয়েছেন সিকর্স্কির মডেল। দু'নম্বর প্রতিযোগী কমাণ্ডার বায়াডও ইতিমধ্যে নির্বাচন করেছেন তাঁর প্লেনের মডেল—তিন-এঞ্জিন-ওয়ালা একটি ফকার প্লেন। তার দামই নাকি এক লক্ষ ডলার। তাই লেভিনের এখন লক্ষ্য তিন-নম্বর প্রতিযোগী লেঃ কমাণ্ডার নোয়েল ডেভিস্-এর উপর। নামগোত্রহীন চার্লস্ লিণ্ডবার্গকে সে তার স্বপ্নসাফল্যের সওয়ার হতেই দেবে না।

অপমানিত ব্যর্থ লিণ্ডি ফিরে এল সেণ্ট লুইতে। হিসাব কষতে বসল—তার পুঁজির ভিতর কতটা অহেতুক খরচ হল নিউইয়র্ক যাতায়াতে।

অর্থ, অর্থ, আরও অর্থের প্রয়োজন। ওভারটাইম ডিউটি নিতে শুরু করল লিণ্ডি। এতদিন দিনে একবার ডাক নিয়ে যেত, সপ্তাহে দুদিন বিশ্রাম—এখন দিনে দুবার ডাক নিয়ে যায়, ছুটি বলে কিছু

থাকল না তার ক্যালেণ্ডারে। রাত জেগে সে একটা প্লেনের মডেলও বানিয়ে ফেলল। মডেল নয়, নক্‌শা—প্ল্যান, এলিভেশান, সেকশান। বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন তালিকা। ঠিক যেখানে যেমনটি চায়। তারপর দশ বিশ কপি নক্‌শা সে পাঠিয়ে দিল মার্কিন মুলুকের সব কয়টা নামকরা এয়ারোপ্লেন তৈরীর কারখানায়। এই নক্‌শা অনুযায়ী একটি মনোপ্লেন তারা বানিয়ে দিতে পারে কিনা, পারলে কতদিনে এবং কী দামে।

জবাব এল একে একে। সবই হতাশাব্যঞ্জক। কেউ সরাসরি লিখেছে—'আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, আমরা নিজেদের ডিজাইনেই প্লেন বানাই—অর্ডার-মাফিক কাজ করি না।' কেউ রাজী হয়েছে, কিন্তু দাম চেয়েছে ওর পকেট-ছাপানো; কেউ বা দামটা চেয়েছে পনের হাজারের ভিতরেই কিন্তু সময় চেয়েছে অত্যন্ত বেশি। একমাত্র একটি কোম্পানি জানিয়েছে তারা এ বিষয়ে উৎসাহী—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা ঐ দামে সেটা শেষ করে দিতে পারে, অর্ডার পেলে। কিন্তু কোম্পানিটা আদৌ নামকরা নয়—কালিফোর্নিয়ায় সান ডিয়াগোতে অবস্থিত ঐ রায়ান এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ কোম্পানি কোনও খানদানী প্রতিষ্ঠান নয়।

হতাশ হয়ে বেচারী একদিন এসে দেখা করল হ্যারী নাইট-এর সঙ্গে। বললে, স্যার! আমার দুর্ভাগ্য! এ হবার নয়। আমি ও আশা ত্যাগ করেছি। এবার আপনারা আমাকে যে যতটা চাঁদা দিয়েছিলেন ফেরত নিন!

গ্নোব-ডেমক্রাট কাগজের অফিসেই কথা হচ্ছিল। হ্যারী নাইট একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন লিণ্ডিকে। এ কয়মাসে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বেচারী যেন আধখানা হয়ে গেছে। পকেট থেকে চেকবুক বার করে লিণ্ডি ওঁর গ্লাস টপ্‌ টেবিলে রাখল। কিন্তু চেকটা লিখবার উপক্রম করতেই তিনি চেপে ধরলেন ওর হাত। বললেন, একটু অপেক্ষা কর। আমি হ্যারল্ড বিক্সবিকে প্রথমে একটা ফোন করে দেখি।

ফোনটা তুলে নিয়ে বিক্সবির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। হ্যারল্ড বিক্সবি তাঁর ব্যাঙ্কেই ছিলেন। হ্যারী নাইট সংক্ষেপে শুধু বললেন, বিক্সবি, আমি নাইট বলছি। আজ লাঞ্চে তোমার কোনও প্রোগ্রাম আছে?···নেই ? ভালই হ'ল। শোন, স্লিম্ লিণ্ডবার্গ আমার সামনে বসে আছে। বেচারী ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে। এস, আজ আমরা তিনজন একসঙ্গে লাঞ্চ করি। অনেক কথা আছে।···থ্যাঙ্কু !

লাঞ্চের টেবিলে তুই প্রধান ব্যক্তি লিণ্ডিকে চেপে ধরলেন। হ্যারী নাইট বললেন, এত সহজে ভেঙে পড়লে তো চলবে না লিণ্ডি! তুমি শেষ চেষ্টা করে দেখ। চলে যাও সান ডিয়াগো। স্বচক্ষে দেখে এস ওদের কারখানাটা কি জাতের—ওরা পারবে কি না।

বিক্সবি আর এক কাঠি উপরে উঠলেন। বললেন, ইয়াং ম্যান, তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি বেঁচে থাকলে যে-কথা বলতেন, সেটা তাঁর হয়ে আমিই বল্‌ছি। এত সহজে তোমাকে হার মানতে দেব না আমরা। তুমি ঐ ডাক-হরকরার কাজে ইস্তফা দাও। তোমার হাত-খরচের টাকা আপাতত আমিই দেব। তুমি নেক্সট প্লেনে সান ডিয়াগো রওনা দাও দিকি !

চোখ তুটো ছলছল করে ওঠে লিণ্ডির। তাহলে স্বপ্ন সে একাই দেখছে না !

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭। হ্যারী নাইটের টেবিলে পৌছালো সান ডিয়াগো থেকে একটি টেলিগ্রাম :

> BELIEVE RYAN CAPABLE OF BUILDING PLANE WITH SUFFICIENT PERFORMANCE AAA COST COMPLETE WITH WHIRLWIND ENGINE AND STANDARD INSTRUMENTS IS TEN THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY DOLLARS AAA DELIVERY WITHIN SIXTY DAYS AAA RECOMMEND CLOSING DEAL—LINDBERGH.

[বিশ্বাস হচ্ছে, রায়ান উপযুক্ত বিমান নির্মাণে সক্ষম। যন্ত্রপাতি-সমেত দাম দশ হাজার পাঁচশ আশি ডলার। ষাট দিনে শেষ হবে। চুক্তি সম্পন্ন করায় সুপারিশ করছি। লিণ্ডবার্গ]

তৎক্ষণাৎ হ্যারী নাইট জবাব দিলেন : রায়ান কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি শেষ কর।

লিণ্ডি ফিরে এল না। ঐ কারখানাতেই রয়ে গেল। দিবারাত্র সে ওদের সঙ্গে কাজ করছে। ওর চোখের সামনেই তিল তিল করে তৈরী হচ্ছে ওর তিলোত্তমা।

এদিকে অন্যান্য প্রতিযোগীরাও বসে নেই। ঘটে গেছে অনেক ঘটনা।

মাস পাঁচেক আগে, ২০ সেপ্টেম্বর, রেনি ফংক তাঁর সেই বিশাল আকাশযান নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার গ্যালন পেট্রোল নিয়ে সিকর্স্কির দৈত্যযান চারজন যাত্রীকে নিয়ে রওনা দিল লং আইল্যাণ্ডের রুজভেল্ট এয়ারোড্রাম থেকে। শত শত ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক করে উঠল। সাংবাদিকের ভিড়ে সেদিন অতবড় এয়ারফিল্ড লোকারণ্য। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! প্লেনটা মাটি ছেড়ে উড়তেই পারল না। সোজা গিয়ে ধাক্কা লাগালো সামনের পাঁচিলে। যা অনিবার্য তাই ঘটল। আড়াই হাজার গ্যালন পেট্রোলে আগুন লেগে গেল। ফংক কোনক্রমে কক্‌পিট থেকে লাফিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। তাঁর দুজন সহযাত্রীর দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল না সেই বহ্নিস্তূপে।

সংবাদে প্রকাশ, তাতে আদৌ হতাশ হননি কাপিতান ফংক অথবা ডিজাইনার সিকর্স্কি। তাঁরা দুজনেই উঠে পড়ে লেগেছেন দ্বিতীয় একটি প্লেন তৈরী করতে। অর্থের অভাব নেই তাঁদের।

দ্বিতীয় প্রতিযোগী কমাণ্ডার বায়াড-এর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন নয়। তিন-ইঞ্জিন বিশিষ্ট যে ফকার প্লেনটি নিয়ে তিনি অভিযাত্রা করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেটিও আহত হয়েছে পরীক্ষামূলক ওড়ার সময়।

বায়াভসহ সব কয়জন যাত্রীই আহত হয়ে হাসপাতালে—তবে আঘাত কারও মারাত্মক নয়। প্লেনসহ যাত্রীরা সবাই ক্রমশ আরোগ্যের পথে।

তিন নম্বর প্রতিযোগী সেই রাইট-বেলাঙ্কা প্লেন। যেটা খরিদ করতে লিণ্ডি নিউইয়র্ক পর্যন্ত দৌড়েছিল। না, সেটা লেঃ কমাণ্ডার নোয়েল ডেভিস্ চালাবেন না। সেটার খবর আশাপ্রদ—মানে আশঙ্কাপ্রদ, লিণ্ডির তরফে। ফকার দুর্ঘটনার দুদিন আগে সেটা তিনজন যাত্রী নিয়ে রওনা দেয়। মালিক চার্লস্ লেভিন স্বয়ং এবং দুজন বৈমানিক—চেম্বারলেন এবং আর একজন। সেবারও খুব হৈচৈ হল কাগজে। প্লেনটা অতলান্তিকের উপর পাক্কা একান্ন ঘণ্টা পাক মেরেছে—ঐ সময়ে সে শুধু প্যারিস কেন, প্রায় মস্কো চলে যেতে পারত। কিন্তু পারেনি। পথ ভুলে শেষবেশ ফিরে এসেছে আমড়াতলার মোড়েই! নামবার সময় অবশ্য একটা চাকা জখম হয়েছে—আঘাত মারাত্মক নয়—যে-কোন মুহূর্তে সে আবার রওনা হতে পারে।

সবচেয়ে মর্মন্তুদ সংবাদ লেঃ কমাণ্ডার নোয়েল ডেভিস্ এবং তাঁর সহযোগী উস্টার-এর। তাঁদের আকাশযান মাটি ছেড়ে উঠেছিল—কিন্তু শেষবেশ টাল সামলাতে পারেনি। দুর্ঘটনায় দুজনেই মারা গেছেন! ঘটনা ২৪শে এপ্রিলের।

তার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, ২৬শে এপ্রিল সান ডিয়াগোর কারখানায় লিণ্ডবার্গের সদ্যোজাত প্লেনটি হ্যাঙার থেকে মাটিতে নামল। তৎক্ষণাৎ সে একটা পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন চেষ্টা করে দেখল। হ্যাঁ, কোনও অসুবিধা নেই। অনায়াস ভঙ্গিতে হাল্কা-ধরনের প্লেনটা উঠল, উড়ল, নামল। লিণ্ডি খুশিতে ডগমগ। ঠিক এই জাতের বাহনই চাইছিল সে। ওর আকাশযানের নামকরণ করা হল "স্পিরিট অফ্ সেণ্ট লুই"।

শেষ মুহূর্তের টুকটাক্ মেরামতির পর প্রায় পুরো পেট্রোল ট্যাঙ্কে ভরে লিণ্ডি পরীক্ষামূলক আকাশচারণ সারল ৪ঠা মে। ফিরে এসে

বললে, সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। টাকাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে এবার সে নিউইয়র্ক ফিরবার জন্য প্রস্তুত হল। অর্টেগ প্রাইজের শর্ত অনুযায়ী তাকে রওনা হতে হবে নিউইয়র্কের কোনও এয়ারোড্রাম থেকে। স্থির হল ৮ই মে সে সান ডিয়াগো থেকে নিউইয়র্ক উড়ে যাবে।

ঐ আট তারিখ সকালে সংবাদপত্র খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল লিণ্ডি। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় হরফে ছাপা: "অতলান্তিকের উপরে বৈমানিক নান্‌গেমার"। তার নিচে মাঝারি হরফে "অর্টেগ প্রাইজের শেষ সমাধান আসন্ন"। এবং তার তলায় বিস্তারিত সংবাদ:

> "আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিস থেকে পশ্চিমমুখো রওনা হয়েছেন দুজন বিখ্যাত বৈমানিক—ক্যাপ্টেন নান্‌গেমার এবং ফ্রাঁসোয়া কোলি। অর্টেগ প্রাইজ ছিনিয়ে নিতে। ওঁদের বিমানের নাম L'Oisean Blanc (শুভ্র-বিহঙ্গ)—কারণ আকাশযান ধপধপে সাদা। বর্তমানে তাঁরা অতলান্তিকের উপরে। কোনও বিপাকে না পড়লে আগামীকাল তাঁরা নিউইয়র্কে উপনীত হবেন। নিউইয়র্ক তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।"

তাহলে এই ছিল বিধাতার মনে!—ভাবলে লিণ্ডি। এত চেষ্টা, এত ছোটাছুটি, এত অর্থব্যয় শুধু শেষ বাজিতে হেরে যেতে। খবরের কাগজটা গুটিয়ে রেখে লিণ্ডি তার সুটকেস থেকে বার করল একখানা পৃথিবীর ম্যাপ। সানফ্রান্সিস্কো থেকে টোকিও কতদূর? অর্টেগ প্রাইজ নাই পাক—ট্রান্স-প্যাসিফিক সোলো ফ্লাইট চেষ্টা করে দেখবে?

হুড়মুড়িয়ে ওর ঘরে ঢুকল মেকানিক ডোনাল্ড হল! বললে, চার্লি, আজকের কাগজ দেখেছ?

লিণ্ডি জবাব দিল না। মুখ তুলে শুধু চাইল। সে চাহনি সবাক। ডোনাল্ড হল এগিয়ে এসে ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললে, "আই হোপ্‌ দে ডোণ্ট মেক্‌ ইট!"

বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে দাঁড়াল চার্লস লিণ্ডবার্গ। বন্ধুর করমুষ্টি থেকে

টেনে নিল হাতটা। ধমকের সুরে বললে, ছিঃ! ও-কথা বল না! ও-কথা বলতে নেই!

হল হাসে। বোঝে, ধমকটা লিণ্ডি তাকে দেয়নি। দিয়েছে নিজেকেই, কারণ মনে মনে সে বোধহয় এতক্ষণ ঐ কথাই ভাবছিল : হয়তো ওরা বিফল হবে!

তাই ছিনিয়ে নেওয়া হাতটা টেনে নিয়ে ডোনাল্ড হল পুনরায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, জানি বন্ধু! তোমার মনের ভিতরটা এখন কী রকম করছে।

এবার লিণ্ডি বললে, আমি প্রশান্ত মহাসাগরের কথা ভাবছিলাম হল, অতলান্তিক নয়।

: বুঝেছি! চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করেই দেখ না!

পরদিন সংবাদপত্র পড়ে মনে হল 'শুভ্র বিহঙ্গ' প্রায় সফল হয়ে গেছে। কেপ রেস্-এর কাছে একটি মার্কিন জাহাজ তাকে দেখতে পেয়েছে, ওরা সোজা উড়ে এসেছে। সমস্ত দিন রেডিওতে নানান ঘোষণা—গান-বক্তৃতা-আলোচনা বারে বারে থামিয়ে ঘোষক জানাচ্ছে 'শুভ্র বিহঙ্গে'র খণ্ড-সংবাদ, যখন যেটুকু জানা যাচ্ছে। ওরা অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন ভূখণ্ডের আকাশে নাকি পৌঁচেছে, পোর্টল্যাণ্ডের আকাশে দেখা গেছে ফেনশুভ্র আকাশযানকে, মেইন-এর আকাশ; শেষ পর্যন্ত একটি অসমর্থিত সংবাদ অনুযায়ী তাকে বোস্টনের আকাশেও দেখা গেছে। বোস্টন থেকে নিউইয়র্ক তো আকাশপথে ছ'শ মাইলের কম।

নিউইয়র্ক শহরের সব মানুষ ছুটেছে এয়ারোড্রামের দিকে। শহরতলির মানুষজনও গাড়ি নিয়ে ছুটে আসছে। শতাব্দীর একটি চিহ্নিত মুহূর্ত! সবাই স্বচক্ষে দেখতে চায়, ক্যামেরায় ধরে রাখতে চায়।

ডোনাল্ড হল বললে, কী স্থির করলে? নিউইয়র্ক কখন যাচ্ছ?

লিণ্ডি গম্ভীর হয়ে বলে, নিউইয়র্ক আদৌ যাব কিনা কে জানে? ট্রান্স-প্যাসেফিক ফ্লাইটে তো সানফ্রান্সিস্কো থেকেই উড়তে হবে।

হুল ধমকে ওঠে, কী বকছ পাগলের মত্তো। ট্রান্স-প্যাসেফিক নন-স্টপ ফ্লাই করতে এখনও মানুষের দশ বছর।

তা কি লিণ্ডিই জানে না? মায়ের কাছে মাসীর গপ্পো!

কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এর পর 'শুভ্র বিহঙ্গ' বেমালুম না-পাত্তা। বারো ঘণ্টা কেটে গেল। লিণ্ডি হিসেব কষে বললে, ওদের প্লেনে পেট্রোল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। বেচারীরা! অর্টেগ প্রাইজ তো পরের কথা, এখন তাদের জীবিত পাওয়া গেলে হয়।

বস্তুত ততক্ষণে সার্চ-পার্টি রওনা হয়ে গেছে।

লিণ্ডি অতঃপর গুটিয়ে রাখল প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপটা। ১০ই মে রওনা দিল সান ডিয়াগো থেকে। স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হল খবরটা। নিউইয়র্কে যখন ল্যাণ্ড করল "স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই" তখন মালুম হল লিণ্ডির—সে আর কোনও অখ্যাত বৈমানিক নয়। খবরটা এ-পাড়াতেও রটে গেছে। দলে দলে সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে ছুটে আসছে। ওর শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই এসেছেন ওকে রিসিভ করতে—হ্যারী নাইট, হ্যারল্ড বিক্সবি, টমসন প্রভৃতিরা। কিন্তু তাঁদের কাছে বেচারী যেতেই পারছে না। সাংবাদিকদের নীরন্ধ্র পাঁচিলে সে বন্দী হয়ে পড়েছে!

: আপনার ঠিকুজি-কুষ্ঠি আছে স্যার?

: কোন রঙ আপনার সবচেয়ে পছন্দ?

: তোমার প্রেমিকা কি এক জন? কতদিনের আলাপ? ব্লণ্ড না ব্রুনেট?

সে-রাত্রে ডাইরীতে বেচারী লিখেছিল, আমার কান লাল হয়ে উঠ্ছিল ক্রমশ।

বেচারী লিণ্ডি। সে খেয়াল করে দেখেনি—যে ছবিটা না দেখেই সে সিনেমা-হল থেকে উঠে এসেছিল তার নাম "হোয়াট প্রাইস্ গ্লোরি"—বিখ্যাত হওয়ার কী মূল্য? 'গৌরব'-এর সঙ্গে শুধু 'সৌরভ' নয়, 'রৌরব'ও ভাল মিল!

॥ সাত ॥

১৩ই ভোরবেলা ডিক্ ব্লাইথ এসে হাজির।

লিণ্ডি ডেরাডাণ্ডা গেড়েছিল গার্ডেন সিটি হোটেলে। ডিক্ ব্লাইথ হচ্ছে রাইট এয়ারোনটিক্যাল কর্পোরেশন-নিযুক্ত চার্লস লিণ্ডবার্গের প্রেস এজেন্ট। লিণ্ডি প্রথমটায় রাজী হয়নি।—'প্রেস এজেন্ট! মাই কুট!' ধমকে উঠেছিল সে। তাকে থামিয়ে দিয়ে রাইট কর্পোরেশনেব বড় সাহেব বলেছিলেন, লুক হিয়ার মিস্টার লিণ্ডব,ার্গ: আপনাব 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুই'-তে যে এঞ্জিন লাগানো হয়েছে তা আমাদের। আপনি সাফল্যমণ্ডিত হলে আমাদেব বিজনেস্ প্রচণ্ড-ভাবে বেড়ে যাবে। তখন আপনার প্রতিটি কথার হবে অমূল্য দাম। ফলে আপনি যাতে কোন অবস্থার্তেই বেফাঁস কিছু না বলেন সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে। ডিক্ ব্লাইথ আপনার প্রেসের দিকটা সামলাবে। খরচ-খরচা সব আমাদের কোম্পানির।

অগত্যা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল স্লিম।

লিণ্ডির নাকের সামনে একখণ্ড নিউইয়র্ক 'টাইমস্' মেলে ধরে ব্লাইথ বললে, দেখ হে, একবার চোখ চেয়ে। যে-সে কাগজ নয়, খোদ 'টাইমস্'-এর পয়লা নম্বরের পাতায় নাম উঠেছে তোমার!

লিণ্ডি ঝুঁকে পড়ে কাগজটার উপর। ১৩ মে ১৯২৭ নিউইয়র্ক 'টাইমস্' এর হেড-লাইন নিউজ্ বলছে:

> "মানবেতিহাসের বোধকরি সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্র আজ নিউইয়র্কে প্রস্তুত—৩৬০০ মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কে আগে প্যারীতে পৌঁছাবে? কাল সকালে, অনুমান হয় প্রায় একসঙ্গে তিনজন অভিযাত্রী রওনা হবেন। সংখ্যায় তাঁরা তিনজন। এক নম্বর···এবং তিন

নম্বর প্রতিযোগী হচ্ছেন চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ। বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি হচ্ছেন 'কালো-ঘোড়া'! গতকাল সন্ধ্যায় তিনি সওয়া সাত ঘণ্টা একটানা বিমান চালিয়ে 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।' রূপালী রঙে মোড়া তাঁর প্লেনটি নিঃসন্দেহে রূপালী, রূপসী তন্বী।"

টাইমস্-এর স্টাফ রিপোর্টার খুব চোস্ত ভাষায় 'ব্যাজখিস্তি' করেছেন। প্রথমত 'কালো-ঘোড়া'। রেসের মাঠে যে ঘোড়াটার ঠিকুজি-কুষ্ঠির পাত্তা পাওয়া যায় না তাকেই রেসুড়েরা বলে dark horse বা 'কালো ঘোড়া'। অর্থাৎ অচেনা ঘোড়া—বেমক্কা জিতেও, যেতে পারে! কিন্তু নিঃসন্দেহে সে কুলীন জাতের অশ্ব নয়। দ্বিতীয়ত 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' কথাটা কি শুধু আক্ষরিক অর্থেই নিতে হবে? তৃতীয়ত, তার আকাশযানকে বলা হয়েছে রূপালী, রূপসী, তন্বী! ভাবখানা—তুলে ধরলে গলে পড়েন!

কাগজ থেকে মুখ তুলে লিণ্ডি বলে, দেখলাম! দেখা যাক!

: না বন্ধু! এখনও দেখার বাকি আছে। এবার 'ডেইলী মিরার'খানা দেখ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ব্যঙ্গ করেছে মার্জিত ভাষায়, 'ব্যাজস্তুতি'র বিপরীতার্থক 'ব্যাজখিস্তি' দিয়ে—'ডেইলী মিরার' রেখে ঢেকে খিস্তি করেনি। তার হেড লাইন নিউজ্ হচ্ছে: FLYING FOOL HOPS TODAY [উড়ন্ত গবেট আজ লাফাবে।]

প্রাতরাশ সেরেই লিণ্ডি চলে এল এয়ারোড্রামে। সেখানে আবার সেই ক্যামেরাধারী আর সাংবাদিকের মিছিল। লিণ্ডি ইতিমধ্যেই মনে মনে চটেছে। তাদের সঙ্গে কোনও কথা বলছে না। ওর অপর প্রতিযোগী—কমাণ্ডার বায়াড নিজে থেকেই এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে করমর্দন করলেন। শুভেচ্ছা জানালেন। পাশাপাশি তিনখানি প্লেন সাজানো রয়েছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট খুব খারাপ। অতলান্তিকে

নাকি খুব কুয়াশা ও ঝড়। তাই কেউই রওনা হচ্ছেন না। তিনজন প্রতিযোগীই কাছাকাছি অপেক্ষা করছেন। আবহাওয়ার রিপোর্ট আশাপ্রদ হলেই যাতে যাত্রা করতে পারেন। সমস্ত দিন এয়ারোড্রামের কাছেপিঠে ঘুরে বেড়ায় লিণ্ডি। একটা কান রেডিওর আবহাওয়া-সংবাদের দিকে সজাগ রেখে। দিনটা একেবারে ব্যর্থ গেল না। সন্ধ্যায় টেলিগ্রাফ পিয়ন ওর হাতে ধরিয়ে দিল ডেট্রয়েট-থেকে-আসা একটি তারবার্তা: "আগামীকাল সকালে নিউ ইয়র্কে পৌঁছাব—মা।"

মা! মা কোথা থেকে খবর পেল? মাকে তো লিণ্ডি কোনও খবর দেয়নি। কোন সাংবাদিককে মায়ের নাম ঠিকানা জানায়নি। নিশ্চয়ই সংবাদপত্র পড়ে ওর মা জানতে পেরেছে। লিণ্ডির ইচ্ছা ছিল না মাকে কিছু জানায়। হয়তো মা বারণ করবে না; কিন্তু যদি করে? বিধবার একমাত্র সন্তান! মনটা ভারী হয়ে গেল বেচারীর।

চার্লস লিণ্ডবার্গ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, গত চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের কীভাবে কেটেছে। মার্কিন সাংবাদিকদের তখনও চিনতে বাকি ছিল ওর। পূর্বদিন সন্ধ্যায় 'ওর বান্ধবী সাদা না কালো', এ প্রশ্ন শুনেই ওর কান লাল হয়ে উঠেছিল। ওর মাকে তার চেয়ে শত গুণ তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেছে সাংবাদিকেরা:

: আপনার একমাত্র সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে আপনার দ্বিধা হচ্ছে না?

: আপনি ওকে বারণ করবেন না?

: অন্তত একবার 'শেষ দেখা' দেখতেও যাবেন না?

যেন লিণ্ডি ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসতে যাচ্ছে! ওদের হাত থেকে রেহাই পেতেই কিনা কে জানে বৃদ্ধা মরিয়া হয়ে ছুটে আসছেন!

সমস্ত দিন ছটফট্ করল লিণ্ডি। তারপর মনস্থির করল। না! মা যদি আপত্তি করে, নিষেধ করে, তবু সে অটল থাকবে। মা তাকে জন্ম দিয়েছে, মানুষ করেছে,—এই দুনিয়ায় ঐ একটি মাত্র মহিলাকেই

সে আজও নিবিড়ভাবে ভালবাসে—তবু এ-ক্ষেত্রে সে মায়ের অবাধ্য হতে বাধ্য! হ্যারী নাইট, হ্যারল্ড বিক্সবি, আর্ল টমসন, ডোনাল্ড ব্লাইথই শুধু নয়—তাহলে আয়নার সামনে নিজ প্রতিবিম্বের দিকেও সে সারা জীবন চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

গার্ডেন সিটি স্টেশনে মায়ে-ছেলেয় সাক্ষাৎ হল। ঠিক খবর পেয়েছে রিপোর্টারের দল। যথারীতি ছেঁকাবান করে ধরেছে ওদের। মায়ের সঙ্গে কোন কথা বলা হল না ওদের জ্বালায়। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে তুলল গাড়িতে। সোজা চলে এল এয়ারোড্রামে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখে—যথারীতি উদ্যত ক্যামেরার অরণ্য।

: কী চান আপনারা? কী হলে মুক্তি দেবেন আমাদের?—গর্জে উঠল লিণ্ডি।

: আপনারা দুজনে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে চুম্বন করুন! ব্যাস্ আর কিছু নয়!

লিণ্ডি রাজী হল না। ওর মাও নয়। তারা শুধু হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে স্বীকৃত হল। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই মেনে নিল সাংবাদিকেরা।*

লিণ্ডি তারপর মাকে নিয়ে মাঠে নামলো। পাশাপাশি তিনখানি প্লেন তাঁকে দেখালো। জেনারেল বায়াড-এর প্রকাণ্ড তিন-এঞ্জিনের আকাশযান, তার নাম "আমেরিকা"। দ্বিতীয় প্লেনটি রাইট-বেলাঙ্কা কোম্পানির "কলোম্বিয়া"—তার বৈমানিক মি. চেম্বারলেন। আর তিন-নম্বর সেই 'কালো ঘোড়া': স্পিরিট অব্ সেণ্ট্ লুই।

প্রতি মুহূর্তেই লিণ্ডি আশঙ্কা করছে—এইবারে মা ভেঙে পড়বে। ওর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে বসবে: আমার একটা কথা রাখবি?

---

* এইখানে বলে রাখি, পরদিন সকালে সংবাদপত্রে মস্ত ফটো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল লিণ্ডি। ফটোতে দেখা যাচ্ছে লিণ্ডবার্গ ও তার জননী আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় পরস্পরকে চুম্বন করছেন—ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটি ট্রেন। ডোনাল্ড ব্লাইথ ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, একে বলে ট্রিক ফটোগ্রাফি। দুটি চুম্বনরত নরনারীর মুণ্ড দুটি পাল্টে দেওয়া হয়েছে!!

এ প্রসঙ্গটা একবার উঠবেই। তবে মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—হয়তো সর্বসমক্ষে প্রসঙ্গটা তুলবে না—কিন্তু হোটেলে ফিরে গিয়ে জনান্তিক অবকাশে মায়ে-ছেলেকে একবার মুখোমুখি বসতে হবেই। এই জন্যেই মাকে সে এতদিন কিছু জানায়নি। ওর যুক্তিটা সহজ, সরল। মাকে না জানিয়েই রওনা দেবে—তারপর জয়ী হয়ে যদি ফিরে আসে তবে ওর মা-ই হবে এ দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মহিলা, আর যদি ফিরে না আসে, তবু মায়ের একটা সান্ত্বনা থাকবে—লিণ্ডি তাঁর কথার অবাধ্য হয়নি কোনদিন।

মধ্যাহ্ন আহারে যোগ দিতে এলেন হ্যারী নাইট এবং হ্যারল্ড বিক্সবি। ওর দুই বৃদ্ধ শুভানুধ্যায়ী। লিণ্ডি তাঁদের সঙ্গে মায়ের আলাপ করিয়ে দিল। তাঁরা দুজনেই বললেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস চার্লি নিরাপদে প্যারীতে উপনীত হবে—আপনি হবেন এবছরের "মাদার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড", বিশ্বের সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী জননী।

মিসেস্ ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড লজ লিণ্ডবার্গ মৃদু হাসলেন শুধু—হাঁ-না কিছুই বললেন না।

কথাপ্রসঙ্গে হ্যারল্ড বিক্সবি বললেন, তুমি ঐ সব সস্তা দামের 'আউটফিট' কিনেছ কেন?

মাথা চুলকে লিণ্ডি বললে, সস্তা হলেও জিনিস খারাপ নয়, অহেতুক অর্থব্যয়।

ধমকে ওঠেন বিক্সবি, Look here young man, you just leave the finances to us, and we leave the flying to you [একটা কথা শুনে রাখ ছোকরা—টাকা-পয়সার ভাবনাটা আমরাই ভাবব, তুমি মাথা গলিও না—যেমন তোমার ওড়ার ব্যাপারে আমরা মাথা গলাতে যাচ্ছি না]।

লিণ্ডি আড়চোখে মাকে একবার দেখে নিল। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন।

প্রসঙ্গ বদলে নিল লিণ্ডি। বললে, একটা কথা। আকাশ একটু

পরিষ্কার দেখলেই আমি রওনা হতে চাই। না হলে ওরা তার আগে উড়বে ; কিন্তু একটা বাধার কথা আমরা ভেবে দেখিনি—

: কী বাধা ?

: অর্টেগ প্রাইজ-এর শর্ত হচ্ছে—আবেদন করার পর কর্তৃপক্ষকে তিনমাস সময় দিতে হবে। আমার তিন মাস সময় এখনও পূর্ণ হয়নি। আমি যদি এখন সাফল্যমণ্ডিত হই, তবে আইনত আমাকে প্রাইজ দেওয়া নাও হতে পারে—

হ্যারী নাইট এবার ধমকে ওঠেন : To hell with the prize money ! When you are ready to take off, go ahead." [চুলোয় যাক প্রাইজের টাকা ! তুমি নিজে প্রস্তুত মনে করলেই রওনা হবে।]

ওর মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ওঁরা দুজন চলে গেলেন। লিণ্ডি ইতস্তত করে মাকে বললে, চল, এবার হোটেলে ফেরা যাক। আমার হোটেলেই পাশাপাশি দুখানা ঘর নিয়েছি।

হাসলেন এতক্ষণে ঈভাঞ্জেলিন। বললেন, তোর খুব ভয় ছিল আমাকে নিয়ে, না রে ?

ভয় ! চার্লস লিণ্ডির ভয় ? কী জবাব দেবে সে ভেবে পেল না।

মা বললেন, হোটেলে আমি যাব না রে। তোর এখন অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। আমি থাকলেই কাজে ক্ষতি হবে। আমি শুধু তোকে একবার দেখতে এসেছিলাম, আশীর্বাদ করতে এসেছিলাম, পরের ট্রেনেই আমি ফিরে যাব।

পরের মুহূর্তেই লিণ্ডি যে কাণ্ডটা করে বসল তা কোন ক্যামেরা-ধারীর সামনে করলে পরদিন কাগজে ট্রিক্ ফটোগ্রাফীর আর কোনও প্রয়োজন থাকত না !

রাত দুটো বেজে পনের। কে যেন আস্তে আস্তে ঠেলছে লিণ্ডিকে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ও : কী ?

: এই মাত্র আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঘোষিত হয়েছে, মেঘ কেটে যাচ্ছে। কী করবে ?

উৎসাহে উঠে বসল বিছানায়। আলোটা জ্বালল। বুলেটিনটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে! এখনই রওনা দেব!

দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিল। সব কিছু অবশ্য গোছানোই ছিল। হোটেলের লাউঞ্জ দিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো—এরা কারা ?

হৈহৈ করে উঠল সবাই। রাত জেগে তাস খেল্‌ছিল। সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যান। ওদের তো আর অতলান্তিক পাড়ি দিতে হবে না—তাই রাত জাগায় আপত্তি নেই। কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে ওরা জানত, লিণ্ডি রাতারাতি পাড়ি জমাতে পারে। তাই এই নৈশ জুয়ার বৈঠক। ওকে দেখেই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল সবাই। পিছু নিল যে যার গাড়িতে।

রাত তিনটার মধ্যেই দলটা এসে পৌছলো এয়ারোড্রামে। ইতিমধ্যে টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে প্লেনটা হ্যাঙার থেকে বার করা হয়েছে। পেট্রোল ভরা হয়েছে। শেষবারেব মত সব কিছু চেক আপ করে নিল লিণ্ডি। বায়াড সাহেবের "আমেরিকা" এবং চেম্বারলেনের "কলোম্বিয়া" অঘোরে ঘুমাচ্ছে। লিণ্ডি উঠে বসল কক্‌পিটে। সীটের বেণ্টটা মাজায় বাঁধল, গ্লাভস-জোড়া পবল হাতে, গগল্‌সটা টেনে দিল চোখের উপর। মুখ বাড়িয়ে দেখল একবার—অন্ধকারে কত মানুষ অপেক্ষা করছে বোঝা যায় না—তবে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। 'স্পিরিট অব্‌ সেণ্ট লুই'-এর আকণ্ঠ বোঝাই পেট্রোল—ওর ওজন এখন ৫২৫০ পাউণ্ড। এত ওজন নিয়ে মাত্র পনের দিনের শিশু সেণ্ট লুই কখনও ওড়েনি আকাশে। কাপিতান ফংক-এর কথা মনে পড়ল লিণ্ডির। কিন্তু না, সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না অমন দুর্ঘটনা। হাত নেড়ে সে ইঙ্গিত জানালো ভূতলবাসী সহকারীদের। ওরা

ঠেলতে শুরু করল। কিছুটা গতি লাভ করেই সে স্টার্ট দিল এঞ্জিনে।

গতি—আরও—গতি, আরও দ্রুত। রানওয়ের অর্ধপথের দাঁগটা অতিক্রান্ত। ফেরার পথ রুদ্ধ। হঠাৎ টের পেল পিছনের ল্যাজটা ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উঠেছে—পরমুহূর্তেই সে উঠে পড়ল আকাশে। প্রথম ধাপ—যে ধাপ রেনি ফংক উত্তীর্ণ হতে পারেনি, কমাণ্ডার বায়াড পারেননি, সেটা অতিক্রান্ত। আকণ্ঠ বোঝাই পেট্রোল নিয়ে ও উঠে গেছে আকাশে।

সামনে সাড়ে ত্রিশ হাজার মাইল সমুদ্রপথ—তার ওপারে ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর মত ধ্যানস্তিমিত ঈফেল টাওয়ার আছে তার প্রতীক্ষায়।

পারবে তো পৌছাতে?

আমেরিকার সময় ইস্টার্ন ডে-টাইম অনুসারে তখন সকাল ৭টা ৫৪।

২০শে মে, ১৯২৭।

॥ আট ॥

২০শে মে, ১৯৭৭

অর্থাৎ আজ যে-তারিখে এ-গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদটি লিখতে বসেছি। লিণ্ডবার্গের সেই যুগান্তকারী অতলান্তিক উত্তরণের আজ সুবর্ণজয়ন্তী। পশ্চিমখণ্ডের কথা জানি না। কলকাতায় বসে মনে হচ্ছে শুধু 'সাণ্ডে' সাপ্তাহিক ছাড়া আমরা সবাই বোধহয় সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছি ঘটনাটা। আমার কিন্তু মনে হয়েছে, বর্তমান শতাব্দীতে এই ঘটনাটি একটি বিশেষ উত্তরণ—এক হিসাবে অ্যাডমিরাল পিয়ারীর ১৯০৬ সালে উত্তরমেরুতে উপনীতি, এডমণ্ড হিলারীর ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয়, এমনকি নীল আর্মস্ট্রং-এর ১৯৬৯-এ চন্দ্রে পদার্পণের চেয়েও ২০.৫.১৭ তারিখের ঐ ঘটনাটি কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জানি, আপনারা বলবেন—আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি, লিণ্ডবার্গের জীবনী নিয়ে পড়াশুনা করতে করতে চিন্তাশক্তির ভারসাম্য হারিয়ে একদেশদর্শী হয়ে পড়েছি, অর্থাৎ উত্তরমেরু, এভারেস্ট কিংবা চন্দ্র-বিজয় মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনেক বড় জাতের উত্তরণ। সেদিক থেকে বলছি না।

একথাও বলতে চাইছি না যে, পিয়ারী, হিলারী অথবা আর্মস্ট্রং একটি যৌথ প্রচেষ্টার অংশীদার মাত্র, অথচ চার্লস্ লিণ্ডির সমস্ত সাফল্য তাঁর একার। সেটাও কারণ, তবে একমাত্র কারণ নয়। মৌল হেতুটা হচ্ছে এই যে, ওঁরা কেউই পারেননি সেই জিনিসটা করতে—প্রয়োজনও হয়নি তাঁদের—যা করেছিল স্লিম লিণ্ডি: সে গোটা পৃথিবীর গালে কষে একটা থাপ্পড় লাগিয়েছিল। বুড়ো পৃথিবী, স্থবির পৃথিবী, ভোগৈশ্বর্যে বেসামাল, অন্তঃসারশূন্য, অবক্ষয়ী, মত্তপ

পৃথিবীর সংবিৎ ফিরে এসেছিল সেই একটি চড়ে। পৃথিবী নতজানু হয়ে করজোড়ে ঐ একক বিদ্রোহীকে বলেছিল : সরি! আর ভুল হবে না।

লিণ্ডির সাফল্যের পরিমাপ তো অতলান্তিক অতিক্রমণে নয়! অ্যালকক্ এবং ব্রাউন বছর আষ্টেক আগেই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে ইউরোপে উড়ে গেছিলেন—সেটাও এক হিসাবে অতলান্তিক উত্তরণ—যদিও দূরত্বটা অনেক কম। তাছাড়া চার্লস লিণ্ডবার্গ যদি সেদিন না উড়তেন, তাহলে হয়তো পরদিনই বায়াড তাঁর 'আমেরিকা' প্লেনে অথবা চেম্বারলেন তাঁর 'কলোম্বিয়া'-য় একই সাফল্যলাভ করতেন। বস্তুত দুজনেই তা করেছিলেন—লিণ্ডবার্গের একক সাফল্যের অনতি-কাল পরেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি লিণ্ডির বদলে ওঁদের কেউ অর্টেগ-পুরস্কারে সম্মানিত হতেন তাহলে সেটা এমন যুগান্তকারী ঘটনা বলে চিহ্নিত হত না!

ব্যাপারটা বুঝতে হলে সেই উনিশ শ' সাতাশের দুনিয়াটাকে চিনে নিতে হবে।

বিশ্বযুদ্ধ অনেকদিন শেষ হয়েছে। ক্ষতচিহ্নগুলি মিলিয়ে গেছে। তিরিশের দশকের স্লাম বা মন্দার বাজার তখনও আসেনি। সারা সভ্য দুনিয়াতেই সেদিন প্রাচুর্য। বড়লোকের সংসারে যা হয়—মদ, মেয়েমানুষ, রেস আর জুয়া। 'জ্যাজ' তখন নতুন জন্ম নিচ্ছে, 'বিকিনি প্যাণ্ট' বাজারে উঁকি দিতে চাইছে। সভ্য পৃথিবী সারাদিন হাই তোলে, অপরাহ্ণে প্রসাধন করে, সন্ধ্যায় নাচে, রাত্রিতে 'সিডিউস্' করে এবং সকালবেলায় 'হ্যাং-ওভারে' ধরাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে। খবরের কাগজে রোজই নতুন নতুন বিশ্বরেকর্ড : কোন প্রেমিকযুগল দীর্ঘতম সময়কাল চুম্বন করেছে, কোন তরুণ স্কাই-স্ক্র্যাপারের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক চুমুকে ভড্কার ম্যাগনাম বোতল নিঃশেষ করেছে, কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী শিল্পীর স্টুডিওতে নিউড মডেল হতে স্বীকৃত হয়েছে।

সেই রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ আবির্ভূত হল একজন নতুন মানুষ। লিণ্ডির জীবনীকার মসলের ভাষায়:

> "And now suddenly they were confronted by the real thing, a genuine hero, who looked, sounded, behaved like one, young, clean, handsome, untainted by the freneticism of the time. He had arrived out of nowhere without fanfare and he had taken off without fuss. He had stayed aloof and been unaffected by the shoddy carnival swirling around him during his stay in New York, and had simply ignored the skeptics and scoffers who called him a Flying Fool and said he would never make it. Maybe he wouldn't. But there was something so confidently godlike in his demeanor that to some religiously minded Americans it was almost as if he were a Messenger for them, carrying the Word. To others he was a rebel against the shabbiness, cynicism, cheapness, and injustice of their flashy world, challenging the system by which they lived. The more the experts swore he would kill himself, the more their dreams rode with him. And from the moment the 'Spirit of St. Louis' took off from the mud of a Long Island airfield into the misted sea, he became a symbol of their own hopes and

ambitions, a bright light in a murky world. To millions of simple people, he was no longer flying for himself but for humanity; he was not simply flying to Paris but blazing the trail to a better life.

If he failed, they would sigh sadly and realize that their hopes for him had been too good to be true. But if he made it, a halo would not be too much for him."

"এবং এখন হঠাৎ তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো একজন সত্যিকারের নায়ক : চেহারায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে এ মানুষ তরুণ, অমলিন, সুদর্শন, যুগের হুজুগে যে মানুষ কালিমালিপ্ত নয়। বিনা প্রচারে সে যেন অন্তরীক্ষ্য থেকে আবির্ভূত হল আর নিশ্চুপ ছিনিয়ে নিয়ে গেল জয়ের মুকুট! নিউ ইয়র্কে যারা তার চতুর্দিকে হৈ-হুল্লোড়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তাদের ভ্রূক্ষেপও করল না—যারা বলেছিল 'উড়ন্ত গবেটটা আজ লাফাবে অতলান্তিকে ডুবে মরতে' তাদের কথা ওর কানেই যায়নি। হয়তো সত্যই ডুবে মরবে। তাতে কী? তবু ওর দৃঢ়-প্রত্যয়ের দার্ঢ্যে এমন একটি ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা ছিল যে, কোন কোন ধর্মভাবাপন্ন মার্কিন নাগরিকের কাছে মনে হয়েছিল—সে স্বয়ং ঈশ্বরের দূত, তাঁর বাণী বহন করে এসেছে। অন্যান্য সকলের চোখে সে বিদ্রোহী—তার বিদ্রোহ এই দুনিয়ার ঘুণে ধরা খেলো অবক্ষয়ী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, যে তত্ত্বের মূলকথা মানুষ মাত্রেই শয়তান। পণ্ডিতের দল যতই হিসাব কষে বলতে থাকেন লোকটার মৃত্যু অনিবার্য, ততই ঐ মানুষগুলো তাদের স্বপ্নে ওর সহযাত্রী হতে চায়। যে মুহূর্তে লং

আইল্যাণ্ডের কর্দমাক্ত বিমান-পোতাশ্রয় থেকে 'স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই' কুয়াশা-ঢাকা মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করল, সেই মুহূর্তটি থেকেই লিণ্ডি হয়ে পড়ল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক—নিরাশার ঘনান্ধকারে একমাত্র দীপবর্তিকা।

অতি সাধারণ মানুষের ঢে সেদিন সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছিল না—সে সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যৎকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—ওর শেষ তীর্থ প্যারিস নগরী নয়, ও ছুটেছে উন্নততর জীবনের অন্বেষণে। ও যদি মারা যায়, তাহলে—হ্যাঁ, ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর মনে মনে বলবে, বড় বেশি আশা করেছিলাম, এমনটা সত্যি হয় না! কিন্তু ও যদি উপনীত হয় ওর শেষ তীর্থে, তাহলে? তাহলে ওর উপর দেবত্ব আরোপ করাটাও বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে না!"

নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিস। সময় লেগেছিল সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা। এই ঐতিহাসিক অভিযানের প্রতিটি দুঃসাহসিক মুহূর্তের বিস্তারিত বিবরণ আছে। আছে লিণ্ডির লেখা 'We' এবং 'The Spirit of St. Louis' গ্রন্থে। আজকের এই জেট-প্লেনের যুগে সেই 'ছেলেখেলা'-র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেব না। শুধু কয়েকটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হব। চাঁদে পৌঁছেও আর্মস্ট্রং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশ পেয়েছিলেন, লিণ্ডি ঐ সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা ছিলেন দুনিয়ার বার। সামনে সাইক্লোন বইছে কিনা কেউ তাঁকে বলে দেয়নি। নক্ষত্র ও কম্পাস দেখে পথ চলছিলেন তিনি,—তিনি নিজেই ন্যাভিগেটার, পাইলট, কো-পাইলট এবং কেবিন-বয়! ঐ সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টা ধরে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, চোখের পাতা বুজলেই নিশ্চিত মৃত্যু—প্লেন চালাতে চালাতেই অঙ্ক কষেছেন, আহার

করেছেন, প্লেনের ডানায় বরফ জমে গেলে সাফ করেছেন হাত বাড়িয়ে, নোট লিখেছেন ডায়রিতে !!

ঐ সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টায় লিণ্ডি কী কী করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও ঐ সময়কালে আর তিনটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না :

এক : মনে আছে নিশ্চয়, সেণ্ট লুই শহরের সবচেয়ে খানদানী কাগজ 'পোস্ট-ডেসপ্যাচে'র সম্পাদক কী-ভাবে লিণ্ডির প্রস্তাবে বরফ-গলা জল ঢেলে দিয়েছিলেন। সেই 'পোস্ট ডেসপ্যাচ' সংবাদপত্রের সেরা কার্টুনিস্ট ড্যানিয়েল ফিট্জ্‌প্যাট্রিক কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। সারা রাত জেগে সে একটা কার্টুন আঁকল। লম্বায় সেটা আট-কলামব্যাপী ! কাগজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। অথচ খাড়াইয়ে মাত্র দেড় ইঞ্চি। চিত্রের মাঝামাঝি একটা সমান্তরাল ঢেউ-খেলানো রেখা—সমুদ্র ও আকাশের সীমারেখা। নিচে আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, উপরে এক-আকাশ তারা। সমস্ত ছবিটাই কালো রঙে। তার মাঝামাঝি আকাশের মাঝখানে বিন্দুবৎ একটি মনোপ্লেন—'স্পিরিট অফ্‌ সেণ্ট লুই' ! সকালবেলা সংবাদপত্র খুলেই সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল—তাদের হাতের পেয়ালায় ছল্‌কে উঠ্‌ল চা। লক্ষ মানুষ খণ্ড-মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস রুদ্ধ করল—মনে পড়ে গেল, এখন, এই মুহূর্তে ঐ 'একলা-পাগল' মহাশূন্যের নিঃসীমতায় যুঝ্‌ছে ! কার্টুনিস্ট ড্যানিয়ালই এই পৃথিবীর তরফে প্রথম শিল্পী যিনি লিণ্ডির উদ্দেশে মাথার টুপি খুললেন, তাঁর ঐ রাতজাগা ১৬″ × ১½ কার্টুনে !

লিণ্ডবার্গ সাফল্য লাভ করার পূর্বেই দু-নম্বর যে মানুষটি তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল বলে ইতিহাসে খুঁজে পাচ্ছি সে একটি ছোট্ট মার্কিন মেয়ে : অ্যালিস।

২০শে মে ১৯২৭ ছিল শুক্রবার। পূর্বরাত্রে লিণ্ডির মা ঈভাঞ্জেলিন সারারাত ঘুমতে পারেননি। চোখ দুটি যতবার বুজেছেন, দেখতে

পেয়েছেন—তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অতলান্তিকের উপর প্রাণপণে সংগ্রাম করে উড়ে চলেছে এক ক্লান্ত বিহঙ্গ—অ্যালবাট্রস! রাত ভোর হল। আজ স্কুল আছে। অদ্ভুত ওঁর মনোবল। তৈরী হয়ে নিলেন—স্কুলে যেতে হবে, ছুটি নেবেন কেন? কী করবেন বাড়িতে বসে থেকে? ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠ্‌ল টেলিফোন। দৌড়ে ছুটে এলেন। হাতটা কাঁপছিল, তবু রিসিভারটা কানে লাগিয়ে বললেন, মিসেস্‌ লিণ্ডবার্গ!

: সুপ্রভাত ম্যাডাম। ফ্রি-প্রেস থেকে বলছি। আপনার বাড়িতে রেডিও আছে?

: না। কিন্তু একথা কেন?

: মার্কিন-সরকার স্থির করেছেন, প্রতি ঘণ্টায় একটি করে নিউজ্‌ বুলেটিন প্রচার করা হবে। মিস্টার লিণ্ডবার্গের বিষয়ে। কোন খবর থাক বা না থাক। সকাল আটটার বুলেটিনে বলা হয়েছে—"তাঁর কোন খবর নেই, কোন জাহাজ বা দ্বীপবাসী তাঁকে এ পর্যন্ত দেখেনি।"

: ও! ধন্যবাদ। প্রতি ঘণ্টায় আমাকে টেলিফোন করার প্রয়োজন নেই। তবে কোনও খবর পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আমাকে দয়া করে জানাবেন।

: নিশ্চয় জানাব ম্যাডাম।

: আর একটা কথা। মানে···খবর যদি···অর্থাৎ যে কোন রকম সংবাদই আমাকে জানাতে কুণ্ঠিত হবেন না! আশা করি আমি কী বলতে চাই, অর্থাৎ···

: ইয়েস মাদার! আমি বুঝেছি। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন! তাঁর সাফল্যলাভের খবরই জানাব আমি।

এবার আর 'ম্যাডাম' বলেনি ছোকরা। মাতৃ সম্বোধন করেছে। লিণ্ডি সাফল্যলাভ করুক আর না করুক, ম্যাডাম ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড-লজ লিণ্ডবার্গ ইতিমধ্যেই হয়েছেন: মাদার।

তৈরী হয়ে স্কুলে রওনা দেবেন, তখনই এল কয়েকজন সাংবাদিক।

ঐ ত্রি প্রেস থেকেই। লিণ্ডির মা ওদের বসালেন বৈঠকখানায়। ওরা নাছোড়বান্দা। এই মুহূর্তে যা হোক কিছু বলতেই হবে মাদারকে। ঈভাঞ্জেলিন অতি সংক্ষেপে শুধু বললেন "Tomorrow, Saturday, a holiday for me, will either be the happiest day of my life, or the saddest. Saturday afternoon at three o'clock I shall begin looking for word from Paris—not before that. Perhaps I shall not worry, however, if the hours of Saturday afternoon drag along until evening. But I know I shall receive word that my boy successfully covered the long journey···It will be a happy message. [আগামীকাল শনিবার আমার ছুটি। হয় সেই ছুটির দিনটি হবে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের, অথবা বেদনার। শনিবার বিকাল তিনটা নাগাদ প্যারিসের কোন খবর আশা করতে পারি—তার আগে নয়। খবর পেতে পেতে যদি শনিবার রাতও হয়ে যায় তাতেও বোধকরি চিন্তিত হবার কিছু নেই।···কিন্তু আমি জানি, শেষ পর্যন্ত এই খবরই পাব যে, আমার ছেলে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সফল হয়েছে।···খবরটা আনন্দেরই হবে।]

স্কুলে পৌঁছে টীচার্স রুমে আর ঢুকলেন না। মানুষজনকে যেন এড়িয়ে চলছেন। সোজা ক্লাসে চলে গেলেন। দশবারো বছরের বাচ্চাদের ক্লাস। বোর্ডে একটি অঙ্ক দিয়ে চুপটি করে এসে বসলেন চেয়ারে। ছেলেমেয়েরা নীরবে আঁক কষছে। হঠাৎ নজর হল মাঝের বেঞ্চিতে একটি মেয়ে—অ্যালিস, অঙ্ক কষছে না। মাথা নিচু করে সম্ভবত হাঁটুর ওপর রাখা কোন গল্পের বই পড়ছে। ঈভাঞ্জেলিন ধমকে ওঠেন : অ্যালিস! তুমি কী করছ? স্টেট আপ।

অ্যালিস উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু মুখ তুলল না। জবাব দিল না। চোখে চোখে তাকাতেও পারল না। ওকে হাতে-নাতে ধরতে এগিয়ে এলেন ঈভাঞ্জেলিন। বেঞ্চির নীচে কোনও গল্পের বই লুকানো নেই।

অ্যালিসের চিবুকটা ধরে তুলতেই দেখেন, তার টমেটোর মত গাল দুটিতে জলের ধারা।

: একি! কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

: প্লীস ডিস্‌ল্‌ভ দ্য ক্লাস ম্যা'ম। লেটস্‌ গো টু দ্য প্রেয়ার হল! লেট্‌স্‌ প্রে ফর হিম!

[আজ ছুটি দিয়ে দিন! চলুন সবাই প্রার্থনা সভায় যাই। আমরা বরং সবাই মিলে তাঁর জন্য প্রার্থনা করি।]

ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে অ্যালিসকে সমর্থন করল।

যৌথ ছুটির আবেদন এই প্রথম নয়—কিন্তু আজ ওরা খেলার মাঠে যেতে চায় না, বরং যেতে চায় প্রার্থনা সভায়। চার্চে।

চালস্‌ লিণ্ডবার্গ জাতীয় বীর হওয়াব আগে আরও একজন বিচিত্র পন্থায় তাঁর উদ্দেশে মাথার টুপি খুলেছিল : জো হাম্‌ফ্রিজ্‌!

জ্যাক লণ্ডনের অনবদ্য ছোটগল্প : 'এ পীস্‌ অব স্টেক্‌' যাঁদের পড়া আছে তাঁরা জো-কে চিনতে পারবেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, দৈত্যের মতো চেহারা, ভ্রূতে একটা বিশ্রী কাটা দাগ আর নাকটা মিকেলাঞ্জেলোর মতো তোবড়ানো, ভাঙা। জো হাম্‌ফ্রিজ্‌ প্রাক্তন হেভিওয়েট চাম্পিয়ান। নামকরা বক্সার। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যোদ্ধা। দর্শকদের আনন্দ দিতেই তার নাক ভাঙা, মুখে কাটা-ফুটির মত ক্ষতচিহ্ন। এখন সে অবসর নিয়েছে, তবু জীবিকার জন্য রিং-এর বাইরে যেতে পারেনি। এখন সে রেফারি। ২০শে মে শুক্রবার নিউইয়র্কের ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে ছিল হেভি ওয়েট বক্সিং চাম্পিয়ানশিপের ফাইনাল লড়াই। জ্যাক সার্লে বনাম টম ম্যালোনী। চল্লিশ হাজার দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ গম্‌গম্‌ করছে! ব্ল্যাকেও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। বহু দর্শক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। সংলগ্ন বার থেকে হুইস্কি আর বীয়ার সরবরাহ করতে করতে খিদমতগারের দল গলদঘর্ম। ঘণ্টা বাজল—দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে রিঙ-এর কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন দৈত্যাকৃতি জো হাম্‌ফ্রিজ্‌। সহস্র কণ্ঠের উন্মাদনায়

প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে। ত্ব'দলের সমর্থকদল চিৎকার করে ওঠে: কিল্ হিম্ জ্যাক। নক্ হিম্ আউক টম্!

দানবাকৃতি জো হাম্‌ফ্রিজ্ ত্ব-হাত তুলে জনতাকে শান্ত হতে বললেন। চীৎকার করে উঠলেন, Ladees and genteelmen!

শান্ত হল জনতা। প্রাক্তন চাম্পিয়ান কিছু বলতে চায়।

হ্যাঁ বলতে চায়। বলল সে: ভদ্দর মহিলা এবং ভদ্দর-মহোদয়গণ, আপনারা জ্যাক আর টমের রক্ত দেখতে চান! কেনই বা চাইবেন না? এ জন্য টাকা খরচ করেছেন যখন! তা দেখুন। কিন্তু তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? আপনারা একবার নীরবে উঠে দাঁড়ান। অন্তত আধমিনিট সেই ছোকরার কথা ভাবুন, তার সাফল্য কামনা করুন! Think about that boy up there tonight!—বুড়ো আঙুলটা হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বাতির মালায় শোভিত সিলিংটার দিকে তুলে দেখায়। বলে,—"সে ছোকরা এক হাতে জয়-স্টিক, আর এক মুঠোয় হৃৎপিণ্ডটা ধরে আজ রাতে মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে! তার কাছেই গচ্ছিত আছে আশাবাদী মার্কিন জাতির ভবিষ্যৎ! চার্লস লিণ্ডবার্গ নামের সেই নির্ভীক ছোকরার জন্যে ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করে দেখুন না কেন? আপনারাও তো মার্কিন!"

নামটা উল্লেখমাত্র চল্লিশ হাজার মানুষের মনে পড়ে গেল—সকালবেলার কাগজে দেখা সেই বিচিত্র কার্টুনটার কথা। ওরা মদের পাত্র নামিয়ে রাখল, সিগারেট ফেলে দিল। নীরবে নতনেত্রে প্রার্থনা করল এক মিনিট!

॥ নয় ॥

অতলান্তিক মহাসমুদ্রে কোন জাহাজ তাঁর নজরে পড়েনি। কিন্তু অপরাহ্ণের ম্লানায়মান আলোয় তিনি দিকে একটি দ্বীপ—দশ মিনিটের ভিতরেই স্পষ্ট হল সেই ভূখণ্ডটি—বস্তুত আয়ার্লাণ্ডের দক্ষিণ প্রান্ত। লিণ্ডবার্গ সে মুহূর্তে ডায়রিতে লিখেছিলেন: "Here are human beings···I have never seen such beauty before—fields so green, people so human, a village so attractive, mountains and rocks so mountainous and rock-like." [এখানে মানুষ আছে···এমন অপূর্ব দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি—মাঠগুলো কী সবুজ! লোকজন ঠিক মানুষের মত! একটি গ্রাম—মন ভরে যায়! পাহাড় আর পাথরগুলো হুবহু পর্বত আর প্রস্তরখণ্ডের মতো!]

আয়ার্লাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে কর্নওয়াল থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে টেলিগ্রাম ছুটতে শুরু করেছে: দেখা গেছে! দেখা গেছে! বেঁচে আছে! পেরেছে!

অবশেষে ফরাসী উপকূল। তখন রাত হয়ে গেছে। রাত ৯টা ৫২ মিনিটে ঈফেল টাওয়ার নজরে পড়ল। লিণ্ডি জানেন না, ইতিমধ্যে হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষ পড়ি-কি-মরি করে ছুটেছে লে ব্যোর্গে এয়ার ফিল্ডের দিকে।

প্রথম বার তিনি ঐ বিমান পোতাশ্রয়টি খুঁজে পাননি। শহরের উপর পাক খেতে থাকেন। তাতে উত্তেজনা চরমে উঠে যায়। বিমান পোতাশ্রয়ে জোরালো আলো জ্বেলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। অবশেষে লিণ্ডবার্গ নিরাপদে এসে নামলেন এয়ারোড্রামের জমিতে।

রাত তখন দশটা চব্বিশ। প্লেনটা থামতেই উনি কানের তুলো দুটো খুলে ফেললেন। শুনলেন লক্ষকণ্ঠের জয়ধ্বনি : লিণ্ডবার্গ! লিণ্ডবার্গ! লিণ্ডি!

দুর্বার জলস্রোতের মত মত্ত জনতা ছুটে আসছে পুলিশ কর্ডন ভেঙে ফেলে।

তারপর কী হল মনে পড়ে না। কারা যেন শূন্যে তুলে ফেলল তাঁকে। গাড়ি-টাড়ি নয়, স্রেফ মানুষের কাঁধে চলেছেন। এ সময় একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটায় আংশিকভাবে মুক্তি পান তিনি। একজন 'সুভেনির হাণ্টার' বা স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহকারী অতি উৎসাহী ওঁর মাথা থেকে হেলমেটটা ছিনিয়ে নেয়। তার 'ট্রফি'টা সে মাথার উপব তুলে সকলকে দেখায়। জনতা তাকেই লিণ্ডবার্গ বলে ভুল করে। বেচারীর কথা শোনা যাচ্ছে না। জনারণ্যের একটা বৃহৎ অংশ তাকেই কাঁধে নিয়ে চলল একদিকে। সবচেয়ে মজার কথা, প্যারিসে মার্কিন রাষ্ট্রদূতও ঐ ফাঁদে পা দেন। পুলিশের সাহায্যে সেই নকল লিণ্ডিকে উদ্ধার করে বুঝতে পারেন ভুলটা।

এদিকে আসল লিণ্ডিকে ছিন্তাই করে তিনজন ফরাসী বৈমানিক বিমানঘাঁটি থেকে রওনা দিয়েছেন শহরের দিকে। তিনজনের কেউই ইংরেজী জানেন না, লিণ্ডবার্গ জানেন না ফরাসী ভাষা। লিণ্ডি লিখেছেন : আমার অজ্ঞাত বন্ধুরা আমাকে নিয়ে এল একটা খানদানী এলাকায়। প্রকাণ্ড একটা তোরণের (আসলে, আর্ক দ্য ত্রাম্ফ) মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসে দাঁড় করালো এক জায়গায়। সেখানে দেখলাম মাটিতে আগুন জ্বলছে! কোথায় এসেছি, কী বৃত্তান্ত কিছুই বুঝছি না। তবে বন্ধুদের অনুকরণে আমি মাথার টুপি খুলে ঐ অনির্বাণ অগ্নিশিখার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম।"

ওদিকে শহরে ততক্ষণে রায়ট বেধে যাবার উপক্রম। লিণ্ডবার্গ ছিন্তাই হয়ে গেছে! রাত তিনটায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত অবশেষে লিণ্ডির হদিস পেলেন। নিয়ে এলেন সসম্মানে এম্ব্যাসীতে। সেখানে কয়েকশ'

প্রেসের লোক অপেক্ষা করছে। রাষ্ট্রদূত বললেন, জেন্টেলমেন! আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। ওঁকে কিছু খাইয়ে নিই।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং অবসাদে লিণ্ডি তখন প্রায় আধমরা।

তবু প্রেস কন্‌ফারেন্সে কিছু বলতে হল। ছুটি পেলেন রাত সাড়ে চারটেয়। এক ঘুমে পরদিন দুপুর। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে তার পাঠিয়েছেন: All France in deep joy at Charles Lindbergh's brave flight. If we had deliberately sought a type to represent the youth, the intrepid adventure of America···we could not have fared as well as in this boy of divine genius and simple courage. [চার্লস লিণ্ডবার্গের দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যে সারা ফ্রান্স আনন্দে আত্মহারা। আমেরিকার তারুণ্য এবং নির্ভীক অভিযানস্পৃহার প্রতীক হিসাবে আমরা যদি কাউকে বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য প্রেরণ করতে চাইতাম তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কাউকে পাওয়া যেত না—নিছক সাহস এবং স্বর্গীয় প্রতিভায় ছেলেটি সকলের মন জয় করেছে।"

পরের দু-তিনটি দিন যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল। রাষ্ট্রদূত হ্যারিস তাঁর সব কাজকর্ম ছেড়ে শুধু লিণ্ডবার্গকে নিয়ে ঘুরছেন। কোথায় নয়? ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এক জনাকীর্ণ জনসভায় লিণ্ডির গলায় পরিয়ে দিলেন 'Cross of the Legion d'Honneur' মেডেল। ওকে নিয়ে যাওয়া হল নেপোলিয়ানের সমাধিক্ষেত্রে, ভার্সাই প্রাসাদে, লুভারে, এবং প্যারিস মিউনিসিপ্যাল অফিসে, যেখানে স্বর্ণপদকে ওকে সম্মানিত করা হল। ফ্রেঞ্চ এয়ারো ক্লাবের ডিনারে লুই ব্লেরো (যিনি প্রথম ইংলিশ-চ্যানেল পার হয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন) বক্তৃতা দিলেন। লিণ্ডি যেখানে যান সেখানেই পথে ট্রাফিক জ্যাম!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিকে ক্রমাগত তাগাদা দিচ্ছেন, চার্লস

লিণ্ডবার্গ যেন অবিলম্বে দেশে ফিরে আসেন। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা জানাতে উদ্‌গ্রীব। তবু সরাসরি তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানো গেল না। রাষ্ট্রদূত একজনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেশ্বর কিং জর্জ দ্য ফিফ্‌থ প্যারিসস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়েছেন —দেশে ফেরার পূর্বে যেন চার্লস লিণ্ডবার্গ একবার লণ্ডনে আসেন।

যেতেই হল। কিং জর্জ দ্য ফিফ্‌থ বলে কথা। যে আমলের কথা তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না!

ক্রয়ডন এয়ারপোর্টে যে জনসমাবেশ হয়েছিল তাও একটি রেকর্ড।

লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকে ইংলণ্ডস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজ প্রাসাদে এবং বললেন, মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর অবিলম্বে লিণ্ডির সাক্ষাৎপ্রার্থী!

বেচারী লিণ্ডি। জীবনে সে রাজা-মহারাজার সামনে আসেনি। রাষ্ট্রদূত তাকে তালিম দিতে থাকেন—রাজ-দরবারে কখন নিচু হতে হবে, কখন পিছু হাঁটতে হবে।

অবশেষে বাকিংহ্যাম প্যালেস। সেখানে ওঁদের গাড়ি পৌঁছানো মাত্র এগিয়ে এলেন একজন লর্ড। অভ্যর্থনা জানালেন এবং জনান্তিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বললেন, সম্রাট জানিয়েছেন যে, তাঁর একটি ব্যক্তিগত ও গোপন প্রশ্ন আছে। তাই এ সাক্ষাৎকার সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি-কেউ থাকবে না।

রাষ্ট্রদূত ঘাবড়ে যান : আমিও না?

: আজ্ঞে না! এমন কি স্বয়ং সম্রাজ্ঞীও নন!

সম্রাটের ইচ্ছা! দুরুদুরু বুকে প্রকাণ্ড হল-কামরায় প্রবেশ করল লিণ্ডি। ওর মনে ছিল কতটা দূরে গিয়ে মাজা ভাঙতে হবে। তাই ভাঙলো। অভিবাদন করল। সম্রাট হাতছানি দিয়ে ওকে কাছে ডাকলেন। পাশের গদিমোড়া সিংহাসনে বসতে বললেন। উপবেশন

তো নয়, গদিমোড়া আসনের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল লিণ্ডি। সেই বিচিত্র মুহূর্তটির বর্ণনা দিতে চার্লস লিণ্ডবার্গের দিন পঞ্জিকার স্মরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ :

"We sat facing each other for an awkward moment, and then the monarch leaned forward.

"Now tell me, Captain Lindbergh," he said, "There is one thing I long to know. How did you manage to pee?

It was a question which, sort of put me at my ease. I said, Well, you see, Sir, I had a sort of aluminium container. I dropped the thing when I was over France. I was not going to be caught with the thing on me at Le Bourget."

The King-Emperor winked and smiled.

I did the same."

[একটি মুহূর্ত আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। অস্বস্তিকর এক মুহূর্ত। তারপর সম্রাট সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গ, আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতো। আমার জানবার দুরন্ত কৌতূহল। তুমি, মানে, হিসি করতে কী করে?'

এটি এমন একটি অন্তরঙ্গ প্রশ্ন যে, আমার স্বাভাবিকতা [illegible] ফিরে এল। আমি বললুম, "ইয়ে দেখুন স্যার, এজন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসি। আমার সঙ্গে একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ছিল। ফ্রান্সে পৌঁছানোর আগে আমি সেটা সমুদ্রে ঝেড়ে দি। মানে, আমি ঠিক চাইছিলাম না ওটা সমেত আমি বিমানপোতে ধরা পড়ি।

মহামহিম সম্রাটের শুধু বামচক্ষুটি সঙ্কুচিত হল। তিনি স্মিত হাসলেন।

আমি তাঁকে অনুকরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলুম।"]

*　　*　　*

নিউইয়র্ক শহরে চার্লস লিণ্ডবার্গের প্রত্যাবর্তন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। গল থেকে ফিরে সিজার যে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন রোমে, কিংবা নেপোলিয়ান অথবা দুনিয়ার আর কোনও দিগ্বিজয়ী বীর বোধ করি এভাবে সংবর্ধিত হন নি। ফিরেছিলেন মার্কিন রণতরী 'মেমফিস'-এ, ভাইস. অ্যাডমিরাল বারেজ স্বয়ং তাঁকে নিয়ে আসেন। জাহাজ-ঘাটায় তিনলক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল এবং নিউইয়র্কে সেণ্ট্রাল পার্কে যাওয়ার পথে যত লোক সমবেত হয়েছিল তার সংখ্যাটা কোন কাগজের মতে ত্রিশ লক্ষ, কারও মতে আধ কোটি! ব্রডওয়ের দুপাশের রাস্তা থেকে তার উপর যে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল এবং কাগজের কুচি ছড়ানো হয়েছিল তার ওজন নাকি দু-হাজার টন!

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলীজ ইতিমধ্যেই মিসেস্ ঈভাঞ্জেলিন লিণ্ডবার্গকে আনিয়েছেন। এ সংবর্ধনা সভায় তাঁর উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন। যথারীতি তোপধ্বনি হল। প্রেসিডেণ্ট কালভিন কুলীজ দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গ এখন কর্নেল লিণ্ডবার্গ। প্রেসিডেণ্ট সর্বসমক্ষে সেই বিজয়ী বীরের কণ্ঠে দুলিয়ে দিলেন সর্বোচ্চ সম্মান—'ফ্লাইং ক্রশ' পদক।

এবার লিণ্ডির বক্তৃতা। এখানেও তিনি এক বিশ্বরেকর্ড করলেন। এমন অনুষ্ঠানে কখনও কেউ এত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়নি। লিণ্ডি বললেন,

> "On the evening of May 21, I arrived at Le Bourget, France. I was in Paris for one week, in Belgium for a day and was in London and in England for several days. Everywhere I went, at every meeting I

attended, I was requested to bring home a message to you. Always the message was the same.

"You have seen," the message was, "the affection of the people of France for the people of America demonstrated to you. When you return to America take back that message to the people of United States from the people of France and of Europe."

I thank you."

[২১শে মে আমি ফ্রান্সের বিমানপোতে উপনীত হই। প্যারিসে ছিলাম এক সপ্তাহ, বেলজিয়ামে একদিন আর কয়েকদিন লণ্ডনে এবং ইংল্যাণ্ডের এখানে ওখানে। যেখানে গেছি, যে-কোন সভাতেই যোগ দিয়েছি, আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে একটি 'বাণী' বহন করে স্বগৃহে ফিরতে। সে বাণীটি বলছে, "আমেরিকাবাসীদের আমরা কত ভালবাসি তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখেছ! যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে তখন তোমার দেশবাসীকে জানিও আমাদের এই ভালবাসার কথা!"

আমার আর কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ!]

সেই সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির তরফ থেকে কর্নেল লিণ্ডবার্গকে পৃথক সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সকালে হয়েছে গোটা আমেরিকার পক্ষ থেকে সরকারী অভ্যর্থনা। সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র কিন্তু লিণ্ডির ও-বেলার রেকর্ড ভাঙলেন। সংবর্ধনা সভায় তিনি সংক্ষিপ্ততর ভাষণ দিলেন। সোনার তৈরী প্রকাণ্ড একটা চাবি বিজয়ী বীরকে কর্পোরেশনের তরফ থেকে উপহার দিলেন। বললেন "Colonel Lindbergh, New York City is yours—I give it to

you. You won it [কর্নেল লিণ্ডবার্গ, নিউইয়র্ক শহর আপনার। এই নিন তার চাবি। আপনি এ শহর জয় করেছেন]

এর চেয়ে অল্প কথায় এত বড় কথা খুব কম লোকই বলতে পেরেছেন।

রাতারাতি কর্নেল লিণ্ডবার্গ হয়ে গেলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ("We") নিউইয়র্ক টাইমস্ ছাপল—সম্মানমূল্য দিল ষাট হাজার ডলার। ঐ বই থেকে সে বছর তিনি রয়্যালটি পেলেন একলক্ষ ডলার। তাঁর স্বকণ্ঠে বর্ণিত অভিযান বর্ণনা রেকর্ড করা হল—সে বাবদ পেলেন তিন লক্ষ ডলার।

বলতে ভুলেছি, পঁচিশ হাজার ডলারের অর্টেগ পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি।

॥ দশ ॥

শুরু হল সম্পূর্ণ নূতন জীবন।

রাতারাতি লিণ্ডবার্গ হয়ে গেল কল্পলোকের রাজপুত্র। সংবাদপত্রে, মাসিকে, সাপ্তাহিকে সর্বত্র তার ছবি—অত্যন্ত সুদর্শন সেই পঁচিশ বছরের তারুণ্যে ভরপুর মানুষটি দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাসছে—Lindy smile! সারা আমেরিকা, বিশেষ করে মহিলা-মহল ওর বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠ্‌ল আরও একটি কারণে। শোনা গেল: স্বাস্থ্যবান, প্রাণচঞ্চল, এই হুল্লোড়ে ছেলেটা নাকি স্ত্রী-জাতীয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সে নাকি শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করে এসেও কখনও কোন মেয়ের সঙ্গে 'ডেট' করেনি, তার বান্ধবী নেই, এমন কি আজও পর্যন্ত সে নাকি জানে না, মেয়েদের চুমো খেলে কেমন লাগে। ওর নিকট বন্ধু ডাড্‌লে সাংবাদিকদের অবশ্য বলেছিল, না, কথাটা নির্জলা সত্য নয়। আমি উইন্সকিন কলেজে থাকতে দেখেছি—সে একজন মহিলাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সাংবাদিকের দল—ঐ 'স্কুপ-নিউজ'-এর সন্ধানে: কে, কে সেই মেয়েটি?

যেন কোন গোপন রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছে, ডাড্‌লে নিচু গলায় বলেছিল: ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ডলজ লিণ্ডবার্গ! ওর মা!

বলা বাহুল্য, বহু মেয়ে এ সময় ওর দিকে ঝুঁকেছিল—কেউ ফ্লার্ট করতে, কেউ সত্যই প্রেমে পড়ে। লিণ্ডি কাউকেই পাত্তা দেয়নি। নিউইয়র্কের উপর মহলের অনেক মহা-মহারথীর বাড়িতে তার নিত্য আমন্ত্রণ—লিণ্ডির উপস্থিতিই যে ডিনার পার্টির মূল আকর্ষণ হয়ে পড়ত। মর্গান কোম্পানির টমাস ল্যামণ্ট, বিমানযুগের আদিগুরু

অরভিল রাইট, কোটিপতি ক্ল্যারেন্স ম্যাকে, এবং মার্কিন রাজনীতির সে-কালের ধুরন্ধরগণ: রক্‌ফেলার, হার্বার্ট হুভার, থিওডোর রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্ক কেলগ্ প্রভৃতি। সোসাইটির ডজন-ডজন সুন্দরী কুমারীদের সঙ্গে নিত্য পরিচিত হতে হয়, কিন্তু ঐ 'হা-ডু-ডু'-র চেয়ে বেশি নৈকট্যে কেউ আসতে পারে না।

এই সময়েই ঘটনাচক্রে লিণ্ডির সঙ্গে আলাপ হল ড্যুইট হুইট্‌নে মরো-র।

মরো প্রথম শ্রেণীব রাজনীতিবিদ। অসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তি। প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর মৃত্যুর পর ১৯২৩-এ যখন ক্যালভিন কূলীজ প্রেসিডেন্ট হলেন তখন সবাই আশা করেছিল, মরো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্তর্ভূত হবেন—হয় স্বরাষ্ট্র অথবা বৈদেশিক মন্ত্রক। কারণ কূলীজ ছিলেন মরোর সহপাঠী বাল্যবন্ধু। বাস্তবে তা হল না। অনেকে বলে—কূলীজ ভয় পেয়েছিলেন মরোর প্রতিভাকে! পরবর্তী নির্বাচনে কূলীজকে হারিয়ে তিনিই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন। দেখা গেল, প্রেসিডেন্ট ঐ প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিকটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে ফেলতে উদ্‌গ্রীব। মরো-কে পাঠিয়ে দেওয়া হল মেক্সিকোতে—সেখানকার রাষ্ট্রদূত করে। অজুহাত: মেক্সিকোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কটা সম্প্রতি অত্যন্ত তিক্ত হয়ে পড়েছে। একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ লোককে রাষ্ট্রদূত করে সেখানে পাঠানোর দরকার। মরো মনে মনে হাসলেন। মুখে বললেন, ঠিক আছে।

এই সময়েই মরোর সঙ্গে আলাপ হল লিণ্ডির। মরো তাকে নিমন্ত্রণ করলেন: মেক্সিকো বেড়াতে যাবে?

লিণ্ডিও ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিউইয়র্কের খানদানী কৃত্রিম আবহাওয়ায়। একটু নির্জনতাই খুঁজছিল সে। বললে, রাজী আছি, এক শর্তে। আমি ঐ 'স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই' বিমান চালিয়েই যাব। যাব একা এবং না থেমে!

মিসেস্ মরো বাধা দিয়ে বলেন, না, না, এসব ঝুঁকি অহেতুক নেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ মরো জানেন—ঐ পাগলাকে লোভ দেখানোর ঐটাই সুযোগ, আরও জানেন—এভাবেই লিণ্ডি মার্কিন-মেক্সিকো মন কষাকষির আসরে নাটকীয় প্রবেশ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কার্যত হলও তাই। রাতারাতি তিনি এই অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন কাগজে ও রেডিওতে। কর্নেল লিণ্ডবার্গকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য তখন সারা পৃথিবী পাগল। রাতারাতিই তৈরী হয়ে গেল মেক্সিকো-সিটির বিমান বন্দরে এক বিরাট মঞ্চ আর প্যাণ্ডেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে এল বিমান বন্দরে। ১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৭ একা 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুই' বিমান চালিয়ে কর্নেল লিণ্ডবার্গ যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন মেক্সিকো-মার্কিন তিক্ততার কথা কারও মনে নেই। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট নিউইয়র্কের মেয়রের অনুকরণে একটি সোনার চাবিকাঠি কর্নেল লিণ্ডবার্গের হাতে তুলে দিয়ে বললেন : অস্ত্র এবং বৈরীতা দিয়ে নয়, প্রেমে ও সৌহার্দ্যে আপনি এ শহর জিতে নিয়েছেন! এই নিন শহরের চাবিকাঠি!

লিণ্ডি রাষ্ট্রদূতের মাননীয় অতিথি। মরো সাহেবের পুত্রসন্তান ছিল না—তিন কন্যা। বড় এলিজাবেথ এবং ছোট কন্সটান্স। বড়টি লিণ্ডিরই বয়সী, ছোটটি 'টীন এজার'। ওরা পেয়ে বসল লিণ্ডিকে—ছোট বোনের মত হৈচৈ শুরু করে দিল। ওরা সদলবলে আশ-পাশের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখতে যায়। আজ্‌টেক, টোলটেক এবং মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ—মিশরের পিরামিডের মত অদ্ভুত দর্শন পিরামিড। বাপ, মা, দুই মেয়ে আর লিণ্ডি। পিকনিক লেগেই আছে। মিসেস্ মরো টেলিগ্রাম করে আনিয়ে নিলেন তাঁর মেজ মেয়েকে : অ্যান মরো। বছর একুশ বয়স। সে কলেজে পড়ছিল, উত্তর মেক্সিকোর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অ্যান লাজুক, নম্র স্বভাবের;

সে কবিতা লেখে। প্রবন্ধ ও সাহিত্য রচনা করে ইতিমধ্যেই সে অনেক প্রাইজ পেয়েছে। মায়ের টেলিগ্রাম পেয়ে মেজ মেয়ে ছুটে এল রাজধানীতে। খবরের কাগজে সে ইতিমধ্যেই লিণ্ডির আবির্ভাবের কথা জেনেছিল। লিণ্ডি তারও 'হিরো'! জনান্তিকে জানাতে পারি—লিণ্ডির সাফল্যে সে তাকে উদ্দেশ করে একটি কবিতাও লিখেছিল। তাকে পাঠায়নি; কবিতাটা মুখ লুকিয়েছিল ওর দিনপঞ্জিকার পাতার আড়ালে।

এবার আমাকে মাপ করতে হবে। ওঁরা দুজনেই অনেক অনেক বই লিখেছেন, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন কিন্তু প্রাকবিবাহ জীবনের পূর্বরাগের কথা বিস্তারিত জানতে দেননি পাঠককে। বানিয়ে বানিয়ে দিব্যি প্রেমের গল্প ফাঁদতে পারতুম—আপনিও খুশি হতেন, আমিও; কিন্তু বিবেকে বাধছে। হয়তো তার কারণটা এই: আপনিও তাতে খুশি হতেন না, আমিও না। তাই যেটুকু তথ্য জানা গেছে তাই লিখে যাই:

(১) মরো-পরিবারের নিমন্ত্রণ পেয়ে মিসেস্ ঈভাঞ্জেলিন লিণ্ডবার্গ এসেছিলেন মেক্সিকো সিটিতে। কি জানি কেন, লিণ্ডিকে তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন: অ্যানকে তোর কেমন লাগে?

লিণ্ডি চমকে উঠেছিল। বলেছিল, হঠাৎ একথা কেন জানতে চাইছ?

: মেয়েটি ভা-রি ভালো!

(২) ঐ সময়ে অ্যান মরোর দিনপঞ্জিকায় একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা গেছে:

"আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু···না, না, আমি আজীবন কুমারী থাকব!"

(৩) লিণ্ডবার্গ স্বীকার করেছেন—মেক্সিকোতে যতদিন ছিলেন অ্যান তাঁকে বরাবর এড়িয়ে চলত। একান্তে কখনও কোন কথাবার্তা হয়নি। অথচ ওর দুই বোন খুবই হৈ-

হুল্লোড় করত। কিছুদিন পরে নিউইয়র্কে ফিরে এসে কর্নেল লিণ্ডবার্গ তাঁর নিরাপদ পৌঁছানো-সংবাদ জানাবার জন্য মেক্সিকো সিটিতে 'লং-ডিস্টান্স-ফোন' করেন। অ্যান মরো তাঁর দিনপঞ্জিকায় শুধু লিখেছেন : Accidentally I answered the phone call [ঘটনাচক্রে আমিই টেলিফোনটা ধরি] ব্যস্! আর কিছু নেই! আমরা কি এ থেকে কল্পনা করব : চক্ষুলজ্জার বালাই না থাকায় ঐ দূরভাষে কিছু নিকটভাষ হয়েছিল? লাজুক অ্যান এবং নারীভীত লিণ্ডির মধ্যে?

(৪) হয়তো তাই। কারণ দেখছি—এর পর অ্যান বেড়াতে এল নিউইয়র্কে। এবার সেই ফোন করে লিণ্ডিকে। তারপরেই দেখছি, শহরের বাইরে এক জনবিরল এয়ারস্ট্রিপ থেকে বিমান নিয়ে উড়ছেন কর্নেল লিণ্ডবার্গ। অ্যান কখনও বিমানে চড়েনি—তাকে বিমান থেকে নিউইয়র্ক শহরটা দেখানো ছাড়া লিণ্ডির নাকি আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না!

(৫) এর পরেই অ্যান তার এক নিকট বান্ধবীকে চিঠিতে লিখছে : Apparently I am going to marry Charles Lindbergh. It must seem hysterically funny to you as it did to me···Wish me courage and strength and a sense of humour—I will need them all."

[মনে হচ্ছে, চার্লস লিণ্ডবার্গকেই বিয়ে করতে হবে। নেহাত পাগলামি! তাই ভাবছিস তো? আমারও তাই মনে হচ্ছে···ভগবানের কাছে আমার জন্য কিছু সাহস, শক্তি আর রসবোধ প্রার্থনা কর—ঐ সবগুলোরই এখন ভীষণ প্রয়োজন।]

জানি, এমন দফা-ওয়ারি বর্ণনায় প্রেমের গল্পটা আদৌ জমল না। কিন্তু আমি কী করতে পারি? বঙ্কিমী আমল হলে না হয় উল্টে আপনাদেরই ধমক দিতুম: "বোধহয় কোর্টশিপটা পাঠকের ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছুই নাই—'হে প্রাণ!' 'হে প্রাণাধিক!' সেসব কিছুই নাই—ধিক!"

শুধু কোর্টশিপ নয় ওদের বিয়েটাও হল আড়ালে-আবডালে, আধা-গান্ধর্ব মতে। ২৭শে মে ১৯২৭। ঈভাঞ্জেলিন লিণ্ডবার্গ টেলিগ্রাম পেয়ে তড়িঘড়ি ফিরে এলেন মার্কিন মুলুকে সুদূর তুরস্ক থেকে। ইদানীং তিনি কনস্তান্তিনোপ্ল-এ একটি আমেরিকান কলেজে অধ্যাপনা করেন। কী ব্যাপার? তিনি যাচ্ছেন নিউ জার্সিতে এঙ্গেলউডে 'নেক্স-ডে-হিল' বাগানবাড়িতে। কেন? মিসেস্ মরোর নিমন্ত্রণ রাখতে। মিসেস্ মরো নাকি একটা ছোট্ট ঘরোয়া পার্টি দিচ্ছেন!

সাংবাদিকেরা ঘাবড়ে যায়—এ কেমন কথা? মিসেস্ মরো রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিণী; তিনি পার্টি থ্রো করলে তা এমন চুপিসারে হবে কেন? কেন নয় নিউইয়র্কের সবচেয়ে খানদানী হোটেলে? আর তেমন একটি ছোট্ট ঘরোয়া সান্ধ্য-আসরে যোগ দিতে মিসেস্ ঈভাঞ্জেলিন লিণ্ডবার্গ কেন এশিয়া মহাদেশ থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে ছুটে এলেন? উঁহু! ভিতরে 'সামথিং হ্যাজ!' না ডাকতেই ওরা গুটি গুটি এসে হাজির হল ক্যামেরা হাতে।

যা আশা করেছে! কর্নেল লিণ্ডবার্গও গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। ফ্ল্যাশ্! ফ্ল্যাশ্! ফ্ল্যাশ্!

পার্কিন জোনে গাড়ি রেখে লিণ্ডি চলে গেল ভিতরে।

সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হল না। অভ্যর্থনায় অবশ্য ত্রুটি হল না। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে গেল খিদ্‌মতগারেরা।

আধঘণ্টা পরে রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন আর্থার স্প্রিঙ্গার

—রাষ্ট্রদূত মরো-সাহেবের একান্ত সচিব। সমবেত সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে বললেন: ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ! একটি আনন্দ সংবাদ আছে। দশ মিনিট আগে পাশের ঘরে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ মরোর মধ্যম কন্যা অ্যান মরোর সঙ্গে কর্নেল চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে।

লাফিয়ে ওঠে সাংবাদিকের দল: মানে? সেকি! ইয়ার্কি নাকি? কে বিয়ে দিল?

: ডক্টর উইলিয়াম অ্যাডামস্ ব্রাউন। স্থানীয় গ্রাম্য গীর্জার পাদরি!

ওরা আর বাধা মানল না। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পাশের ঘরে। সেখানে সবাই আছেন—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ মরো, ঈভাঞ্জেলিন, এলিজাবেথ, কন্সটান্স, ডক্টর ব্রাউন এবং সগুকর্তিত একটি 'ওয়েডিং কেক'। নেই শুধু দুজন—লিণ্ডি এবং অ্যান। পিছনের দরজা দিয়ে দুজন কেটে পড়েছে! নিঃসাড়ে!

: কী আশ্চর্য! ওরা···ওরা কোথায় হনিমুনে গেল?

: দুঃখিত! সে কথা ওরা বলে যায়নি!

একজন সাংবাদিক ব্রাউন-সাহেবকে পাকড়াও করে—আপনি বলুন ফাদার! কনের পরনে কি ছিল? মাথায় মুকুট ছিল? সে কি কাঁদছিল? মানে, চোখে কি জল দেখেছিলেন?···কী আশ্চর্য! কাল কাগজে কি ছাপব? বলুন, বলুন?

ডক্টর ব্রাউন মাথা নেড়ে বললেন, কনে কী পরেছিল তা লক্ষ্য করে দেখিনি। তবে তাকে খু-ব সুন্দর দেখাচ্ছিল!

: হেত্তেরি! কেউ একটা ফটো নেয়নি? আমরা এতগুলি মানুষ ক্যামেরা নিয়ে···

: আর চোখে জল ছিল কিনা? না, ছিল না। লক্ষ্য করে অবশ্য দেখিনি; কিন্তু জল থাকবে কেন? কাঁদার কি আছে?

ডক্টর ব্রাউন ঠিক বলেননি। তিনি ঠিক লক্ষ্য করেননি। কারণ মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না—এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব!

॥ এগারো ॥

দু-আড়াই বছর পরের কথা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে কর্নেল লিণ্ডবার্গের জীবনে। মনে হচ্ছে, জাহাজটা বুঝি বন্দরে ভিড়েছে এতদিনে। সংসার হওয়ায় সংসারী হয়েছে। প্রাকবিবাহ পর্যায়ের সেই বাধা-বন্ধহীন প্রভঞ্জনগতি জীবনবেগ যেন এতদিনে কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। একদিনেই নয়, ক্রমে ক্রমে। ওদের হনিমুন ভ্রমণটাও ছিল সেই উদ্দামতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। একটা প্লেন নিয়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তটা দেখতে গিয়েছিল ওরা—আমেরিকা থেকে য়ুরোপ, য়ুরোপ থেকে এশিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন। নতুন পৃথিবী। ফিরে এসে সেই অপূর্ব হনিমুন ট্রিপের ভ্রমণ কাহিনী লিখেছে অ্যান : 'নর্থ-বাই ওরিয়েণ্ট'। কিন্তু হনিমুনে অ্যানের সঞ্চয়ে শুধু বিচিত্র ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই জমা পড়েনি, সঞ্চয়ের খাতায় জমা পড়েছিল আরও কিছু অমূল্য সম্পদ! ঠিক যেন লিণ্ডবার্গের জীবন নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয়। কর্নেল লিণ্ডবার্গ জুনিয়ার তার মায়ের গর্ভে এসেছিল মিসেস্ ঈভাঞ্জেলিন ল্যাণ্ড লিণ্ডবার্গ যখন নববধূ—যখন সে লিণ্ডবার্গ সিনিয়ারের সঙ্গে নারীজীবনের মধুযামিনীর অবাক পর্যায়টা অতিক্রম করছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়—সেই যখন হনিমুন-ট্রিপে চীনেমাটির ডিনার সেটটা কিনছেন। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি—অ্যান লিণ্ডবার্গও মুঞ্জরিত হল মধুযামিনীর স্মৃতি উজ্জ্বল থাকতে থাকতেই। কর্নেল লিণ্ডি তো আহ্লাদে আটখানা, বলে—জানো অ্যান, আমার ছেলের নাম দেব চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ জুনিয়ার!

অ্যান বলে, সে কি! সে তো তোমার নাম?

: না! আমার ইতিমধ্যে একধাপ প্রমোশন হয়েছে। আমি এখন সি. এ. লিণ্ডবার্গ, সিনিয়ার!

অ্যান বলে, কিন্তু যদি মেয়ে হয়?

দমে যায় লিণ্ডি। চম্‌কে ওঠে, মেয়ে! ধ্যা-স্‌! মেয়ে হবে কেন? না, না ছেলে! চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ

অ্যান হাসতে হাসতে বলে, স্লিম! এ তোমার অ্যাট্‌লান্টিক পাড়ি দেওয়া নয়, যে মনের জোরে দৈবকে অতিক্রম করবে। মেয়ে হওয়ার চান্স ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট! যদি মেয়ে হয়, তবে তার নাম রাখব 'অ্যান্‌লি'! অ্যান-লিণ্ডি!

: সন্ধির সূত্রটা ভাল, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মেয়ে নয়, ছেলেই হবে!

: তোমার ইচ্ছার জোরে?

: হ্যাঁ তাই!

লিণ্ডির ইচ্ছার জোরে নিশ্চয় নয়, কিন্তু ছেলেই হয়েছিল তার। লিণ্ডি-জুনিয়ার!

ইতিমধ্যে নিউ-জার্সির হোপওয়েলে লিণ্ডি প্রকাণ্ড একটা বাগানবাড়ি কিনেছে। দ্বিতল বাড়ি, খানদশেক ঘর, বাড়িটাকে ঘিরে যে জমি তা পাঁচশ একর! যেন দুনিয়ার বার! উত্তরে আরণ্যক কাঁকরে জমির ধূসর উদাসীনতা, দক্ষিণে বন্ধ্যা জলাভূমিতে পানকৌড়ি আর ডাহুকদের মিছিল, চারদিকে শুধু ওক-বার্চ-পাইন আর ফার্‌! লিণ্ডি নিশ্চয় 'ক্ষণিকা' পড়েনি, কিন্তু ওর ভাবখানা—'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে/আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভাল চলে।'

আসলে 'ফ্যান' আর 'হিরো-ওয়রশিপার'দের হাত এড়াতে, সাংবাদিকদের ক্যামেরার জ্বালায় এ আয়োজন। জায়গাটার নামটাও লাগসই, ওর মনের মত: হোপওয়েল! 'ভালো-আশা'! কোন

ছন্দোবদ্ধ পদের ওটা শেষ শব্দ হলে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দটি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এই একান্ত আবাসে দশ-কামরার বাড়িতে মানুষ কিন্তু আড়াইজন, তাই বা কেন? সওয়া দুজন। জুনিয়ারের বয়স এখন বিশ মাস—পুরো দুবছরও হয়নি। এছাড়া দেখ্‌ভাল করার জন্য বেতনভুক আরও কজন আছে—খোকনকে রাখার জন্য নার্স 'বেটি'। আর আছে ভায়োলেট সার্প—আঠাশ বছরের ইংরাজ তরুণী; বাটলার অলিভার ব্যাঙ্কস্ এবং পাচক-কাম-কেয়ারটেকার এল্‌সি। সপ্তাহান্তে ওঁরা যখন ইগ্‌ল্‌উডে যেতেন তখন বাড়ির দায়িত্ব বর্তাতো এদেরই উপর।

হ্যাঁ, প্রতি সপ্তাহান্তেই ওঁরা গাড়ি নিয়ে ইগ্‌ল্‌উডে যেতেন, মিসেস্ মরোর কাছে। স্বামীহীনা মিসেস্ মরো সারাটা সপ্তাহ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতেন—কবে আসবে শনিবার, আসবে মেয়ে-জামাই আর সেই টুল্‌টুলে নাতিটি!

১লা মার্চ, ১৯৩২।

শীতটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না, বরং শীতের শেষ কামড় দিতে গত হপ্তা থেকে যেন ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। খোকনের একটু সর্দিজ্বর মতো হয়েছিল, তাই শেষমুহূর্তে এবার সপ্তাহান্তিক ইগ্‌ল্‌উড যাত্রাটা স্থগিত রাখা হয়েছে। অ্যান তার মাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে—এ সপ্তাহে ওরা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলা। একতলার 'ডাইনিং হলে' কর্নেল এবং মিসেস্ লিণ্ডবার্গ নৈশাহার সারছেন। ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। এল্‌সি আহার্য পরিবেশন করছে। হঠাৎ কর্নেল একটু চমকে উঠে বললেন, ও কিসের শব্দ?

অ্যান কান খাড়া করল। বলল, কই? আমি তো শুনিনি কিছু। কি রকম শব্দ?

: মনে হল একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স মড়াৎ করে ভেঙে গেল।

দুজনেই কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। নির্জন আরণ্যক আবাসে একমাত্র ঝিঁঝি পোকার ডাক। অ্যান বললে, হয়তো কোনও গাছের মরা ডাল ভেঙে পড়ল।

: তা হবে!

আহারান্তে অ্যান উঠে গেল তার ঘরে। এ সময় সে কিছুটা ম্যাগাজিন পড়ে। কর্নেল বলেন, তুমি শুয়ে পড়, আমার একটা জরুরী চিঠি টাইপ করা বাকি।

তিনি উঠে গেলেন একতলার স্টাডি-রুমে।

রাত দশটা। শহরের কল-কোলাহল নেই। দশটাই এ রাজ্যে নিশুতি রাত। একতলায় একমাত্র স্টাডিতে বাতি জ্বলছে। অন্যান্য ঘর অন্ধকার। নার্স বেটি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে আসে। মনটা আজ তার খুশিয়াল। সে দেখে ফেলেছে—ঐ অজানা ছেলেটা ভায়োলেটকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। বাস্তব-প্রেমের এমন দৃশ্য নজরে পড়লে মনে মনে সকলেই খুশিয়াল হয়ে ওঠে। তাছাড়া ভায়োলেট সার্প ওর বান্ধবী। বেচারির এতদিন কোন বয় ফ্রেণ্ড ছিল না। বেটির ছিল—আঁরি জনসন, নরউইজিয়ান। প্রায়ই সে বিকালের দিকে আসে সাইকেলে চেপে, বেটিকে হ্যাণ্ডেলে চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। ভায়োলেট পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ে। বেটি কিন্তু বুঝতে পারত ভায়োলেটের মনোবেদনা। এই নির্বান্ধব পুরীতে দুটি অনূঢ়া তরুণী, তার মধ্যে—হ্যাঁ, স্বীকার করে বেটি তার বান্ধবীই বেশি সুন্দরী। তবু তার বয়ফ্রেণ্ড ছিল না এতদিন। যা হোক, এতদিনে একটা হিল্লে হয়েছে। অচেনা ছেলেটি কে তা জানে না বেটি; কিন্তু আজ নিয়ে তিনদিন সে দেখেছে ছেলেটিকে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায়। আজ তো সিঁড়ির মুখে ভায়োলেটকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেই দেখল। ধরা পড়ে ভায়োলেট বলে, বেটি, আমরা দুজনে রাতের শো'য়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে যাচ্ছি, বুঝলি?

বেটি বলে, রাতের খাবারটা কি তোর ঘরে এনে রেখে দেব ?

ভায়োলেট জবাব দেওয়ার আগেই তার বয়-ফ্রেণ্ড বলেছিল, না, ও খেয়েই ফিরবে !

বেটি মুখ টিপে বলেছিল, আমি নৈশাহারের কথা বলছি, তুমি এখনই ওকে যা খাওয়ালে তাতে পেট ভরে না !

অচেনা ছেলেটা বেশ মুখফোঁড়। বলেছিল, তুমি যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছ, তখন মানতেই হবে। তা ও নৈশ আহারও সেরে ফিরবে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বেটি উঠে আসে সিঁড়ি দিয়ে। খোকনের নার্সারিতে। কর্তা-গিন্নীর শয়নকক্ষের পাশেই খোকনের নার্সারি। দিনান্তের শেষ কাজ খোকনকে হিসি করিয়ে দেওয়া। ঘরটা অন্ধকার। নীরন্ধ্র আঁধার নয়, আকাশে একফালি চাঁদ ছিল, কাঁচের জানালা দিয়ে তারই একমুঠো রূপালী আলো এসে পড়েছে ঘরে। কেউ না দেখলেও চাঁদ তার কাজ করে যায় : চাঁদের কপালে চাঁদ টী' দিয়ে যায়।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি হল বেটির। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন কানে-কানে বলে দিল—কোথায় কি যেন একটা ঘটেছে। বেটি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে খোকনকে বেবি-কট থেকে তুলতে গেল। এ কী ? খাটে তো খোকন নেই ! গোটা বেবি-কটটায় সে দ্রুত হাত বুলালো—না ! খাটে খোকন নেই।

পাশেই মিসেস্ লিণ্ডবার্গের ঘর। বেটি ঢুকে পড়ল 'নক' না করেই।

: খোকন আপনার কাছে ?

: না তো। কেন ?

জবাব দেবার সময় নেই। হুড়মুড়িয়ে নেমে এল একতলায়। স্টাডিরুমে একমনে টাইপ করছিলেন কর্নেল। চমকে উঠলেন বেটির প্রশ্নে : খোকন কি আপনার কাছে ?

: না! কেন, ওর খাটে ঘুমাচ্ছে না?

তিন জনেই ছুটে এলেন নার্সারিতে। ঝিমন্ত বাড়িটা জেগে উঠেছে। ঘরে ঘরে আলো। সবাই জড়ো হল। আশ্চর্য! কোথায় গেল খোকন? ওকে বেবি-কটে শুইয়ে তার গলা পর্যন্ত একটা কম্বল টেনে বেটি সেফ্‌টিপিনে সেটাকে বিছানার চাদরের সঙ্গে আটকে দিয়েছিল—বিছানাটা ঠিক একই ভাবে আছে। বেবি-কটের চারধারে উঁচু রেলিং ঘেরা—গড়িয়ে পড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে? তবু বেটি, অ্যান সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাই তল্লাস করতে থাকেন।

: একী! জানালার পাল্লাটা খোলা কেন?—কর্নেল ছুটে যান সেদিকে।

পাল্লাটা শুধু খোলাই নয়, একটা শার্সি ভাঙা—সেখান দিয়ে হাত গলিয়ে বাইরে থেকে ছিটকানি খোলা হয়েছে। ঠিক তখনই নজর পড়ল আরও দুটি জিনিস। জানালার 'সিল্'-এ কাদামাখা জুতোর দাগ, আর তার পাশেই একটি মুখবন্ধ খাম!

পরিষ্কার হয়ে গেল সমস্যাটা। খোকনের অন্তর্ধান রহস্যের প্রথম অধ্যায়। দাঁতে দাঁত চেপে কর্নেল বললেন, খোকনকে ওরা চুরি করেছে!

: ওরা! ওরা কারা? কেন?—অবোধ দুটি চোখ মেলে অ্যান জানতে চায়।

সে কথার জবাব জানা নেই কর্নেলের। বললেন, কেউ কোন কিছু স্পর্শ কর না। না, ঐ খামটাও নয়। আমি এখনই আসছি।

ছুটে নেমে এলেন নিচে। পর পর দুটি টেলিফোন করলেন। প্রথমটা নিউ জার্সি স্টেট পুলিশ। দ্বিতীয়টা ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা কর্নেল হেনরি ব্রেকিংরিজকে। তারপরেই আলমারি খুলে বার করলেন তাঁর দোনলা বন্দুকটা, আর বড় টর্চটা। ছুটে বেরিয়ে গেলেন অন্ধকারে। অলিভার তাঁর পিছন পিছন।

হোপওয়েল থানা থেকে ইন্সপেক্টর যখন এসে পৌঁছালো তার পূর্বেই লিণ্ডবার্গ তাঁর গৃহ-সংলগ্ন বিস্তৃত জমির প্রতিটি প্রান্ত তল্লাস করে ফিরে এসেছেন। কে কারা, কেন বাচ্ছাটাকে চুরি করেছে তা বোঝা যায়নি বটে কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিক ইঙ্গিতবাহী ক্লু। এক: জানালার নিচেই কাদার মধ্যে দেখা গেছে দুটি ছোট গর্ত— যেন ওখানে কোন মই খাটানো হয়েছিল। অনুমানটা প্রমাণিত হল অদূরে একটি মই খুঁজে পাওয়ায়। গর্ত দুটির ব্যবধান ঐ মইয়ের দুটি পায়ার ফারাকের মাপে। মইটার তিনটি অংশ—এমনভাবে তৈরি, যাতে তিনটি অংশ খুলে মোটর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ পোর্টেব্‌ল্। লক্ষ্য করে দেখা গেল তার উপরের ধাপে একটি সিঁড়ি ভাঙা।

কর্নেল বললেন, লোকটা এসেছিল আটটা কুড়ি মিনিটে।

: কি করে জানলেন ?

: সিঁড়ির ঐ ধাপটা যখন ভাঙে তখন শব্দ পেয়েছিলাম আমি।

ইতিমধ্যে পুলিশ ও ডিটেকটিভ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেছে বাড়িটা। না, আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি কোথাও। সবাই গোল হয়ে এবার বসেছেন বাইরের ঘরে। লিণ্ডবার্গ, হেনরি, পুলিশ-সার্জেন্ট, ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট এবং ডিটেকটিভ। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন লিণ্ডবার্গ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, মুখ থেকে হাত দুটো সরে গেল। বন্ধুর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন, হেনরি! আমি তো জীবনে কখনও কারো সঙ্গে শত্রুতা করিনি! তাহলে কেন ?

কর্নেল হেনরী ব্রেকিংরিজ জবাব দিলেন না। নীরবে বন্ধুর হাতটা টেনে নিলেন। জবাব দিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর : না কর্নেল। শত্রুতা নয়। টাকার জন্যে! অর্থলোভে!

বাড়িয়ে ধরেন একটি খোলা খাম। সেই যেটা পাওয়া গেছে জানালার সিল্‌-এ।

লিণ্ডবার্গ চিঠিখানা নিলেন। ছোট্ট চিঠি। টাইপ করা নয়। হাতের লেখা বেশ কাঁচা এবং প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি :

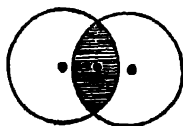
Dear sir,

Have 50000 $ ready 25000 $ in 20 $ bills 15000 $ in 10 $ bills and 10000 $ in 5 $ bills After 2-4 days we will inform you were deliver the'mony. We warn you for making anyding public or for notify the police. The child is in gut care. Indication for all letters are singnature and three holes.

[প্রিয় মশাই,

পঞ্চাশ হাজার ডলার তৈরী রাখুন। পঁচিশ হাজার বিশ-ডলার নোটে, পনের হাজার দশ-ডলার নোটে, আর দশ হাজার পাঁচ-ডলার নোটে। দু-চার দিনের ভিৎরে আমরা জ্যাপন করব ট্যাকাটা কীভাবে দিতে হবে। সতর্ক করে দিচ্ছি পুলিশে খপর দেবেন না। বাচ্ছাটা খুব যত্নে আছে। চিঠি চিনবেন এই শ্বাক্ষরে আর তিনটি ছ্যাঁদায়]

স্বাক্ষরটি একটি প্রতীক চিহ্ন—দুটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে মাঝখানে একটি ডিম্বাকৃতি লাল চিহ্নকে ধরে রেখেছে। দুটি বৃত্তে এবং ডিম্বাকৃতি চিত্রে—একুনে তিনটি ছিদ্র। পরিচয় চিহ্নটায় নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্য আছে। এ যদি কোন আধুনিক চিত্রকরের বিমূর্ত চিত্র হত তবে ব্যাখ্যায় বলতে পারা যেত : দুটি বৃত্ত হচ্ছে দুটি ব্যক্তিত্ব—কর্নেল লিণ্ডবার্গ এবং অপহরণকারী। ওদের জীবনে জীবন হঠাৎ জট পাকিয়ে



গেছে। আর সেই জটিলতায় ধরা পড়েছে একটি নিরপরাধ মানব-শিশুর জীবন—ঐ ডিম্বাকৃতি চিহ্নটা, যার কেন্দ্রস্থলে বিশমাস বয়সের একটি হৃৎপিণ্ড এখনও ধুকপুক করছে।

চিঠি থেকে মুখ তুলে লিণ্ডবার্গ বললেন, ইন্সপেক্টর! ভুলে যান আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। সংবাদপত্র যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন।

ইন্সপেক্টর জানেন, কর্নেল লিণ্ডবার্গের কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলার কিছুই নয়। তিনি তখন দু-দুটি বিখ্যাত এয়ার-লাইনের টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসার। বস্তুত অপহরণকারী যদি সাহস করে দ্বিগুণ বা তিনগুণ অর্থও দাবী করত তাহলেও লিণ্ডবার্গ একই কথা বলতেন। তিনি বললেন, আপনার যেমন অভিরুচি। কিন্তু কাজটা বোধহয় ভাল করলেন না।

: আমার বিনীত নিবেদন—কাতরভাবে ভিক্ষা করলেন কর্নেল।

: অগত্যা।

'হোয়াট প্রাইস্ গ্লোরি!' খ্যাতির বিড়ম্বনা কতটা! সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে যা হত না, বিশ্ববিখ্যাত পাইলট চার্লস লিণ্ডবার্গের ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে তাই ঘটে গেছে। ইন্সপেক্টর যখন বলছে 'অগত্যা' তখন সারা আমেরিকার সংবাদপত্র অফিসগুলিতে ছোটাছুটি পড়ে গেছে। রাত তখন একটা। সকলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কাল 'হেডলাইন' নিউজটা নতুন করে ছাপতে হবে। হোপওয়েল থানা টেলিফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের তিন তিনটি স্টেটের পুলিশ দপ্তরে সংবাদটা জানিয়েছে। পথের মোড়ে মোড়ে পুলিশ ভ্যান প্রতিটি নৈশ অভিযাত্রীকে রুখছে, তত্ত্বতাল্লাশ করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে। খবরটা মোটেই চাপা নেই। পুলিশ ও সাংবাদিক সেরাত্রে ঘুমোয়নি।

ভোর হতে না হতে কয়েক হাজার কৌতূহলী জনতা এসে উপস্থিত হল লিণ্ডবার্গ-ভিলায়।

পরদিন আমেরিকার প্রতিটি সংবাদপত্রে ছাপা হল বাচ্চা লিণ্ড-বার্গের খাদ্যতালিকা। দিনে সে ক-বার দুধ খায়, প্রতি বারে কতটা,

চিনি দেওয়া হবে কি হবে না! যেই চুরি করে থাক—আহা, বাচ্ছাটার যেন শরীর খারাপ না হয় অনভ্যস্ত আহারে।

তৃতীয় দিন একাধিক সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত কলমে প্রকাশিত হল অজ্ঞাত শত্রুর প্রতি কর্নেল লিণ্ডবার্গের আবেদন: পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল নির্দেশনা পাঠ করার আগেই। সর্ত মেনে নিচ্ছি। আরও জানাচ্ছি, খোকনকে ফেরত পেলে কোন রকমের প্রতিহিংসা নেওয়া হবে না।

তার পরের দিন, ৪ঠা মার্চ, চার্লস লিণ্ডবার্গের ডাক বাক্সে পাওয়া গেল একটি পত্র। সেই হস্তাক্ষর, সেই বিচিত্র "স্বাক্ষর" এবং সেই ঝুড়ি-ঝুড়ি বানান ভুল। Good health কে লেখা হয়েছে gut heatlh, money এবারও mony, এবং until the police is oul of the case and the papers are quiet" হচ্ছে "until the Polise is out of the cace and the pappers are quite."

লোকটা কি ইচ্ছে করে বানান ভুল করছে? 'gut' এবং 'aus' লিখে বোঝাতে চাইছে সে জার্মান, সামান্য ইংরাজী জানে? হতে পারে। কারণ প্রথম চিঠির 'anyding' এবার লেখা হয়েছে বিশুদ্ধ-ভাবে: anything। কেন?

এবার ও লিখেছে পঞ্চাশ নয়, ওর দাবী সত্তর হাজার ডলার। কিভাবে টাকাটা দেওয়া যাবে তার নির্দেশ নেই।

একদল বলেন, লোকটা সত্যাই ইংরাজী ভাল জানে না! অপর দলের অভিমত সে ইচ্ছা করে ওভাবে চোখে ধুলো দিতে চাইছে। লিণ্ডবার্গের অনুরোধে পুলিশ সাময়িকভাবে হাত গুটিয়েছে। লিণ্ডবার্গ এবং ব্রেকিংরিজ স্থির করলেন—আণ্ডারগ্রাউণ্ড জগৎ, অর্থাৎ গুণ্ডা-বদমায়েশদের নিচের মহল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কোনও লোককে নিযুক্ত করতে হবে। তাই করা হল: মরিস রস্নার! জুয়ার আড্ডা, গুণ্ডা, বদমাশ, মানে অপরাধ-প্রবণ জগৎটার যাবতীয় সংবাদ

নাকি তার নখদর্পণে। দিন কতক সে ঘোরাঘুরি করল সে সব মহলে কোনও হদিস পেল না।

রুদ্ধ নিশ্বাসে পৃথিবী প্রতীক্ষা করছে।

এমন সময়ে ঘটল একটা ঘটনা। সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন একজন নতুন অভিনেতা : ডক্টর জন কণ্ডন।

বারো

আপনারা গুড বাই মিস্টার চিপস্ পড়েছেন? বেশ, না হয় নাই পড়েছেন—নিজের স্কুলজীবনের বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলো তল্লাস করে দেখুন না একবার। মনে পড়ছে না এখন একজন মাস্টার মশায়ের কথা যাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধায় আজও মাথা নুয়ে আসে? ছাতা বগলে রিটায়ার্ড বৃদ্ধ ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে ফুটপাথ ধরে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর পাশে এসে থামল একটা প্রকাণ্ড গাড়ি। নেমে এলেন কালো কোটপরা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি—সায়াটিকার ব্যথা অগ্রাহ্য করে সেই জনবহুল ফুটপাথেই নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিলেন বৃদ্ধের। বললেন, ভাল আছেন স্যার?

অমলিন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত মুখ। বলেন, ন্যাপলা না? হ্যাঁরে, তুই নাকি এখন হাইকোর্টের জজ হয়েছিস?

প্রৌঢ় সলজ্জে স্বীকার করে বলেন, কেমন আছেন বলুন?

: ভাল, খু-ব ভাল! খারাপ থাকব কেন? তোরা সব জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছিস! গর্বে আমার বুকটা ফুলে ওঠে না?

এমন ঘটনা নিশ্চয় ঘটতে দেখেছেন আপনার জীবনে। তাহলে চিনতে পারবেন ডক্টর জন কণ্ডনকে। ত্রিশ বছর হেডমাস্টারি করে পেনসন নিয়েছেন। অকৃতদার একা মানুষ। পেনসনটুকুই ভরসা। বয়স তিয়াত্তর। স্বপাক আহার করেন। আর বই পড়েন। আর ঐ মাঝে মাঝে পথে-ঘাটে ছাত্রদের জড়িয়ে ধরে বলেন, ভাল, খু-ব ভাল আছি। তোরা কি আমাকে খারাপ থাকতে দিবি?

খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়েন। লিণ্ডবার্গের সব হাড়-হদ্দ তাঁর মুখস্থ। কথাটা তাঁর কানে গেল—ওঁর মতে আদর্শ মানুষ স্লিম

লিণ্ডবার্গ নাকি বাধ্য হয়ে তার পুত্রের উদ্ধারকার্যে একটি গুণ্ডাকে নিয়োগ করেছে। আদর্শে বাধল মাস্টারমশায়ের! লিণ্ডি শেষ পর্যন্ত অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবে? কেন? হোক লোকটা কিডন্যাপার—ছেলেধরা! তবু: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যে পাপ!

রাত জেগে আদর্শবাদী হেডমাস্টার মশাই একটা খোলা চিঠি লিখলেন।

পরদিন সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত কলমে প্রকাশিত হল সেটা:

"তুমি কেমনতর মানুষ হে, ছেলেধরা? কর্নেল লিণ্ডবার্গ তো তোমার চাহিদা মত পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতেই রাজী। তাহলে দেরি করছ কেন? পুলিশের ভয়ে? শোন বাপু! আমি মিছে কথা বলি না—আমার ছাত্তরদের শুধিয়ে দেখতে পার। তুমি বাচ্চাটাকে আমার কাছে পৌঁছে দাও, আমি তোমাকে টাকাটা মিটিয়ে দেব। তোমার কি ঘরে ছেলেপুলে নেই? তা সে তো আমারও নেই—তাই বলে মায়ের প্রাণটা কেমন করে তা কি বুঝতে পার না? শোন! খোলা কথা বলছি। পঞ্চাশ হাজারে যদি তোমার তৃপ্তি না হয়, তাহলে আমি না হয় আরও এক হাজার যোগ করে দেব। তুমি ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার—আমার সারা জীবনের সঞ্চয় ঐ হাজার ডলারই।"

সে চিঠি পড়ে কেউ হেসেছিল কি না জানি না, তবে ছেলেধরা ভুল করেনি। বানান ভুল করলেও মানুষ চিনতে তার ভুল হয়নি।

সংবাদপত্রে ঐ বিচিত্র খোলা চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই ডঃ কণ্ডন ডাকে একটি চিঠি পেলেন। পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হেড মাস্টারমশাই। তখনই টেলিফোন করলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গকে।

: লিণ্ডবার্গ স্পিকিং।

: শোন ভাই, তুমি আমাকে চিনবে না। আমার নাম জন কণ্ডন···

: আপনি আমার পরিচিত ডক্টর কণ্ডন। আপনার ছাত্র

কর্নেল ব্রেকিংরিজ আমার বন্ধু। আপনার খোলা চিঠিও আমি পড়েছি—

: তবে তো সুবিধেই হল। শোন, আজ ডাকে আমি একটি অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি।

: আপনি পড়ে শোনান।

: চিঠি আছে দুখানা। একটা আমাকে, একটা তোমাকে। আমাকে লিখেছে—সে আমাকে বিশ্বাস করেছে। আমি যেন টাকাটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসি। নিজের কাছে রাখি। আরও বলেছে, টাকাটা হাতে পেলে যেন 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকায় পার্সোনাল কলমে একটি বিজ্ঞাপন দিই 'মানি ইজ রেডি, (টাকা তৈরী আছে)।

: আমার চিঠিতে কি আছে ?

: Affter we have the mony in hand we will tell you where to find your boy . You may have a airplane redy it is 150 mile awy."

[টাকাটা হাতে পাওয়ার পড়ে আমরা যানাবো বাচ্ছাটাকে কোথায় পাওয়া জাবে। একটা এ্যারোপেন তৈরী রেখ। যায়গাটা ১৫০ মাইল ধূরে।]

: শুধু ঐটুকু ? চিঠিতে আর কিছু নেই ?

: আছে। একগাদা বানান ভুল, ব্যাকরণে ভুল …

: আজ্ঞে না। ওর নিচে কোনও সাঙ্কেতিক চিহ্ন নেই ?

: তাও আছে। ইউক্লিডের সেই থিয়োরেমটা—When two circles intersect…

: ঠিক আছে স্যার ! আমি এখনই যাচ্ছি আপনার কাছে—

: না, না তোমার এখন অনেক কাজ। আমিই যাচ্ছি।

উৎসাহী বৃদ্ধ নিজে গাড়ি চালিয়ে যখন লিণ্ডবার্গ ভিলায় এসে উপস্থিত হলেন রাত তখন দুটো। হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা গেল —একই লোকের চিঠি। ব্রেকিংরিজ তার মাস্টারমশাইকে সসম্ভ্রম

নমস্কার করে বললে, স্যার, আপনিই যোগাযোগের কাজটা করুন। কিন্তু আপনি ক্লান্ত, বাকি রাতটা এখানেই থেকে যান।

বৃদ্ধ বলেন, আপত্তি কি ? লিণ্ডবার্গ যখন তোমার বন্ধু, তখন সেও ছাত্রস্থানীয়। কিন্তু ঐ গুণ্ডা-টুণ্ডাকে লাগিও না তোমরা। লোকটা কিডন্যাপার, ছেলেধরা, তা হ'ক সেও তো মানুষ।

ব্রেকিংরিজ তার মাস্টারমশায়ের সেই বাঁধা লব্‌জ্‌টা ভোলেনি বিশবছরেও। বললে, তা তো বটেই : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। না, স্যার ?

খুশিতে ঝল্‌মল করে ওঠেন প্রাক্তন হেডমাস্টার মশাই। ছাত্রের হাতটা টেনে নিয়ে বলেন, ভোলনি তাহলে ? অ্যাঁ ?

পরদিন 'নিউইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকার পার্সোনাল কলমে ছাপা হল একটা সংবাদ—"MONEY IS READY-JAFSIE"। কেউ বুঝলো না তার অর্থ কি। কিন্তু ওঁরা তো জনসাধারণকে জানাতে চান না—ওঁদের লক্ষ্য একটি বিশেষ পাঠক, যে বুঝে নেবে JAFSIE হচ্ছে J. F. C অর্থাৎ জন. এফ. কণ্ডন-এর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

সেদিনই সন্ধ্যায় ডক্টর কণ্ডনের একটি টেলিফোন এল। উনি আত্মঘোষণা করতেই দূরভাষী বিকৃতকণ্ঠে বললে, আমার স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি পেয়েছেন ?

: পেয়েছি।

: ঠিক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই খবর পাবেন। পুলিশের ফাঁদ পাতার চেষ্টা করবেন না !

: আমি মিছে কথা বলি না।

: ঠিক আছে !

: খোকন কেমন আছে···হ্যালো···হ্যালো ?

ও-প্রান্তবাসী ততক্ষণে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে। ডক্টর কণ্ডন তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন লিণ্ডবার্গ ভিলায়।

: কিন্তু সে যে সেই কিডন্যাপার তার তো প্রমাণ নেই।

: আছে। লোকটা 'সিগ্‌নেচার' শব্দটা উচ্চারণ করেছিল 'সিঙ্‌নেচার'—ঠিক যে বানানে লিখেছে।

ডক্টর কণ্ডন গোয়েন্দা নন ; কিন্তু হেডমাস্টারি করেছেন আজীবন। তিনি জানেন, ভুল উচ্চারণের জন্যই ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় ভুল বানান লেখে।

১২ই মার্চ রাত সাড়ে আটটায় ডক্টর কণ্ডনের কলিংবেল বাজল। একটি ট্যাক্সি ড্রাইভার ওঁর হাতে ধরিয়ে দিল একটা মুখবন্ধ খাম। কে দিয়েছে ? তা জানে না লোকটা। অচেনা একটা লোক ওকে চিঠিখানা এবং ট্যাক্সির ভাড়া দিয়ে অনুরোধ করেছিল, এই ঠিকানায় চিঠিটা পৌঁছে দিতে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ডক্টর কণ্ডনের। এই তো। ট্যাক্সি ড্রাইভার তো টাকাটা মেরে দিয়ে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলতেও পারত। অচেনা কিডন্যাপার তো তাকে বিশ্বাস করেছে! সেও তো পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছে : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!

তাহলে তাকেই বা বিশ্বাস করা যাবে না কেন ?

চিঠিতে নির্দেশ ছিল শহরের একটি জনবিরল কবরখানার গেটে রাত সওয়া নয়টায় যেন ডক্টর কণ্ডন টাকা সমেত উপস্থিত থাকেন। কণ্ডন ফোন করে জানতে পারলেন, টাকাটা এখনও ঐভাবে ছোট ছোট নোটের বাণ্ডিলে ভাগ করে তৈরী করা হয়নি। তবু এ সুযোগ হারাতে তিনি রাজী নন।

নির্জন কবরখানার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এক বৃদ্ধ। তিয়াত্তর বছর বয়স, কিন্তু হাতে লাঠি নেই। সোজা হয়ে হাঁটছেন তিনি। নয় ফুট উঁচু কবরখানার খাড়া রেলিং। ত্রিসীমানায় মানুষজন নেই। একপায়ে-খাড়া লাইটপোস্টের আলো যেন মাতালের ঘোলাটে দৃষ্টি।

হঠাৎ রেলিং-এর ওপাশে যেন কবরখানার এক প্রেতাত্মা জেগে

উঠল। দাঁড়িয়ে পড়েন বৃদ্ধ। যেন জেলখানার কয়েদী আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ও-পাশের লোকটা এগিয়ে এল। হ্যাটটা মাথায় এমন ত্যারচা করে পরা যে মুখে ছায়া পড়েছে। মাঝারি গড়ন, বয়স কত হবে? ত্রিশের কোঠায়।

: টাকাটা সঙ্গে আছে?—টেলিফোনের সেই কণ্ঠস্বর।

: না! টাকা দিয়ে যা কিন্‌ছি তা আগে চর্মচক্ষে দেখি!

হঠাৎ কবরখানার ভিতরেই কিসের শব্দ হল। হয় খরগোশ, বা ঐ জাতীয় কোনও নিশাচর প্রাণী। লোকটা আঁৎকে ওঠে—'পুলিশ'!

লোকটা যেন খেজুর রসের কারবারী। তরতরিয়ে শিক বেয়ে উঠে গেল উপরে। লাফ দিয়ে পড়ল রাস্তায়। প্রাণপণে দিল ছুট।

দূরত্বটা দশ গজের নয়, চল্লিশ বছরের। তবু তিয়াত্তর বছরের তরুণ পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ছোট দুষ্টু ছাত্র কোনদিন ছুটে পালিয়ে ওঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। না হয়, বিশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন—তাতে কি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পিছন থেকে ধরে ফেললেন ওর কোটের কলার: কী ছেলেমানুষী করছ? কোথায় পুলিশ? শেয়াল-টেয়াল হবে!

অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় এক ঝলক দেখে নিল লোকটা। না, কোনও পুলিশ তাড়া করে আসছে না। হাঁপাচ্ছিল সে। বললে, ধরা পড়লে পাক্কা বিশ বছর। কিংবা পুড়িয়ে মারবে। বাচ্ছাটা মারা গেলে নিশ্চয়ই পুড়িয়ে মারবে, নয়?

হেডমাস্টারমশাই নিঃসন্দেহ হলেন—এ ছোকরা সত্যই ইংরাজী জানে না। আতঙ্কের এই তুঙ্গশীর্ষে উঠে ইচ্ছে ক'রে ভুল ইংরাজী বলবার মত বুদ্ধি ওর হবে না। লোকটা বলেছিল "Would I burn if the baby dead?"

ডক্টর কণ্ডুন বলেন, তুমিই যে ঠিক লোক তা আমি বুঝব কি করে?

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলে, আমিই বা প্রমাণ দেব কিকরে?

পকেট হাতড়ে দুটি সেফ্‌টিপিন বার করলেন মাস্টারমশাই। বলেন, এ দুটিকে কখনও দেখেছ? কোথায়? কি ভাবে?

: দেখেছি! কম্বলটা ঐ রকম দুটো আলপিনে আটকানো ছিল বাচ্ছার বিছানার চাদরের সঙ্গে।

বিশ্বাস হল। বলেন, কী নাম তোমার? মানে কী নামে ডাকব?

: জন!

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। সারা শহর যখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তখন দুই নিশাচর 'জন' দাঁড়িয়েছেন মুখোমুখি নির্জন রাস্তায় —ছেলে-চোর জন, আর ছেলে-মানুষকরা জন। জন দ্য কিডন্যাপার এবং জন দ্য হেডমাস্টার!

: জন! লিণ্ডবার্গের টাকা তুমি নিও না। আমার হাজার টাকা আমি নিয়ে এসেছি।

আপনার টাকা আমরা চাই না।

: আমরা? 'আমরা' মানে কি? তুমি কি একা একাই করনি?

: না। দলে আমরা পাঁচজন।

ঠিক আছে। তাদের নাম ধামের দরকার নেই। কিন্তু বাচ্ছাটাকে একবার দেখাও—

: দেখানোর কি আছে? দিয়েই তো দেব। টাকাটা জোগাড় করুন। ইতিমধ্যে আমি আরও প্রমাণ দেব।

তাই দিল সে। কদিন পরেই মাস্টারমশাই ডাকে একটি পার্সেল পেলেন তাতে চার্লস লিণ্ডবার্গ জুনিয়ারের নিকারবোকারটা ছিল। মিসেস্‌কে দেখানো হল না, কিন্তু নার্স বেটি সনাক্ত করল পোশাকটা।

এই সময়েই আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকে হঠাৎ একটা নতুন আলোকপাত ঘটল সমস্যাটায়। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন আর একজন 'জন'—জন কার্টিস্।

ভার্জিনিয়া অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক। ২২শে মার্চ, বাচ্ছাটা চুরি

যাবার বাইশ দিন পরে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসে দেখা করলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে গাড়িতে এসেছেন আরও দুজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি—রেভারেণ্ড ডবসন-পীকক, তাঁর সঙ্গে অ্যানের বাবা অ্যাম্বাসাডার মরোর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল মেক্সিকোতে; দ্বিতীয়জন রিয়ার-অ্যাডমিয়াল বারেজ, যিনি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের সময় যুদ্ধজাহাজের কমাণ্ডার—অর্থাৎ লিণ্ডিকে যিনি ইউরোপ থেকে জাহাজে করে আমেরিকায় নিয়ে আসেন সেই ১৯২৭ সালে। সোজা কথায়—জন কার্টিসের 'ক্রিডেন্সিয়েল' নিদাগ। কার্টিস্ তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা ঐ দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল; বস্তুত তাঁরা দুজনেই কার্টিস্‌কে ধরে নিয়ে এসেছেন কর্নেল লিণ্ডবার্গের কাছে। অগত্যা লিণ্ডবার্গ ও ব্রেকিংরিজকেও কাহিনীটা পুনরায় শুনতে হল:

একদিন সন্ধ্যায় জন কার্টিসের কাছে স্যাম নামে একটি লোক গোপনে এসে দেখা করে। স্যাম ভার্জিনিয়া অঞ্চলের এক নামকরা মস্তান—তার গতিবিধি, আচার-আচরণ এবং রোজগার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। স্যাম গোপনে নাকি জন কার্টিস্‌কে জানিয়েছে—যে-দল বাচ্ছাটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে স্যামের জানাশোনা আছে, তারা বাচ্ছাটাকে ফেরত দিতেই চায়; কিন্তু ঐ আদর্শবাদী হেডমাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে সেটা করতে চায় না। ভদ্রলোক বড় বেশি খাঁটি—অত খাঁটি সোনায় গহনা হয় না। এই জন্যই তারা সাড়া দিচ্ছে না। কার্টিস্ যদি মধ্যস্থতা করে তাহলে ওরা বাচ্ছাটাকে ফেরত দিয়ে টাকাটা নিয়ে যেতে পারে। কার্টিস্ প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। এতলোক থাকতে সে কেন? তার সঙ্গে লিণ্ডবার্গের পরিচয়ই নেই। বলেও সে কথা: শুধু হেডমাস্টারমশাই কেন, কর্নেল লিণ্ডবার্গ তো রস্‌নারকেও দৌত্যকাজে নিয়োগ করেছে। রস্‌নার আণ্ডার-ওয়ার্লড্-এর লোক—নিখাদ-সোনা বলে কেউ তাকে অভিযুক্ত করবে না। তার জবাবে স্যাম বলেছিল—রস্‌নার আধাআধি বখরা

চাইছে—এতটা দিতে ও পক্ষ রাজী নয়। সব শুনে কার্টিস্ নাকি স্যামকে বলেছিল, এসব নোংরা কাজের মধ্যে সে থাকতে চায় না।

রেভারেণ্ড ডবসন পীকক বললেন, আমরাই ওকে জোর করে ধরে এনেছি।

রিয়ার অ্যাডমিরাল বারেজ বলেন, ব্যাপারটা যাচাই হওয়া দরকার।

কার্টিস্ সরাসরি কর্নেলকে বলে, আমি খোলা কথার মানুষ। সত্যি কথা বলতে কি এইসব গুণ্ডা বদমাশদের ব্যাপারে আমি থাকতে চাইনি, চাই না। কিন্তু আমারও দুটি সন্তান আছে, তার একটি ঐ আপনার ছেলেরই বয়সী। তাই—

বাধা দিয়ে কর্নেল লিণ্ডবার্গ বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার কার্টিস্। আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি আমি। কিন্তু স্যাম কিছু দেবচরিত্রের লোক নয়, সে কথা আপনিই বলছেন। এ-কথা তো মানবেন যে, এখন আমার বিপদ আর মানসিক অবস্থার কথা বুঝে সবাই আমাকে ঠকাতে চাইবে। সুতরাং আপনি স্যামকে বলুন, সে প্রথমে আমাকে একটা অকাট্য প্রমাণ দিক যে, আসল গুণ্ডাদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

: কী জাতীয় প্রমাণ ?

: অনেক জাতের হতে পারে। একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি : কিডন্যাপার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞান-চিহ্ন ব্যবহার করে। স্যাম বলুক সেটা কী!

কার্টিস্ বললে, ঠিক বলেছেন। আমি নিজেও নিশ্চিন্ত থাকতে চাই। শেষে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে আমি না নিজেই বে-ইজ্জৎ হয়ে পড়ি।

খবরটা কানে গেল হেডমাস্টারমশাইয়ের। রীতিমত মর্মাহত হলেন তিনি। একটা সাধারণ গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের কাছেও

নিজেকে বিশ্বাসভাজনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। কেন? তাঁর আচরণে এমন কি ছিল যাতে সেই কিডন্যাপার আবার স্কাম-কার্টিসের মাধ্যমে নতুন দৌত্য-ব্যবস্থা করতে চায়। রসনার আধাআধি বখরা চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তো উল্টে আরও হাজার ডলার সেই লোকটাকে দিতে চেয়েছিলেন—তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। তাহলে?

মরিয়া হয়ে ডক্টর জন কণ্ডন আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন: আমাকে এভাবে বে-ইজ্জৎ করছ কেন? টাকা তো তৈরী। বল, কেমন করে তোমাকে দেব?

আরও তিনটা দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায়। চতুর্থ দিনে আবার এল 'জন'এর চিঠি: মিস্টার লিণ্ডবার্গই তো নানান জাতের কুকুর আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন। তাই যোগাযোগ করছি না। বাচ্চাটা ভালই আছে। if he keeps on waiting we will double ouer amount [সে যদি আরও দেরি করতে চায় করুক, আমড়া তাহলে দাবীর অঙ্কটা ডবল্ করে দেব]

Our (আমরা) শব্দটাকে সে লিখেছে ouer (আমড়া)।

ডক্টর কণ্ডন তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করলেন লিণ্ডবার্গের সঙ্গে। পরামর্শ করে ওঁরা আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিলেন—ছেলে-ধরার সব সর্ত মেনে নেওয়া হচ্ছে। সে যেন টাকা নিয়ে বাচ্চাটাকে ফেরত দেয়। কীভাবে টাকাটা দেওয়া যাবে সে যেন জানায়। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল বৃহস্পতিবার, ৩১শে মার্চ—অর্থাৎ বাচ্চাটা চুরি যাওয়ার একমাস পরে।

অবিলম্বে সাড়া দিল সেই অজ্ঞাত মানুষটি। নানান নিপুণ কায়দায়। যাতে তার পদচিহ্ন রেখা ধরে পুলিশ না ফাঁদ পাততে পারে। রীতিমত গোয়েন্দা গল্পের ঢঙে। সেই নির্দেশ অনুসারে ২রা এপ্রিল রাত আটটা নাগাদ ডক্টর কণ্ডন টাকা নিয়ে রওনা দিলেন। গাড়িতে মাত্র দুজন যাত্রী। ড্রাইভার কর্নেল লিণ্ডবার্গ

স্বয়ং এবং পিছনের সীটে একমাত্র আরোহী ডক্টর কগুন। না, গাড়িতে আরও কিছু আছে। দুটি প্যাকেট—একটাতে পঞ্চাশ-হাজার ডলার, অপরটাতে বিশ হাজার। লোকটা প্রথমে চেয়েছিল পঞ্চাশ, পরে সত্তর। লিণ্ডবার্গ আজ কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন।

নির্দেশ অনুযায়ী ওঁদের প্রথমে যেতে হল একটি ফুলের দোকানে। সেখানে যেতেই যে মেয়েটি ফুল বিক্রি করছিল সে এগিয়ে এসে বললে : ডক্টর কগুন?

: হ্যাঁ।

: আপনার একটি চিঠি আছে—মেয়েটি বাড়িয়ে ধরে একটি মুখবন্ধ খাম।

: কে দিয়েছে তোমাকে এ চিঠি?

: ঘণ্টাখানেক আগে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার এই খামটা রেখে গেল। বললে, রাত আটটার সময় ডক্টর কগুন এলে এ চিঠিটা তাঁকে দিতে।

: তুমি আমাকে চেন?

: না তো! তবে আপনার বর্ণনা লোকটা দিয়েছিল।

সেই চিঠির নির্দেশ : Follow Whittemore Ave to the soud. Take money with you and come alone [হুইটমোর অ্যাভিনু ধরে 'দকৃখিন' দিকে যাও। টাকাটা সঙ্গে রেখ আর একা এস] হেডমাস্টারমশায়ের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল—তাঁর ছাত্র south (দক্ষিণ)কে soud (দকৃখিন) লিখেছে বটে কিন্তু গতবারের মত money (টাকা) বানানটা mony (ট্যাকা) লেখেনি। এ ছাত্র ইংরাজীতে পাস করবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না!

আবার এক কবরখানা। জনমানবহীন। রাত সাড়ে আটটায় কবরখানার বাইরে গাড়িটা পার্ক করা হল। ডক্টর কগুন বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আমি খুঁজে দেখি।

: টাকার বাণ্ডিল দুটো?

: আপাতত গাড়িতেই থাক। আমি বুড়ো মানুষ, শেষে চোরের উপর বাটপাড়ি করে কেউ না ছিন্তাই করে!

কবরখানার বড় লোহার গেট বন্ধ; কিন্তু পাশে একটা পার্কে ঢোকার গবাদি-পশুর-পথরোধী ছোট গেট। কণ্ডন আলো-আঁধারী কবরখানায় ঢুকে পড়লেন। বেশি দূর যেতে হল না। একটা এল্‌ম্ গাছের আড়াল থেকে জেগে উঠ্‌ল এক প্রেতাত্মা। কবরগুলো মাড়িয়ে (ছি ছি! লোকটার কোনও সম্ভ্রমজ্ঞান নেই! ঐ কবরের তলায় শুয়ে আছেন যাঁরা তাঁদের গায়ে এভাবে জুতো ঠুকতে হয়?) এগিয়ে এল লোকটা। হ্যাঁ, সেই জনই ' Did you got it, the money ?' [টাকাটা এনেছিলে ?]

নাঃ! ছেলেটা ইংরাজীতে ফেলই মারবে। হেডমাস্টারমশাই শুধু বললেন, না! সেটা গাড়িতে আছে।

: তাহলে নিয়ে এস?

: বাচ্ছাটা কই?

: এই শীতের মধ্যে তাকে এখানে আনা যায়? আমি একটা চিঠিতে লিখে এনেছি সে কোথায় আছে। টাকাটা দিলেই খামটা তোমাকে দেব।—একটা মুখবন্ধ খাম সে দেখায়।

কণ্ডন বললেন, শোন বাপু জন, লিণ্ডবার্গ যত বড়লোক বলে তুমি ভাবছ অত বড়লোক সে নয়। আমরা পঞ্চাশ হাজার ডলারই এনেছি তোমার প্রথম চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী। এর বেশি আমরা পারব না।

লোকটা কি ভাবছে। কণ্ডন যোগ করেন, দুটো কথা ভেবে দেখ। প্রথম কথা, পঞ্চাশ সে খুশি মনে দিচ্ছে। আমরা কথা দিচ্ছি এ নিয়ে পুলিশ তোমার পিছনে লাগবে না। বেশি দরাদরি করলে সুতো ছিঁড়ে যাবে। লিণ্ডবার্গকে যদি তুমি বাধ্য কর আরও বিশ হাজার ধার করতে তাহলে বাচ্ছাটা পাওয়ার পর সে হয়তো প্রতিশোধ নিতে পুলিশে সব খবর জানাবে। দ্বিতীয় কথা—

: ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ঐ পঞ্চাশ হাজারেই রাজী!

ডক্টর কণ্ডন তখন ফিরে গেলেন গাড়িতে। জনের সঙ্গে তাঁর কী কথোপকথন হয়েছে লিণ্ডবার্গকে বললেন। কর্নেল সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালো ডক্টর কণ্ডনকে। বৃদ্ধ বিচিত্র হাসলেন। বললেন, প্লাস কর্নেল! এজন্য ধন্যবাদ দিও না! বরং তিরস্কার কর আমাকে!

: কী বলছেন! বিশ হাজার ডলার বাঁচিয়ে দিলেন আমার ·

হেডমাস্টারমশাই ম্লান হেসে বললেন, এই তিয়াত্তর বছর বয়সে আজই যে আমি জীবনে প্রথম মিছে কথা বললাম! তিরস্কারই কি প্রাপ্য নয় আমার?

কর্নেল লিণ্ডবার্গ জবাব দিতে পারলেন না। দেখতে থাকেন, পঞ্চাশ-হাজার ডলারের প্যাকেটটা নিয়ে আধো অন্ধকারে বৃদ্ধ এগিয়ে যাচ্ছেন কবরখানার দিকে। ক্লান্ত বৃদ্ধ। যেন এখনই ঐ উইলো গাছের নিচে অন্তিম শয়ানে শুয়ে পড়বেন। যেন লিণ্ডবার্গকেই তারপর খাটাতে হবে তাঁর শিয়রে এক প্রস্তর ফলক, Here lies Dr. John Condon who lied but once [এখানে শুয়ে আছেন ডক্টর কণ্ডন, তাঁর খণ্ডমুহূর্তের 'ইতিগজ' সমেত]।

কবরখানার একদিকে ল্যাম্পপোস্টের আলো, অপর দিকে ঘন অন্ধকার। যেন এ-প্রান্তে জীবন ও প্রান্তে মৃত্যু। সেই আলো-আঁধারের সীমান্তে দুই 'জন' দাঁড়ালেন মুখোমুখি। বিনিময় হল পণ্য। খামটা ওঁর হাতে দিয়ে সেই অন্ধকারের জীবটা বললে, কথা দিন, আপনি বা লিণ্ডবার্গ ছয় ঘণ্টার আগে খামটা খুলবেন না।

: কেন?—কণ্ডন বিস্মিত।

: বাঃ! আমাকে পালিয়ে যাবার সুযোগটা তো দেবেন?

: ও! আমার খেয়াল ছিল না। বেশ কথা দিলাম।

: গুড নাইট!—লোকটা করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন হেডমাস্টারমশাই। পর মুহূর্তেই

সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে গ্রহণ করলেন ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাত। মিথ্যাই যখন বলতে পেরেছেন, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করতে পেরেছেন তখন আর দ্বিধা কি? ওর হাতটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, ঈশ্বর তোমাকে সুমতি দিন!

সব কথা শুনে লিণ্ডবার্গ বললেন, আপনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন এ খাম এখন খুলতে পারি না। এখন রাত পৌনে নয়টা। রাত পৌনে তিনটায় খুলব খামটা। তখন জানা যাবে, খোকন কোথায় আছে।

ওঁরা ফিরে এলেন লিণ্ডবার্গ ভিলায়। হোপ ওয়েল। হোপ-ওয়েল—ভালো আশা! এখন একটু একটু আশা জাগছে। আর মাত্র ঘণ্টা ছয়েক। বাড়ির বাইরের-ঘরে আলো জ্বলছে। সেখানে অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে ওরা, কর্নেল ব্রেকিংরিজ, আর অ্যান। অসীম উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করছে নার্স বেটি, ভায়োলেট, বাটলার অলিভার, কেয়ারটেকার এল্‌সি। সারা বাড়িতেই আলো জ্বলছে একমাত্র ঐ নার্সারি বাদে। পয়লা মার্চের পর ঐ ঘরে আর ইলেকট্রিক বাতি জ্বালা হয়নি। সেখানে সন্ধ্যাবেলায় একটা মোমবাতি জ্বেলে রেখে আসে বেটি অথবা ভায়োলেট।

গাড়িটা এসে থামতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন কর্নেল ব্রেকিংরিজ : কী হল?

: বল্‌ছি। অ্যান কোথায়?

: ঐ তো!

কে বলবে এই সেই মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গ! এক মাসে সে যেন আধখানা হয়ে গেছে। বিষাদের প্রতিমূর্তি। মৃত্যুকে তবু সহ্য করা যায়—মৃত্যু একটা অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু অনিশ্চয়তা? সে যে প্রাণ খুলে কাঁদতেও দেয় না—ছেলের অমঙ্গল হবে না! সহানুভূতি আর সান্ত্বনার হাত এড়াতে অ্যান দিবারাত লুকিয়ে থাকে। রুদ্ধদ্বার কক্ষের ও-প্রান্তে। নিজের শয়নকক্ষে। এই এক মাসের ভিতর

মোমবাতিজ্বলা পাশের ঘরটাতে সে একবারও ঢোকেনি। আজ কিন্তু সে বাইরে এসেছে। বসে আছে বৈঠকখানায়।

ওঁরা দুজন ঘরে ঢুকতেই অ্যান চোখ তুলে তাকালো। বর্ষার আকাশে যেন হঠাৎ উঁকি-মারা এক ঝলক চাঁদের আলো। সে-চোখে শুধু নীরব জিজ্ঞাসা। কর্নেল লিণ্ডবার্গ প্রথমেই সংক্ষেপে বলেন, খবর ভালই অ্যান। খোকন কোথায় আছে তা জানা গেছে।

চাঁদের আলো নয়, বিদ্যুতের ঝিলিক। উৎসাহে সোজা হয়ে ওঠে অ্যান : কোথায়?

আদ্যোপান্ত সমস্তটা খুলে বলেন লিণ্ডবার্গ। ব্রেকিংরিজ আর অ্যান সাগ্রহে শুনতে থাকে। বেটি আর ভায়োলেটও কৌতূহল দমন করতে পারেনি—এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। শুধু বৃদ্ধ ডক্টর কণ্ডন করলগ্নকপোলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন।

নৈশ অভিযানের আদ্যন্ত বিবরণ পেশ করে কর্নেল মুখবন্ধ খামটা টেবিলের উপর রাখলেন। ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, রাত পৌনে তিনটেয় জানা যাবে—খোকন কোথায়?

অ্যান আবার প্রস্তরমূর্তি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে খামটার দিকে।

কর্নেল ব্রেকিংরিজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, মাস্টারমশাই যখন কথা দিয়েছেন তখন আর উপায় কি? আরও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠেন ডক্টর কণ্ডন : তুমি কি চিরটা কাল গবেটই রয়ে গেলে ডিক্?

চমকে ওঠেন কর্নেল ব্রেকিংরিজ। ডক্টর কণ্ডনের ছাত্র তিনি। আজ না হয় কর্নেল হয়েছেন, একদিন ওঁরই ক্লাসে ধমক-ধামক খেয়ে মানুষ হয়েছেন। সসঙ্কোচে বলেন, কেন স্যার?

: এখনও 'কেন স্যার?' আমি 'কী' কথা দিয়েছি লোকটাকে? আমি বা লিণ্ডি খামটা খুলব না ছয় ঘণ্টার আগে। খামটা

বেওয়ারিশ পড়ে আছে টেবিলে! তোমরা আর কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

তা বটে!—ব্রেকিংরিজ হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

তার প্রসারিত হাতটা চেপে ধরেন বৃদ্ধ: না! তুমি নও! তোমার কী অধিকার?

তাহলে?—আবার সব গুলিয়ে যায় কর্নেল ব্রেকিংরিজের!

এবার বৃদ্ধ অহেতুক ধমকে ওঠেন অ্যানকে: তুমি কেমনতর 'মা' হে, অ্যান? তুমি জান না—মাতৃস্নেহ এমন একটা স্বর্গীয় জিনিস যা এই সব কিডন্যাপিং, র‍্যানসম মানির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে? এ ঘরে একমাত্র তোমারই তো অধিকার আছে ঐ খামটা খুলে পড়ার! আমাদের মত চোর জোচ্চোর মিথ্যাবাদীর ক্ষমতা কি যে তোমাকে বাধা দিই! তুমি না—'মা'?

চোখ দুটো জলে ভরে আসে অ্যানের। ছোঁ মেরে তুলে নেয় খামটা।

The boy is in boad Nelly. It is a small 28 ft long. You will find the boad between Horsenecks Beach and Gay Head near Elizabeth Island.

[বাচ্ছাটা আছে একটা নৈকায়। নাম 'নেলী'। নৈকাটা ছোট. ২৮ ফুট লম্বা। হর্সনেক্‌স্ বীচ আর গে-হেডের মাঝামাঝি এলিজাবেথ দ্বীপের কাছে নৈকাটা ভাসছে]

লোকটা তিন-তিনবার boat (নৌকা)-কে boad (নৈকা) লিখেছে অথচ শক্ত বানান island (দ্বীপ) লিখেছে নির্ভুল। আশ্চর্য!

॥ তের ॥

তৎক্ষণাৎ ওঁরা তিনজনে রওনা হয়ে পড়লেন—ব্রেকিংরিজ, লিণ্ডবার্গ আর ডক্টর কণ্ডন। রাত তখন দুটো। লিণ্ডবার্গ স্টিয়ারিঙে। এক ঘণ্টার পথ আধঘণ্টায় অতিক্রম করে ওঁরা এসে পৌছালেন কনেক্টিকটে, ব্রিজপোর্ট এয়ারপোর্টে। একটি অ্যামফিবিয়ান প্লেন ভাড়া করলেন লিণ্ডবার্গ। শুরু হল অন্বেষণ-সূর্য তখন পূর্ব আকাশ আবীর ছড়াচ্ছে।

এলিজাবেথ দ্বীপপুঞ্জের মৎস্যজীবীর দল সারা দিনে বারে বারে আকাশ-পানে তাকিয়েছে—ঐ প্লেনের পাইলট কি আকণ্ঠ মদ গিলে মাতাল? পূবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল, তবু একই জায়গায় ক্রমাগত পাক খেয়ে মরছে কেন? কোথায় যেতে চায় প্লেনটা? ওদিকে হর্সনেকস্ বীচ এদিকে গে-হেড—এইটুকু তো দূরত্ব—সারা দিনে নাহক পাঁচ'শ বার পাক খেল প্লেনটা! মাঝে মাঝে সমুদ্রের এত কাছে নেমে আসছে যে, ভয় হয় কোন নৌকার মাস্তুলে ধাক্কা খাবে! বাহাদুর পাইলট! ধাক্কা কিন্তু লাগছে না! কিছু খুঁজছে নিশ্চয়! কী?

হ্যাঁ খুঁজছে। প্লেনটা সমুদ্রে নামল। ছোট নৌকা বেয়ে ওরা এল মৎসজীবী সমবায় অফিসে! একজন বৃদ্ধ, দুজন মধ্যবয়সী লোক। খোঁজ নিল 'নেলী' নামে নৌকার মালিক কে? 'নেলী'? ও নামের কোন নৌকাই নেই। বুড়ো মাঝিটা মাথা চুলকে স্মরণ করবার চেষ্টা করল। না! 'নেলী' নামের কোন নৌকা তো এ দিগড়ে কখনও দেখা যায়নি।

সমস্ত দিন ব্যর্থ অন্বেষণ করে ক্লান্ত খিন্ন তিনটি প্রাণী ফিরে চললেন লিণ্ডবার্গ ভিলায়।

বেচারী অ্যান! সে বিশ্বাস করেছিল, খোকনকে নিয়ে তার বাপ আজ ফিরে আসবে। শুধু ও একা নয়, বাড়িশুদ্ধ সবাই। ভায়োলেট তাই আজ একমাস পরে নার্সারি ঘরটা ধোওয়া মোছা করেছে। নার্স বেটি খোকনের পুতুলগুলো সব আলমারি থেকে বার করে সাজিয়েছে টেবিলে। বাটলার অলিভার আপন খেয়ালে বাজার থেকে কিনে এনেছে একরাশ বেলুন। দড়ি দিয়ে সেগুলো নার্সারি ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছে। পাচক এল্‌সিও বসে নেই—জবর খানার আয়োজন করছে সে। আজ রাত্রে খানাপিনাটা খানদানী হওয়া চাই—সেই খোকনের প্রথম জন্মদিনের মত। আজ তো নবজন্মই হবে তার—নতুন করে জন্মাবে।

বিকেলবেলা একটা প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া নিয়ে মিসেস্ লিণ্ডবার্গের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল ভায়োলেট। অ্যান উদাসীনভাবে বসে ছিল একটা সোফায়। সলজ্জে এগিয়ে এসে ভায়োলেট বললে, ম্যাডাম! এই তোড়াটা এঘরে রাখব?

আজ একমাস ফুলদানিগুলোয় কেউ ফুল সাজায়নি। ওদের কেউ বারণও করেনি অবশ্য। তবু এই অলিখিত আইনটা ভাঙার আগে ভায়োলেট গৃহকর্ত্রীর অনুমতি চাইতে এসেছে। অ্যান দেখছে সকাল থেকেই সারা বাড়ির লোকজন চঞ্চল হয়ে আছে। অলিভার যখন বেলুন টাঙাচ্ছিল তখনও লক্ষ্য হয়েছিল অ্যানের। তখন সে কিছু বলেনি। এখন চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, না ভায়োলেট। এ-ঘরে নয়, নার্সারিতে।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভায়োলেটের। ফিরে যাবার জন্যে সে পা বাড়ায়।

: থাক। ওটা আমার হাতেই দাও!

ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে অ্যান প্রবেশ করে পাশের ঘরে। সেখানে তখনও বেলুন আর কাগজের শিকল টাঙাতে ব্যস্ত ছিল বেটি আর অলিভার। তারা অবাক হল। গৃহকর্ত্রী আজ একমাস পরে

এই প্রথম ঢুকলেন এ ঘরে। সসম্ভ্রমে তারা সরে দাঁড়ায়। অ্যান এগিয়ে এসে ফুলদানিতে তোড়াটা বসিয়ে দেয়!

গাড়িটা যখন পোর্টিকোর নিচে এসে থামল তখন লিণ্ডবার্গের মনে হল তিনি বুঝি কোন গ্র্যাণ্ড পার্টিতে যোগ দিতে এসেছেন। সারা বাড়িটা আলো ঝলমল। দরজা খুলে নেমে এলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গ। যেন গার্ড অফ্ অনার দিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অলিভার-ব্যাঙ্কস্-ভায়োলেট-এল্‌সি-বেটি—হ্যাঁ সবার পিছনে আরও কে একজন। মাথাটা তুলতে পারলেন না কর্নেল। ধীরপদে এগিয়ে গেলেন ওদের মাঝখান দিয়ে। চোখাচোখি হল সারিবাঁধা মানুষজনের শেষ ব্যক্তিটির সঙ্গে। কর্নেল অস্ফুটে শুধু বললেন, আ'য়াম সরি!

সরি! সরি মানে কি?

না! জবাবদিহি এখনও বাকি আছে। হাতটা টেনে নিলেন অ্যানের। বললেন, হতাশ হয়ো না। আজ খুঁজে পাইনি বটে। তবে পাবই! কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে!

পরদিন আবার কাগজে প্রকাশিত হল একটি বৃদ্ধ-হৃদয়ের আর্ত জিজ্ঞাসা: তুমি কেমনতর মানুষ হে? তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করলে? তবে কেন খুঁজে পেলুম না? জানাও—জেফ্‌সি!

তেশরা-চৌঠা-পাঁচই। তিন দিন কেটে গেল। কবরখানার সেই প্রেতাত্মা সাড়া দিল না। বাধ্য হয়ে কর্নেল লিণ্ডবার্গ এলেন থানায়। বললেন, এবার আপনারা দেখুন!

নিউ জার্সি স্টেট পুলিশের প্রধান কর্নেল নর্মাল Schwarzkopf (ওঁর উপাধিটা বাঙলা হরফে কি-ভাবে লিখতে হবে জানি না) বললেন, আপনি বারণ করেছিলেন, কিন্তু আমরা জানতাম একদিন না একদিন আপনাকে আমাদের কাছে ফিরে আসতেই হবে। তাই আপনাকে না জানিয়ে কিছু কিছু সাবধানতা আমরা নিয়েছি।

: কী? —লিণ্ডবার্গ কৌতূহলী।

: ট্রেজারী থেকে আপনি যে পঞ্চাশ-হাজার ডলার পেয়েছেন তার প্রতিটি নোটের নম্বর আমরা টুকে রেখেছি। বস্তুত প্রতিটি ব্যাঙ্ককে জানানো হয়েছে ঐ নম্বরী নোট জমা পড়লেই আমাদের খবর দিতে। ভয় নেই আপনার—নোটের নম্বরের সঙ্গে যে লিণ্ডবার্গ-কেস-এর কোনও যোগাযোগ আছে একথা আমরা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিনি।

ওঁরা না করলে কি হয়। বুদ্ধিমান প্রেস-রিপোর্টারের দল দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেলল। নির্দেশটা আসছে নিউ-জার্সি পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। দ্বিতীয়ত অঙ্কটার যোগফল পঞ্চাশ হাজার ডলার। বাস্। এক উর্বর-মস্তিষ্ক ফ্রি লান্সার কাগজে এক প্রবন্ধ ছাপিয়ে দিলেন—কী কায়দায় লিণ্ডবার্গ শিশুর কিডন্যাপারকে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছিল কর্নেল লিণ্ডবার্গের। বাধ্য হয়ে তিনি ৯ই এপ্রিল একটি বিবৃতি দিলেন : ছেলেধরা যে টাকা চেয়েছিল তার পাই পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ও-পক্ষ সর্ত মেনে শিশুটিকে প্রত্যর্পণ করেনি। তারা যোগাযোগও করছে না। অবিলম্বে তারা যদি পুনরায় যোগাযোগ না-করে তখন বাচ্চাটার খবরের জন্য আমাকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতেই হবে।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। কোনও খবর নেই।

নিরুপায়ভাবে কর্নেল যোগাযোগ স্থাপন করলেন কার্টিসের সঙ্গে। কার্টিস্ কি এর মধ্যে কিছু খবর পেয়েছে? তা পেয়েছে। লিণ্ডবার্গ অন্য পথে চলছিলেন বলে এতদিন সে নীরব ছিল। এখন জিজ্ঞাসিত হয়ে বলল—ইতিমধ্যে স্যাম তাকে নিউআর্কের এক নির্জন বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দুজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কার্টিসের পরিচয় হয়। একজন হচ্ছে মাঝি-শ্রেণীর লোক। তার নৌকাটার নাম 'নেলী'। দ্বিতীয় জনের নাম জন—তার চেহারা হুবহু

ডক্টর কগুনের বর্ণনা অনুযায়ী। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য কার্টিস্ বলে, তোমরাই যে আসল লোক, তা বুঝব কেমন করে?

জন তখন তার পকেট থেকে এক বাণ্ডিল নোট বার করে বলে, নম্বরগুলো টুকে রাখ। বাড়ি যাও। মিলিয়ে দেখ। তারপর কথা বলতে এস।

নম্বরেব লিস্টটা কার্টিস্ বার করে দেখায়। থানায়-রাখা লিস্টে প্রতিটি নম্বরী নোটই পাওয়া গেল। কর্নেল লিণ্ডবার্গ আবার আশার আলোক দেখলেন। কার্টিস্-এব হাতে বিশ হাজার ডলার গুঁজে দিয়ে বললেন, প্লিজ স্যাব, ডু সামথিং। আমার স্ত্রীর দিকে আর চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না।

ইতিহাস দীর্ঘ করে লাভ নেই। গোটা এপ্রিল আর মে মাসে কর্নেল লিণ্ডবার্গ দশ-বারো বার বেরিয়েছেন তাঁর বাচ্চার খোঁজে। প্রতিবারই কার্টিসের সঙ্গে। প্রতিবারই কার্টিস্ বলছে, এবার ঠিক খবর পাওয়া গেছে! কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ও-পক্ষ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছে। শেষ-বেশ কার্টিস্ এসে জানালো, ওরা বলছে সর্ত ছিল সত্তর হাজার ডলারের, উনি পঞ্চাশ দিয়েছেন, বাকি বিশ হাজার দিলেই বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

: বিশ তো তোমাকে আমি সেদিন দিয়েছি কার্টিস্?

: সে তো হাত-খরচা কর্নেল!

লিণ্ডবার্গ বলেন, লুক হিয়ার কার্টিস্। বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে এটা প্রমাণ না পেলে আমি এক কপর্দকও ব্যয় করব না।

: কিন্তু সেটা কী ভাবে সম্ভব?

: অনেকভাবে হতে পারে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তুমি স্বচক্ষে দেখে এসে বল। তুমি তো দু-পক্ষের লোক। অন্তত বাচ্চাটার একটা ফটো এনে দেখাও?

: ঠিক আছে! আমি ওদের বলব।

লিণ্ডবার্গ এই নতুন পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করতে কর্নেল

ব্রিকেনরিজ-এর বাড়িতে এলেন। ওঁর বাড়িতে এসে দেখেন—কর্নেল ব্রিকেনরিজ মনমরা হয়ে বসে আছেন।

: কী ব্যাপার? তুমি কিছু খবর পেলে নাকি?

: খোকনের বিষয়ে? না! কিন্তু স্লিম, তোমার সঙ্গে কি ইতিমধ্যে ডক্টর কণ্ডনের দেখা হয়েছে?

: না তো। কেন?

: আজ তাঁকে রাস্তায় দেখেছি! অদ্ভুত! উনি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন!

: তাই নাকি! কেন?

কর্নেল ব্রিকেনরিজ জনবহুল রাস্তা দিয়ে একা ড্রাইভ করে আসছিলেন। হঠাৎ নজর হল ফুটপাথ দিয়ে একজন বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছেন। অনেকটা ডক্টর জন কণ্ডনের মত দেখতে। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই নন—কারণ বৃদ্ধ বেশ কুঁজো হয়ে হাঁটছিলেন; তাছাড়া তাঁর হাতে ছিল লাঠি! হেডমাস্টারমশাইকে কখনও লাঠি হাতে ঠুক্ ঠুক্ করে যেতে দেখেননি। তাই বৃদ্ধকে অতিক্রম করে এগিয়ে যান কর্নেল ব্রিকেনরিজ। পরমুহূর্তেই ভিয়ু-ফাইণ্ডারে দেখতে পেলেন—না! ঐ বৃদ্ধ সেই মাস্টারমশাই। কর্নেল বলতে থাকেন—

গাড়িটা পার্ক করে নেমে এলাম। ওঁর কাছে এসে বলি, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন স্যার!

: কে? কে বাবা তুমি?

অবাক হয়ে বলি, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ব্রিকেনরিজ, ··ব্রিকেনরিজ, মানে ডিক!

: এক্সকিউজ মি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না! কোথায় আপনাকে দেখেছি কর্নেল! বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি আমার ছাত্র ছিলেন?

: কী আশ্চর্য! আজ্ঞে হ্যাঁ!

: কী আনন্দের কথা! আমার ছাত্র কর্নেল হয়েছে!

অভ্যস্ত বুলি আউড়ে যাচ্ছেন। মুখে আনন্দের আভা ফুটে ওঠেনি আদৌ। তাই বলি, আপনার কী হয়েছে বলুন তো? কিছু কি খোয়া গেছে?

: হ্যাঁ বাবা! বুড়ো মানুষ—কোথায় কি রাখি! একদম খেয়াল থাকে না!

এতক্ষণে খেয়াল হল—সেজন্যই উনি কুঁজো হয়ে হাঁটছিলেন। বোধহয় কিছু খুঁজছিলেন রাস্তায়। বোধকরি মানিবাগটাই খোয়া গেছে পথে। তাই প্রশ্ন করি, কী হারিয়েছে? আপনার পার্স?

: না, না। মানিব্যাগ নয়·

: তাহলে?

সোজা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, একটা ম্যাক্সিম! এই তিয়াত্তর বছর ধরে সেটা ছিল আমার পকেটে। হঠাৎ হারিয়ে গেল। একটা বিশ্বাস: মানুষেব উপর বিশ্বাস হারানো পাপ!

নিরুপায় লিণ্ডবার্গ আবার ব্যাঙ্ক থেকে বিশ-হাজার ডলার তুললেন।

কিন্তু টাকাটা তাঁকে খরচ করতে হয়নি।

সেদিনই সন্ধ্যায় একটা পুলিস-ভ্যান এসে থামল বাড়িতে। ইন্সপেক্টর হ্যারী ওয়াল্‌স্। মাথা থেকে টুপিটা খুলে বললে, কর্নেল! একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে।

: কোথায়?

: থানায়। একটা জিনিস সনাক্ত করতে হবে!

: কী জিনিস?—আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্নেল।

ইন্সপেক্টর ইতস্তত করছে।

: আমার সব সহ্য হবে ইন্সপেক্টর! বলুন আপনি?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, বল্‌তে তো হবেই!

ঘণ্টাখানেক আগে লিণ্ডবার্গ ভিলার অনতিদূরে একটা গর্ত থেকে

শেয়ালে-খাওয়া একটি শিশুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। বছর দুয়েকের বাচ্ছা!

বজ্রমুষ্টিতে টেবিলের দুটি প্রান্ত ধরে নীরবে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন লিণ্ডবার্গ। তারপর মাথা নিচু করেই বললেন, কঙ্কাল?

: আজ্ঞে হ্যাঁ!

: ওর ডান পায়ের অনামিকা ও কনিষ্ঠার হাড় দুটো কি জোড়া?

: তা লক্ষ্য করিনি আমি। চার্লস অগস্টাস জুনিয়ারের কি তাই ছিল?

মাথা তুললেন লিণ্ডবার্গ। বললেন, চলুন। আমি প্রস্তুত। আমি নিজেই সনাক্ত করব।

থানার সামনে রীতিমত একটা জনতা। খবরটা রটে গেছে। ক্যামেরাধারী সাংবাদিকের দল যথারীতি হাজির। এ অবস্থার ছবি একটা দুর্লভ সঙ্কলন সাংবাদিক জগতে—লিণ্ডবার্গ মাথায় হ্যাট না দিয়ে পথে নেমেছে। তার কোটের বোতাম উল্টো ঘরে লাগানো। সে দাড়ি কামাতে ভুলেছে আজ।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় লিণ্ডি!

সামনের ঘরটাও লোকে লোকারণ্য। ভ্রূক্ষেপ হল না চার্লস লিণ্ডবার্গের। ঝুঁকে পড়ল সে টেবিলের উপর। ইন্সপেক্টর ওয়াল্‌স্‌ সরিয়ে দিল উপরের চাদরটা। একটা মানবশিশুর কঙ্কাল। না! কঙ্কাল নয়। নিম্নাঙ্গের অস্থি মাংসচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু মুখে অনেকটা মাংস লেগে আছে! একটা চোখ আছে, দ্বিতীয়টা বোধহয় কোনও পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে! লিণ্ডবার্গ টেনে নিলেন বাচ্ছার ডান-পাখানি। কী যেন দেখে মুখটা তুললেন। মাথাটা নাড়লেন। যার ভাবার্থ, ইয়েস্‌!

ফ্ল্যাস্‌! ফ্ল্যাস্‌! ফ্ল্যাস্‌!

পাঁচ-সাতটা ক্যামেরার ফ্ল্যাস্‌-বাল্‌ব ঝল্‌সে ওঠে। দুর্লভ মুহূর্তের স্মৃতি। অতলান্তিক বিজয়ী স্লিম্‌ লিণ্ডবার্গ অতলান্তিক শোকসাগরে

ডুবে মরছে! এ ছবির যে লাখো টাকা দাম! হে মহামহিম মার্কিন সংবাদদাতা! তোমাদের কীর্তিকে লাখো সেলাম! ঐ চোখ খুব্লানো বাচ্ছাটার ক্লোস-আপও নিয়েছ তো? কাগজে সেটা ছাপবে না?

ডক্টর জন কণ্ডন নামে এক বৃদ্ধ বোধকরি তখনও নিউআর্কের পথে পথে কী যেন খুঁজে ফিরছেন। তিয়াত্তর বছর ধরে কী একটা অমূল্য সম্পদ ছিল তাঁর বুক পকেটে। হঠাৎ খোয়া গেছে সেটা!

॥ চৌদ্দ ॥

স্বীকার করি এ অধ্যায়টা চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গের জীবনীর সঙ্গে ঠিক অঙ্গাঙ্গী নয়। কিন্তু তবু তা আমাকে লিখতে হবে। দুটি কারণে। প্রথম : চার্লস্ লিণ্ডবার্গ তাঁর আশপাশের মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এ অধ্যায়ে তার আভাস আছে—দুই : মার্কিন মুলুকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলাম মার্কিন মুলুক তারই জবাব দিয়েছে। সে-দেশে শুধু জন দ্য কিডন্যাপার, জন কার্টিস্ আর নির্লজ্জ সাংবাদিক ছাড়াও মানুষ আছে। আছে জেমস্ কিন্‌'এর মত গোয়েন্দা, আর্থার কোলারের মত বৈজ্ঞানিক, ডক্টর শোয়েনফেল্ড-এর মত মনস্তাত্ত্বিক! সে কথা লিপিবদ্ধ না করা আমার অন্যায় হবে।

লিণ্ডবার্গ-রহস্যে তিনজন 'জন' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন। তার মধ্যে জন কণ্ডন তো পথে পথে ঘুরছেন, মানুষজন চিনতে পারেন না। কিডন্যাপার জন জনারণ্যে হারিয়ে গেছে, কোনও পদচিহ্ন না রেখে। তৃতীয়জন জন কার্টিস্ এখন জেল খাটছে, প্রতারণার দায়ে। সে আদ্যন্ত মিছে কথা বলেছিল!

যে কারণে কর্নেল লিণ্ডবার্গ পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেননি সে কারণটা আর নেই। এখন পুলিশ তার কর্তব্য করলে আর আপত্তি করবেন না লিণ্ডি। বরং তিনি চান—সেই প্রতারকের আইনানুগ শাস্তি হক। তাঁর যা গেছে তা ফিরবে না, কিন্তু মার্কিন নাগরিক হিসাবে তিনি আইনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুরু হল পুলিশের জেরা।

ত্রিশজন নিউ জার্সি পুলিশ গোয়েন্দা ঝাঁপিয়ে পড়ল। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। তা হক, ওরা প্রত্যেকটি 'ক্লু' খুঁটিয়ে দেখবে। নিউ জার্সি গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা এ-কাজ বাইরের নয়, ভিতরের।

কিডন্যাপার জন কেমন করে জানল যে, সেই ১লা মার্চ বাচ্ছাটা ঐ ঘরে, ঐ সময়ে একা ঘুমাবে? বস্তুত সে সপ্তাহান্তে যদি ওঁরা ইগলউডে অ্যানের মায়ের কাছে যেতেন, তাহলে তার সমস্ত পরিকল্পনাই তো ব্যর্থ হত। ওঁরা যে সে সপ্তাহান্তে যাননি এটা কে কে জানত? শুধু বাড়ির কজন।

সন্দেহ ঘনিয়ে এল দুটি মানুষকে ঘিরে, অলিভ জনসন আর ভায়োলেট শার্প। প্রথমজন হচ্ছে নার্স বেটির বয়ফ্রেণ্ড; দ্বিতীয়জন সম্প্রতি-নিযুক্ত একজন অবিবাহিতা ইংরাজ তরুণী। একজন অফিসারকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হল বেটি, ভায়োলেট এবং হোয়েটলির পূর্বাশ্রমের সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে।

ইন্সপেক্টর ওয়ালস্-এর সন্দেহটা ঘনীভূত হল ভায়োলেট শার্পকে ঘিরে। রীতিমতো সুন্দরী, আঠাশ বছরেও অনূঢ়া। কারও সঙ্গে মেলামেশা করে না। বয়ফ্রেণ্ড নেই। নেই? না! আছে। জেরার মুখে নার্স বেটি স্বীকার করে ফেলেছে, ঘটনার দিন সন্ধ্যায়—এই ছয়টা নাগাদ, সে সিঁড়ির মুখে দেখেছিল দৃশ্যটা। ভায়োলেটের বয়ফ্রেণ্ড তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওরা দুজনে সে রাত্রে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।

তাই নাকি! কই এসব কথা তো এতক্ষণ বলেনি ভায়োলেট।

: ঘটনার সময় অর্থাৎ ১লা মার্চ রাত আটটায় তুমি কোথায় ছিলে?

একেবারে সাদা হয়ে যায় ভায়োলেট। অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে, সিনেমায়।

: কী বই?

সে-কথা মনে পড়ল না ভায়োলেটের। মাত্র আড়াই মাস আগের কথা, একেবারে বেমালুম ভুলে গেছে। শুধু বইটার নামই নয়, গল্পটাও—কে-কে অভিনয় করেছিল, কিছুই মনে নেই! সেদিন সিনেমা হলে কোন পরিচিত মানুষকে দেখেছিলে কি? হ্যাঁ দেখেছিল।

হুজনকে। কিন্তু তাদের নাম মনে নেই। বেশ কথা। তুমি কি বাপু একা-একা গিয়েছিলে সিনেমা দেখতে? এবার নয়ন নত হল ভায়োলেটের। বললে, না, একজন 'অ্যাকোয়েণ্টেন্সের' সঙ্গে।

'অ্যাকোয়েণ্টেন্স'। বন্ধু নয়, সদ্য পরিচিত কেউ।

: কতদিনের পরিচয়?

নত নয়নেই স্বীকার করল ভায়োলেট, মাত্র হুদিনের। দিন হুই আগে, ফেব্রুয়ারীর শেস সপ্তাহে সে যখন বাগানে বেড়াচ্ছিল তখন সেই ছেলেটি এসে যেচে আলাপ করে।

কে সে? কী নাম? কী পরিচয়? কোথায় থাকে?

এদিক থেকে ভায়োলেটের সেই ভদ্রলোকের-এক-কথা: জানি না।

ঝুঁকে পড়ে ইন্সপেক্টর ওয়ালস [illegible] মিস্। আমি যদি বলি—সেই সদ্য পরিচিত ছোকরাটির নাম, ধাম, বাপের নাম, ঠিকানা কিছুই তোমার মনে পড়ছে না, সে ঘটনার দিন সন্ধ্যা ছয়টায় সিঁড়ির নিচে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল—তাহলে তুমি কি অস্বীকার করবে?

হঠাৎ হু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল ভায়োলেট।

জেরা করতে জানে ওয়ালস্। সে অপেক্ষা করে। কেঁদে নিক। ওতে মনটা হালকা হয়। চোখের জলে মনটা দ্রবও হয়—তখন সেই পিছল মনের পথে স্বীকারোক্তি পিছলে বেরিয়ে আসে অনেক সময়। মেয়েটির রুমাল একেবারে সপ্‌সপে হয়ে গেলে ওয়াল্‌স্ তার পাট-ভাঙা রুমালটা বাড়িয়ে ধরে। ভায়োলেট ধন্যবাদ জানায়। গ্রহণ করে না।

: এবার লক্ষ্মী মেয়েটির মত স্বীকার করতো বাছা—কী নাম তোমার সেই প্রেমাস্পদের?

: বিশ্বাস করুন। নামটা আমার মনে নেই।

: দেখ মিস্ শার্প! আমি দশ বছরের বাচ্চা নই। যে ছেলেটি

তোমার চুম্বনের নৈকট্যে এসেছিল মাত্র আড়াই মাস পূর্বে—যে বেটিকে বলেছিল, নৈশ আহার তোমরা হোটেলে সেরে আসবে, তার নামটা তোমার মনে নেই এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল না। আমি বলছি না, তোমার সেই বয়ফ্রেণ্ডই 'জন দ্য কিডন্যাপার', বা সে ঐ দলভুক্ত—খুব সম্ভবত তা নয়—কিন্তু সে হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে। মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গকে দেখে তোমার দয়া হয় না? তুমি কি সত্যই চাওনা সেই নৃশংস শিশু-হত্যাকারী ধরা পড়ুক! সেই কাকে-ঠোকরানো একটা দু-বছরের শিশুর কঙ্কাল···

: ও ক্রাইস্ট! —আর্তনাদ করে ওঠে মিস্ শার্প। আবার ভেঙে পড়ে কান্নায়। বলে, বিশ্বাস করুন! আজ আমার কিছুই মনে পড়ছে না! কাল কাল বলব!

: বেশ তাই! —উঠে দাঁড়ায় ইন্সপেক্টর ওয়াল্‌স্। হ্যাট র‍্যাক থেকে হ্যাটটা পেড়ে নামায়। যাবার সময় বলে যায়—তুমি যে জবানবন্দী দিলে মিস্ শার্প, তাতে আজ রাতে তোমাকে লক-আপে রাখা যেত। কিন্তু তা আমি করছি না। আমি আশা করব আমাদের সঙ্গে তুমি সহযোগিতা করবে। সারা রাত সব ভাল করে ভেবে রেখ। তোমার বয়ফ্রেণ্ডের নাম, ঠিকানা, কী সিনেমা দেখেছিলে, সিনেমা হলে কাকে-কাকে দেখেছ—অর্থাৎ তোমার এবং তোমার বয়ফ্রেণ্ডের অ্যালেবি। কাল সকালেই আমি ফিরে আসব বাকি জবানবন্দীটুকু নিতে।

তাই এসেছিল ইন্সপেক্টর ওয়াল্‌স্। সকাল সাতটায়। কিন্তু মিস্ ভায়োলেট শার্পের বাকি জবানবন্দীটুকু তার নেওয়া হয়নি। লিণ্ডবার্গ-ভিলার সামনে একটা ভিড়। কী ব্যাপার? ব্যাপার অচিন্তনীয়। ও বাড়ির একটি পরিচারিকা—মিস্ ভায়োলেট শার্প, গতকাল রাত্রে এক মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আজ সকালে তার

মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সে আজ ইন্সপেক্টর ওয়াল্‌স্‌-এর নাগালের বাইরে। বোধকরি এখন সে সেই কাকে ঠোকরানো দু-বছরের শিশুটার রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে অশ্রুভেজা রুমালে!

নিউ-জার্সি স্টেট পুলিশের তরফ থেকে সাংবাদিকদের জানানো হল, "The suicide of Violet Sharpe strongly tends to confirm the suspicions concerning her guilty knowledge of the crime. [ভায়োলেট শার্পের আত্মহত্যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে অপরাধের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের]। তা তো বটেই! এখন তো ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার! ভায়োলেটের বয়ফ্রেণ্ডই সম্ভবত সেই 'জন'! ভায়োলেট তার নাম-ধাম পরিচয় গোপন করতে চেয়েছিল। ওরা আদৌ সিনেমা দেখেনি। ওরা দুজনে মিলে বাচ্চাটাকে চুরি করেছিল! কী শয়তান মাগী! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! বিবেকের দংশন এবং অভিজ্ঞ পুলিশ ইন্সপেক্টরের জেরার খোঁচা সইতে না পেরে মাগী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ কিন্তু থামবে না তা বলে! সে খুঁজে বার করবেই, ভায়োলেটের সেই অজ্ঞাত বয়ফ্রেণ্ডকে।

সংবাদপত্রে ছাপা হল পুলিশী বিবৃতি।

বেলা দশটার মধ্যে ঘটল একটা আজব ঘটনা!

খবরের কাগজ হাতে একটি বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়সের ভদ্রলোক থানায় এসে হাজির। বললে, ইন্সপেক্টর ওয়াল্‌স্‌ কার নাম?

: আমার! কেন?

: আপনি কাল ভায়োলেটের এজাহার নিয়েছিলেন?

: হ্যাঁ! কেন?

কোথাও কিছু নেই ঠাস্‌ করে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল বেমক্কা! এ কী! এ কী! মুখ থাকতে হাত কেন? ছুটে এল পুলিশ আর সার্জেণ্ট। হাতকড়া উঠল ছোকরার হাতে। দুই বন্দুকধারী দুদিকে পাহারা দিয়ে তাকে নিয়ে এল থানায় বড় দারোগার ঘরে।

জবানবন্দী দিতে হবে। থানার বুকের উপর বসে থানার ইন্সপেক্টরের দাড়ি ওপড়াবার এ দুর্মতি হল কেন তার। বল! কৈফিয়ত দাও!

সংক্ষেপে কৈফিয়ত দাখিল করল ছোকরা। বললে, তার নাম আর্নেস্ট মিলার। ঠিকানাও জানালো। বললে, সেই হচ্ছে মিস্ ভায়োলেট শার্পের বয়ফেণ্ড। পয়লা মার্চ সে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল বান্ধবীকে। সিনেমার নাম বলল। সেখানে পরিচিত যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের নামও বলল। যে হোটেলে খেয়েছিল তার নামও বলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাচাই করে দেখা গেল মিলার ছোকরা যা বলছে তা আদ্যন্ত সত্য। যে দুজন স্থানীয় লোকের নাম সে বলল। তাঁদের একজন স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, লিণ্ডবার্গ পরিবারভুক্ত মিস্ ভায়োলেট শার্প একটি ছেলের সঙ্গে সিনেমা দেখছিল পয়লা মার্চ। সিনেমা হলে দেখা হয়েছিল ওঁদের। দ্বিতীয়জন বললেন, হ্যাঁ তিনি সস্ত্রীক ঐ রাত্রে সিনেমা দেখতে যান। আর্নেস্ট মিলার ওঁদের পরিচিত। সিনেমা হলে আর্নেস্ট উপস্থিত ছিল। তার সঙ্গে একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের রীতিমত সুন্দরী মহিলা। তাকে ওঁরা চেনেন না। একজন স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক, অপরজন ডাক্তার—সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলা বা ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকার মত মানুষ তাঁরা নন। সেই রেস্তোরাঁর মালিকও চিনতে পারল আর্নেস্ট মিলারকে। হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক মিস্ ভায়োলেটকে নিয়ে পয়লা মে তার রেস্তোরাঁয় নৈশাহার করেন। ভায়োলেটকে তিনি ভাল রকমেই চেনেন। লিণ্ডবার্গ ভিলায় মদের যোগান তিনিই দিয়ে থাকেন।

তাহলে? আত্মহত্যা করল কেন ভায়োলেট?

মিলার বলে, আমার নাম তার মনে ছিল না এটা হতেই পারে না। এই দেখুন তার চিঠি!

অকাট্য প্রমাণ! মার্চের প্রথম সপ্তাহেই সে ওয়াশিংটনে যায়। সেখানে তার ঠিকানায় চিঠি লিখেছে মিস্ শার্প। সে চিঠিতেও ১লা

রাত্রের সান্ধ্যস্মৃতির উল্লেখ আছে। কারণ ভায়োলেট লিখেছে—"তুমি আমি যখন বসে সিনেমা দেখছি, ঠিক তখনই আমাদের বাড়িতে কী কাণ্ডটা ঘটেছে, নিশ্চয়ই কাগজে দেখেছ তা !"

হ্যাঁ, স্বীকার করে মিলার—ওরা দুজনেই পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল—ওদের প্রেমের কথা, কোর্টশিপের কথা, আপাতত গোপন থাকবে : কিন্তু তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, ওর নাম গোপন করবার প্রয়োজনে ভায়োলেটকে আত্মহত্যা করতে হবে !

সমস্ত পৃথিবী ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠল। দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ লিখল, "নিউ জার্সি স্টেট পুলিশের অসামান্য কর্মতৎপরতার এ এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। শিশুর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে না পারলেও একটি নিরপরাধ তরুণীকে জেরার গুঁতায় তারা হত্যা করতে পেরেছেন। তাই বা কজন পারে ?"

লণ্ডনে, পার্লামেন্টে একজন এম. পি. প্রশ্নটা তুললেন—মিস্ ভায়োলেট শার্প ব্রিটিশ নাগরিক। পুলিশী অত্যাচারে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য পার্লামেণ্ট নির্দেশ দিল হিজ্ ম্যাজেস্টিজ্ নিউইয়র্কস্থিত কনসাল-জেনারেলকে।

মাথা হেঁট হল নিউ জার্সি পুলিশের। বস্তুত গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের।

॥ পনের ॥

নিউইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠে একটা এক-কামরার অ্যাপার্টমেণ্ট। সকাল সাতটা। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে খাড়া হয়ে উঠে বসল জেমস্ ফিন্। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের তরুণ লেফ্টানেণ্ট। ছুঁড়ে ফেলে দিল কাগজটা। ঘরময় পায়চারি করল কয়েক মিনিট। এক কামরার বাসা-বাড়ি। একা থাকে। বিবাহ করেনি। লেঃ ফিন্ নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের অত্যন্ত উজ্জ্বল রত্ন। ইতিমধ্যেই কয়েকটা কাজে সুনাম কিনেছে।

ফিন ড্রয়ার থেকে টেনে বার করে একটা ডশিয়ার—ফাইল, আর কি। পাতা উল্টে যায়। ছবি, কাগজের কাটিং, নানান তথ্য। ফাইলের উপর লেখা : লিণ্ডবার্গ—মাই হিরো!

সরকারী ফাইল নয়। ওর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। 'হবি'। এটাই জেমস্ ফিন-এর দ্বিতীয় পরিচয়। সে একজন এক নম্বরী 'লিণ্ডি-ফ্যান্'— কিন্তু ওর দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র। চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গকে সে চর্মচক্ষে দেখেনি। তাঁর অটোগ্রাফ নেই ওর সংগ্রহ খাতায়। ১৯২৭ সালে ব্রডওয়েতে যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছিল লিণ্ডবার্গকে অভিনন্দন জানাতে সেখানেও হাজিরা দেয়নি ফিন্। এদিক থেকে ওর চোখে লিণ্ডি হচ্ছে 'ইয়্যাবো আনভিজিটেড।'

কিন্তু তাঁর প্রতিটি তথ্য ওর ফাইলে তারিখ অনুযায়ী সাজানো। ফিন্ও গরীব ঘরের ছেলে। কৈশোরে খামারে কাজ করেছে। লিণ্ডিকে সে মনে মনে পূজা করে। বাচ্চাটা চুরি যাওয়ার পর সে প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ করে গেছে। সেই তথ্যসমৃদ্ধ ফাইলটা নাড়াচাড়া করে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে গেল টেবিলের কাছে। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল একটি আনলিস্টেড নম্বর।

নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তার বাড়ির ফোন। ফিন্‌কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।

ও-প্রান্তবাসী আত্মঘোষণা করতেই ফিন্ বল্‌ল: পাঁচ মিনিট সময় দেবেন স্যার? একটা জরুরী কথা ছিল।

: এস। বাড়িতেই। সাড়ে নয়টায়।—সংক্ষেপে বললেন বড়কর্তা।

তখনই তৈরী হয়ে নিল ফিন্। গাড়ি বার করল গ্যারেজ থেকে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নয়টায় ডাক পড়ল ওর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে শব্দনিরোধক দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ওর পিছনে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে জেমস্ ফিন্ বললে, গুড মর্নিং স্যার!

: বস' ফিন! সকালটাকে ঠিক সুপ্রভাত বলতে পারছি না। কাগজ দেখেছ? মনে হচ্ছে মুখে কেউ এক বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে।

এ জাতীয় সেন্টিমেণ্টাল কথা উনি সচরাচর বলেন না। ফিন্ বললে, সেই বিষয়েই কথা বলতে এসেছি স্যার।

: ঠিকই আন্দাজ করেছি। তুমি তো লিণ্ডি-ফ্যান্। বল?

. একটা ভিক্ষা আছে স্যার?

: বল না খুলে—আমতা-আমতা করছ কেন?

: কাজটা আমাকে দিন!

গম্ভীর হলেন বড়সাহেব। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমি দুঃখিত ফিন্। এ কাজটা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ! আমি কোনও চান্স নিতে পারি না। সারা পৃথিবী এখন দেখছে আমেরিকার সেণ্ট্রাল পুলিশ এবার কি করে। এতবড় দায়িত্ব তোমার মত জুনিয়ার একজনকে দিতে পারি না। অত্যন্ত অভিজ্ঞ কোনও লোককে দায়িত্ব দিতে হবে।

মাথা হেঁট করে বসে থাকল ফিন্। বড়সাহেব সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, দুঃখ কর না লেফটানেণ্ট ফিন্। রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি।

ফিন্ উঠে দাঁড়ায়। কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলে না। বরং বলে, তাহলে যাই স্যার ?

: তুমি কি-একটা কথা বলতে চাইছিলে মনে হল ?

ম্লান হাসলে ফিন্: বলল, না, কাজের কথা কিছু নয়। আপনি ইতিহাসের উদাহরণ দিলেন কিনা, তাই আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার।

বড়সাহেব ইতিহাসেব ছাত্র। কৌতূহলী হন তিনি। বলেন. বল, শুনে রাখি ?

: এমন কিছু পুরানো দিনেব কথা নয় স্যার। ১৯২৭-এব ঘটনা। শিকাগো সেন্ট লুইয়েব এক ডাক-হরকরা পাইলট এই শহরেই 'রাইট বেলেঙ্কা' কোম্পানিতে পনের হাজার ডলার দিয়ে একটি প্লেন কিনতে এসেছিলেন। কোম্পানির বড়কর্তা মিস্টার চার্লস লেভিন তাকে বলেছিলেন, 'অর্টেগ প্রাইজ জয় কবাটা ছেলেখেলা নয়। এতবড় দায়িত্ব তোমার মত একজন জুনিয়াবকে দিতে পারি না।' বস্তুত তখন মিস্টার লেভিন মনে মনে নির্বাচন করছিলেন অনেক বেশি অভিজ্ঞ— কাপিতান ফংক, কমাণ্ডার বয়েড অথবা লেঃ কমাণ্ডার নোয়েল ডেভিসের মধ্যে একজনকে। অনভিজ্ঞ ঐ ডাক-হরকরার বয়স তখন এই আমারই মত।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে জেমস্ ফিন্ থামল। তার কপালে কিছু কিছু ঘাম জমেছে। আবেগের বসে কথাগুলো বলে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হল—কাকে কী বলছে !

বড়সাহেব ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ফিন্ অ্যাটেনশান হল। বড়কর্তা হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। অবাক হল ফিন্। আরও অবাক হল যখন উনি বললেন, থ্যাঙ্ক ফিন্! ইতিহাসে তুমি পাস করেছ! আমার শুভেচ্ছা রইল! সেই কিডন্যাপার জনকে খুঁজে বার কর তুমি !

: তার মানে স্যার · আমি· আমাকে ·

: ইতিহাস পড়ি কেন ? ঐতিহাসিক ভুল যাতে নিজেরাই না করি। তাই নয় ?

লেঃ জেমস্ ফিন্ এল নিউ জার্সিতে। সরকারী আদেশে। এতদিন স্থানীয় পুলিশ যে সব খবর আঁকড়ে রেখেছিল, কেন্দ্রীয় নির্দেশে সব তুলে দিতে হল ফিন্‌কে। নূতন উদ্যমে তদন্ত শুরু হল। জন কণ্ডনের বিবৃতি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ঘেঁটে জেমস্ ফিন্ আন্দাজে খাড়া করল অজ্ঞাত আততায়ীর আনুমানিক পরিচয়। সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হল সেটা।

বয়স ৩০-৩৫ ; উচ্চতা ৫'-৯" ; সুগঠিত দেহ ; কথার মধ্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয় অথবা জার্মান উচ্চারণের আভাস, ওজন ১৫০-১৬০ পাউণ্ড ; মাজা রঙ ; চুল পাতলা ; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ; চওড়া কপাল ; উঁচু হনুর অস্থি ; সূচালো চিবুক ; ভাল ইংরাজী জানে না। এ জাতীয় সন্দেহজনক মানুষের সন্ধান জানাতে হবে একটি পোস্টবক্সে।

কদিন পরেই এল একটি বিচিত্র চিঠি। লেখক মার্কিন মুলুকের একজন উদীয়মান মনস্তত্ত্ববিদ—ডক্টর ডাড্‌লে শোয়েনফেল্ড। সংক্ষেপে লিখেছেন—"আপনার বর্ণনা অনুযায়ী মানুষের হদিস আমি জানি না ; তবে অন্য কিছু তথ্য হয়তো সরবরাহ করতে পারব। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।"

তৎক্ষণাৎ হাজির হল জেমস্ ফিন্ ঐ প্রগাঢ় পণ্ডিতের ডেরায়। বিচিত্র মানুষ লিণ্ডির আর এক নীরব ফ্যান। ডঃ জন কণ্ডন অথবা জেম্‌স্ ফিন্-এর মত তিনিও কেসটা আদ্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেছেন—তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ফিন্‌কে বললেন, আমার নিজস্ব কতকগুলো থিওরি আছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত—তবে অঙ্কশাস্ত্রের মত অব্যর্থ নয়। আমি আমার সিদ্ধান্তগুলি জানাতে চাই। তবে তার পূর্বে আমাকে কিছু 'ডাটা' দিতে হবে—মানে, কিছু কিছু সংবাদ জানাতে হবে।

: বলুন স্যার? কি জানতে চান?

: আমার হিসাবে সেই অজ্ঞাত কিডন্যাপার চৌদ্দটি নোট পাঠিয়েছে। তার ফটোস্টাট কপি চাই।

ঐ 'চৌদ্দটি' সংখ্যাই প্রমাণ দেয় ডক্টর শোয়েনফেল্ড কী তীক্ষ্ণ অভিনিবেশের সঙ্গে এ রহস্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সেদিনই ফিন্ তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল অজ্ঞাত জনের লেখা চৌদ্দটি হস্তলিপির ফটো কপি!

সাতদিন পরে ডক্টর শোয়েনফেল্ড বললেন, আমার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা বলছে:

(১) লিণ্ডবার্গের বাচ্ছা যে চুরি করেছে সে একা হাতে কাজটা করেছে। তার দ্বিতীয় কোনও সহকারী ছিল না।

(২) সেই একক ব্যক্তি জার্মান। চিঠিতে যে বর্ণাশুদ্ধি আছে তা ইচ্ছা করে নয়, ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞতাজনিত কারণে।

(৩) লোকটা সে সময়ে 'ব্রনক্স'-এ ছিল···

এতক্ষণ নীরবে শুনছিল জেম্‌স্ ফিন্। আর থাকতে পারল না। বললে, একথা কেন ভাবছেন স্যার?

: প্রথমত সে যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছে সেটা ঐ শহরে ছাপা হয়। দ্বিতীয়ত ডক্টর কণ্ডনকে সে ব্রন্‌ক্স শহরের যে-সব নির্দেশ দিয়েছে তাতে মনে হয় শহরটা সে ভালভাবেই চেনে। তৃতীয়ত, লক্ষ্য করে দেখ গে-হেড কথাটা সে লিখেছে 'গান্ হিল' কথাটা স্কেটে দিয়ে। গান হিল ব্রনক্স-এ; অন্যমনস্কভাবে সে পরিচিত নামটাই প্রথমে লিখে ফেলেছিল। আগেই বলেছি, আমার এ বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের মত নির্ভুল নয়। আমি কতগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছি মাত্র। আততায়ী ধরা পড়লে দেখবে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই মিলে যাবে।

: ঠিক আছে। আর কি মনে হয়েছে আপনার?

: লোকটা অর্থ লোভে এ কাজ করেনি।

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল লেফটানেণ্ট ফিন্। বলে, এটা কি বলছেন স্যার ?

: হ্যাঁ আমার শাস্ত্র এই কথাই বলছে। এ বিষয়ে আমি নাইন্টি পার্সেন্ট শ্যিওর !

অদ্ভুত ওঁর থিয়োরি। ওঁর মতে লোকটা ভুগছে একটা মানসিক রোগে। তার অন্তরে আছে—হতাশা, ঈর্ষা এবং জেদ। সে লিণ্ডবার্গের সমবয়সী—হয়তো ভাগ্য তার সঙ্গে পরিহাস করেছে। হয়তো সেও বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী ! কিন্তু এই দুনিয়ায় তার দুঃসাহসিকতার মর্যাদা কেউ দেয়নি। তাই কর্নেল লিণ্ডবার্গের সাফল্যে সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে সে বলতে চায়—যে লিণ্ডবার্গকে নিয়ে তোমরা এত মাতামাতি করছ, হে বিশ্ব চেয়ে দেখ, সে আমার কাছে নতজানু !

স্তম্ভিত হয়ে যায় ফিন্। বলে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলার···

: হ্যাঁ হ্যাঁ ! টাকাও তার চাই। কিন্তু সেটা গৌণ ! লিণ্ডির যে, ঘাড়ে ধরে টাকাটা আদায় করা গেল সেটাতেই ওর আনন্দ ! অক্ষর-গুলোর টান দেখছ না ? পরিষ্কার বোঝা যায়—লোকটা দাম্ভিক ! ঈর্ষান্বিত ! নিষ্ঠুর !

জেম্‌স্ ফিন্ আবার অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। খোদায় মালুম—এ সব তথ্য উনি কোথায় দেখছেন।

যাই হোক, অতবড় বৈজ্ঞানিকের নির্দেশটাকে সে উড়িয়ে দিতে পারল না। নিজের ঘরে একটা প্রকাণ্ড ম্যাপ টাঙালো—নিউ জার্সি স্টেটের ম্যাপ। প্রতিটি ব্যাঙ্ককে নম্বরী নোটের সংখ্যা জানানো হয়েছিল। ঐ নম্বরী নোট পেলেই তা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ দপ্তরে। যেখানে নোটটা পাওয়া গেছে ম্যাপে সেখানে একটি করে আলপিন গাঁথতে শুরু করল ফিন্। আশ্চর্য ! মাস তিন-চারের মধ্যেই আলপিনগুলো ঐ 'ব্রনক্স' শহরের কাছাকাছি ভিড় জমালো—যেন ঐ শহরেই আছে একটা চৌম্বকশক্তি !

হঠাৎ আর একটা কথা খেয়াল হল ফিন্-এর—সেই ভাঙা মইটা সেটা কোথায়? নিউ জার্সি থানা থেকে সেটা উদ্ধার করা গেল কাঠের একটা টুকরো নিয়ে একদিন সে হাজির হল আর্থার কোয়েলার-এর কাছে।

আর্থার কোয়েলার বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নন তিনি বরং আমাদের খুবই চেনা। উনি, এক কথায়, আবোল-তাবোলের সেই কাঠবুড়ো :

"কোন কাঠ পোষ মানে, কোন কাঠ শান্ত
কোন কাঠ টিমটিমে, কোনটা বা জ্যান্ত।
কোন কাঠে জ্ঞান নাই মিথ্যা কি সত্য
আমি জানি কোন কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

আর্থার কোয়েলার হচ্ছেন মার্কিন দেশের বনবিভাগের 'চীফ উড টেক্‌নোলজিস্ট'। কাঠের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। চার্লস্ লিণ্ডবার্গের কেসটা মোটামুটি তাঁর জানা। ভাঙা মইটা তিনি নিলেন। বললেন, ঠিক আছে। পরীক্ষা করে দেখে আপনাকে জানাবো।

দিন সাতেক পরে যখন খোঁজ নিতে গেল তখন তিনি বললেন, কয়েকটি সূত্র পেয়েছি। প্রথম কথা কাঠটা হচ্ছে সাদার্ন পাইন, গাছটা জন্মেছিল নিউ ইয়র্ক আর আলবামার মধ্যে। আর একটা সূত্র হল যে-করাত কলে গুঁড়িটা চেরাই হয় তার একটা দাঁত একটু খুঁতো।

জেমস্ ফিন্ বলে, এসব খবর জেনে কোন চতুবর্গ লাভ হবে?

: বাঃ! অনেক কিছু হতে পারে। আপনি নিউ ইয়র্ক থেকে আলবামার মধ্যে যত কাঠ চেরাই কল আছে তাদের কাছে জানতে চান এই খুঁতওয়ালা করাত কার আছে।

· তাদের ঠিকানাই বা পাব কোথায়, আর জনে জনে খুঁতটাই বা বোঝাবো কেমন করে?

কাঠবুড়ো কোয়েলার কতকগুলো টাইপ করা কাগজ ধরিয়ে

দিলেন। বললেন, লিস্ট আমি তৈরি করে রেখেছি। ১৫৯৮টি কাঠ চেরাই কল। ওদের এই নক্‌শাটা পাঠিয়ে দিন। প্রতিটি কাঠ চেরাই কলেই দক্ষ কর্মী আছে, তারা এই খুঁত চিহ্ন দেখে বুঝে নেবে আমরা কি বলতে চাইছি।

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল জেমস্ ফিন্। ঐ যোলো শত মিলের মধ্যে মাত্র তেইশটি কোম্পানি বলল, হ্যাঁ ঐ জাতের খুঁতো চেরাই করাত তাদের আছে বটে। তবে ঠিক ঐ খুঁত কিনা তা পরীক্ষা করে রায় দেবার মত ল্যাবরেটারি বা বিশেষজ্ঞ ওদের নেই। ফিন্ তৎক্ষণাৎ সেই তেইশটি কোম্পানিকে নির্দেশ দিল ঐ খুঁতো করাতকলে একটি কাঠ চেরাই করে নমুনা পাঠাতে। অবিলম্বে এসে গেল তা। কাঠবুড়ো তা পরীক্ষা করলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। একটি কাষ্ঠখণ্ড বেছে নিয়ে বললেন—ভাঙা মই যে করাতকলে চেরাই হয়েছে সেটা M. G. & J. J. Dorn কোম্পানি। ফিন্ এবং কোয়েলার এলেন ডর্ন মিলে। গত উনিশ মাসে ৪″ × ১″ সেকসনের যত কাঠ রপ্তানি হয়েছে তার লিস্ট পরীক্ষা করতে বসলেন। সর্বসমেত ১৫টি কাঠ ব্যবসায়ীকে ঐ জাতের কাঠ বিক্রয় করা হয়েছে। মাস কতক ধরে দুজনে দোরে দোরে ঘুরলেন; তারপর ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে ওঁরা এসে পৌছালেন ন্যাশনাল মিল ওয়ার্কসএ 'ব্রনক্স'-এ!

আশ্চর্য! সেই 'ব্রনক্স'! মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর ডাড্‌লে শোয়েনফেল্ড এবং কাষ্ঠবিশারদ আর্থার কোয়েলার কেউ কাউকে চেনেন না—কিন্তু দুজনের গবেষণার অন্তিম লক্ষ্যস্থল সেই—ব্রনক্স! তাই বা কেন? ইতিমধ্যে আরও অনেক-অনেক আলপিন বিদ্ধ হয়েছে জেমস্ ফিনের ঘরের সেই প্রকাণ্ড ম্যাপে। সেখানে ব্রনক্স যেন এক মৌচাক, আর আলপিনগুলো দিবারাত্র তারই চারিপাশে গুন্‌গুন্ করে ফেরে!

ঐ কারখানার প্লেন যন্ত্রটা পরীক্ষা করে আর্থার কোয়েলার বললেন, আমি নিঃসন্দেহ যে মইটা তৈরী করেছে সে এই দোকান থেকে কাঠটা কিনেছিল।

তার চেয়ে বেশি কিছু জানা গেল না অবশ্য। কারণ এত সামান্য পরিমাণ কাঠ মানুষে নগদেই কেনে, এবং ক্রেতার নাম ঠিকানা ভাউচারে লেখা থাকে না।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর কেটে গেছে। সংবাদপত্র লিণ্ডবার্গ-রহস্য ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে মেতেছে। ফলে অজ্ঞাত আততায়ী অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। এতদিনে দশ ও বিশ ডলারের নোট পাওয়া যেতে শুরু করেছে। লোকটা এ দু বছর সাহস করে বড় নোট ভাঙায়নি। ফিন্ মনে মনে হিসাব করল: এক নম্বর, লোকটা ব্রনক্স-এর কাছে পিঠে আছে—কারণ নোটগুলো সবই পাওয়া যাচ্ছে ঐ অঞ্চলে। দু নম্বর লোকটা এখন সাহস করে দশ-বিশ ডলারের নোট ভাঙাচ্ছে; কিন্তু নিশ্চয় ব্যাঙ্কে ভাঙাবে না; কারণ সে জানে ব্যাঙ্কে নম্বরী নোটের লিস্ট আছে। তাহলে কোথায় ভাঙাচ্ছে? হয় কোন বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে, নয় মদের দোকানে, অথবা পেট্রল-স্টেশান। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে অথবা মদের দোকানে নম্বরী নোট মিলিয়ে দেখা সম্ভবপর নয়। হাজার হাজার নোটের মধ্যে কে বসে বসে মেলাবে? তাছাড়া দু-একবার ভাঙানি দিতে দেরি হলেই লোকটার সন্দেহ হবে—নিশ্চয়ই নম্বর মেলানো হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে ঐ এলাকা ছেড়ে যাবে। লস্ এঞ্জেলেস, ডালাস, কিংবা কে জানে হয়তো য়ুরোপেই পাড়ি জমাবে। তাহলে এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে!

ঠিক এই পর্যায়ে লেঃ জেমস্ ফিন্ যে বুদ্ধি খাটালো সেটাই তার সাফল্যের সবচেয়ে বড় তুরুপ! ব্রনক্স শহরের বড় বড় প্রতিটি পেট্রল পাম্পে গিয়ে সে গোপন নির্দেশ দিয়ে এল—যে কোন লোক যখন দশ বা বিশ ডলার নোট দেবে তৎক্ষণাৎ পেন্সিলে যেন নোটের উপর ঐ গাড়ির নম্বরটা লেখা হয়। ঐ এলাকার প্রতিটি ব্যাঙ্কে বলে রাখল—দশ, বিশ-ডলারের নোটের পিছনে যদি কোন গাড়ির নম্বর লেখা থাকে তাহলে নোটটা তার অফিসে জমা দিয়ে যেন নগদ টাকা নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর মাস-তিনেক তার কাছে হাজার-হাজার দশ-বিশ ডলারের নোট এল—কিন্তু সেগুলি ঐ নম্বরী নোট নয়।

তারপর একদিন। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪। একজন লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেখা করতে এল ওর সঙ্গে।

: কে আপনি ? কী চান ?

: আমার নাম ওয়াল্টার লাইল। লেক্সিংটন এ্যাভিনুতে আমার পেট্রোলের দোকান। আজ সকাল দশটায় আমার পেট্রল-পাম্পে একটি লোক একটা নীল রঙের সেলুন-ডজ গাড়ি চেপে আসে। একা মানুষ। পাঁচ গ্যালন তেল নেয় এবং এই নোটখানা দেয়। দেখুন তো স্যার মিলিয়ে—এটা লিণ্ডি কেস্-এর নম্বর কিনা !

লেঃ জেমস্ ফিন্ স্তম্ভিত। প্রতিটি পেট্রল-পাম্পকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ নির্দেশ যে লিণ্ডবার্গ কেস-এর সঙ্গে জড়িত তা ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি। তাই ভ্রূকুঞ্চিত করে ফিন্ বলে, একথা আন্দাজ করছেন কেন ?

: দুইয়ে-দুইয়ে চার স্যার ! আপনার মত আমারও আজ তিন বছর রাতে ঘুম নেই। আমিও স্লিম লিণ্ডির ফ্যান ! বাস্টার্ডটাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে না তোলা পর্যন্ত আমারও রাতে ঘুম হচ্ছে না !

: যে লোকটা পেট্রল কিনল তাকে দেখেছেন লক্ষ্য করে ?

. তাই তো নিজেই ছুটে এলাম স্যার—ডঃ কণ্ডনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ! আমি স্যার, রাত্রে শোওয়ার সময় প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছি ! আজ তিন বছর রাত্রে শোওয়ার আগে বাস্টার্ডটার স্টাটিস্টিক্স্ মুখস্ত বলি—'বয়স ৩০-৩৫, উচ্চতা ৫'-৯", সুগঠিত দেহ...'

: থাক থাক হয়েছে। দেখি নোটটা ?

মিলিয়ে দেখল এবার ! ওয়াল্টার লাইল ভুল করেনি। এটা নম্বরী নোট !

যত না খুশি হল ফিন্ তার দ্বিগুণ লাফ মারল ওয়াল্টার লাইল !

: আসুন স্যার, সিগ্রেট !—লোকটা খুশিয়াল।

: সিগ্রেট পরে হবে। ঐ নীল রঙের ডজগাড়ির নম্বরটা ?

: নিউইয়র্ক লাইসেন্স···4U 13-41

তৎক্ষণাৎ ফোন করল রেজিস্ট্রেশান বিভাগে। দশ মিনিটের মধ্যেই জানা গেল নাম ও ঠিকানা : রিচার্ড হাউমান (Hauptmann), ১২৭৯ ঈস্ট ২২২ নং স্ট্রীট, দ্য ব্রনক্স !—সেই ব্রনক্স !

॥ ষোলো ॥

পরদিন, বুধবার ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনখানি গাড়িতে বারোজন বাছা বাছা সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে লেঃ ফিন্ ঘিরে রইল চিহ্নিত বাড়িটা। সারা রাত। বেলা নটা নাগাদ সদর দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন মানুষ। গ্যারেজ খুলে তার গাড়ি বার করল। ফিন্ তার বাইনোকুলারে লোকটার দৈর্ঘ্য মাপছে, ওজন করছে, বয়স যাচাই করছে! আশ্চর্য! তার বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সব বিষয়েই বেশ মিল আছে। গ্যারেজ থেকে বার হল একটা নীল রঙের সিডানবডি ডজ—4U-13-41—চলল শহরমুখো, কিছু দূরে দূরে আগুপিছু চলতে থাকে পুলিশের গাড়ি। লালবাতির সঙ্কেতে ডজ গাড়িটা থামতেই দুপাশ থেকে ঘনিয়ে এল দুটি পুলিসের গাড়ি। লোকটা সতর্ক হবার আগেই দু-দিক থেকে দুজন তার পাঁজরে গুঁজে দিল রিভলভার। তৃতীয় একজন পরিয়ে দিল হ্যাণ্ডকাফ!

: এর মানে কি? —রুখে ওঠে হাউম্যান।

কেউ জবাব দিল না! একজন ওর পকেট থেকে বার করল একটা ওয়ালেট। তাতে একটা বিশ-ডলারি নোট! এটাও নম্বরী!

ইতিমধ্যে বড় রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক জাম!

একেই বলে আইনের ফাঁক। আপনার-আমার কাছে হয়তো মনে হচ্ছে ডিক হাউম্যানের বিরুদ্ধে শশা-লস্থির যে কেস তা নিশ্ছিদ্র, তার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ তা সন্দেহের অতীত—কিন্তু আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা তা মনে করলেন না। নিউ জার্সি স্টেটের এ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড উইলেনৎজ বললেন, তুমি নিজেই ভেবে দেখ না ফিন্, অকাট্য প্রমাণ কি একটাও পেয়েছ?

: বাঃ পাইনি ? লোকটার ওজন-দৈর্ঘ্য-চেহারা, কথায় জার্মান টান, ওর মনিব্যাগে নম্বরী নোট, এবং সবার উপর ওর বাড়ি তল্লাসী করে আমরা যে কয়েক হাজার ডলারের নোট পেয়েছি—সবই সেই র‍্যানসম-মানির নম্বরী নোট ! দশ আর বিশ ডলারে।

: ধীরে, বন্ধু ধীরে। একে একে বিচার করে দেখ। প্রথম কথা, লোকটার ওজন-দৈর্ঘ্য-আকৃতি-উচ্চাবণ তোমার অনুমানের সঙ্গে মিলেছে। সো হোয়াট ? এমন কোয়েন্সিডেন্স বা কাকতালীয় মিল তো গোটা আমেরিকায় লাখের উপর পাওয়া যেতে পারে ; তাছাড়া তোমার অনুমানটা যে অভ্রান্ত তাই বা কে বলল ? দ্বিতীয় কথা : ওর মানিব্যাগে বা বাড়িতে পাওয়া নোটগুলো। লোকটা যে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তা চূড়ান্ত মিথ্যা, এটা প্রমাণ না করতে পারলে ওকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায় না।

দমে যায় ফিন্। লোকটা সব কিছু অস্বীকার করেছে। বলেছে, সে নিরপরাধ। নম্বরী নোটগুলোর বিষয়ে সে একটা অদ্ভুত গল্প বলেছে। হাউম্যান নাকি গত বছর তার এক বন্ধুকে হাজার কয়েক ডলার ধার দেয়। বন্ধুর নাম ইসিডর ফিস্‌র। জার্মান। দেশের মানুষ। ফিস্‌র ব্যবসা করত। ব্যবসায় তার লোকসান যাচ্ছিল, তাই হাউম্যানের কাছে ধার নেয়। গত ক্রিস্টমাসে ফিস্‌র জার্মানিতে যায় বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে। যাবার সময় একটা স্যুটকেশ বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখে যায়—ফিরে এসে নেবে। তারপর থেকে আজ ছয়মাস বন্ধুর কোনও খোঁজ খবর নেই। ইতিমধ্যে যে আলমারিতে সে স্যুটকেশটা রেখেছিল তাতে উইপোকা লাগে। কিছু ক্ষতি হল কিনা দেখতে হাউম্যান স্যুটকেশটা খোলে। ভিতরে থাক থাক নোট ! হাউম্যান ভয় পায়। ন্যাপথালিন দিয়ে বাক্সটা লুকিয়ে রাখে। তবে তারও তখন টাকার টানাটানি, তাই বন্ধুকে যে টাকাটা ধার দিয়েছিল সেটা ঐ বাক্স থেকে বার করে খরচ করতে শুরু করে ! বাস্ ! আর কিছু সে জানে না।

এস এবার! প্রমাণ কর—সে মিছে কথা বলছে! ইসিডর ফিস্‌র-এর জার্মানির ঠিকানা? তা জানে না হাউম্যান। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তো ছিল না—বিদেশে স্বজাতি, তাই বিশ্বাস করে সাহায্য করেছিল। হাউম্যান বলেছিল, সব শুনে এখন তো মনে হচ্ছে ফিস্‌রই সেই কিডন্যাপার! তাই ঐ নম্বরী নোটগুলো ব্যাঙ্কে না রেখে ওর কাছে গচ্ছিৎ রেখে গেছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে হয়তো ইসিডর ফিস্‌র ওর আসল নামই নয়! এমনও হতে পারে যে, সে ইতিমধ্যে দুর্ঘটনায় মারা গেছে!

জেমস্ ফিন বলে, ওর ঐ আষাঢ়ে গল্পটা যে মিথ্যা এটা প্রমাণ করা অসম্ভব। তাহলে কি লোকটা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে? কোন উপায় নেই অপরাধ প্রমাণ করার?

এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, আছে। একটি মাত্র উপায় আছে। যদি ডক্টর জন কণ্ডন তাকে সনাক্ত করেন। লিণ্ডবার্গ কেস-এ সেই বৃদ্ধ হেড মাস্টার মশাই-এর নাম বারে বারে সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। শুধু আমেরিকা নয় গোটা পৃথিবী জানে তিনি মিথ্যাসাক্ষী দিতে পারেন না, দেবেন না। তিনি যদি ঐ রিচার্ড হাউম্যানকে চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করেন—কোর্টে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, হ্যাঁ ঐ লোকটার হাতেই তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্যাকেটটা দিয়েছিলেন তাহলে ওর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

: থ্যাঙ্কু স্যার! তাহলে সেই চেষ্টাই করি।

বেচারি ফিন্। ডক্টর জন কণ্ডনের সাক্ষাৎ সে পেল—এখনও বেঁচে আছেন বৃদ্ধ; কিন্তু তিনি অন্যমানুষ! মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। সারাদিন বিড় বিড় করেন। লোকজন চিনতে পারেন না ঠিক মত। তাঁর সাক্ষ্যের কোনও দামই হবে না। প্রতিপক্ষ অনায়াসে প্রমাণ করে দেবে তাঁর স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য নয়।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে ফিন্-

এর। আজ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে আততায়ীকে ধরল অথচ আইনকে লবডঙ্কা দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে সে! শুধু কি সে একা? ওর কত সহকর্মী দিবারাত্র খেটেছে ঐ লোকটাকে ধরবার জন্য। মনে পড়ল আরও অনেকগুলি মানুষের কথা—সেই কাঠবুড়ো আর্থার কোয়েলার, মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর ডাড্‌লে শোয়েনফেল্ড, পেট্রল স্টেশানের সেই সেল্‌স্‌ম্যান ওয়াল্টার লাইল। তা ছাড়া এই ক-বছরে কয়েক হাজার মানুষ ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে—ব্যক্তিগত সাক্ষাতে, চিঠি লিখে, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে। তারা বলেছে: স্লিম লিণ্ডি আমাদের মানসলোকে রূপকথার রাজা! রাজপুত্রকে যে রাক্ষসটা খুন করেছে তার রক্ত আমাদের চাই! যেদিন হাউম্যানকে সে ধরল,—রেডিওতে ঘোষণা হল, সান্ধ্য এডিসান ছাপা হল কাগজে, সেদিন ওর ঘরে টেলিফোন রিসিভারে রাখা যায়নি। এক সপ্তাহে অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে কয়েক সহস্র অভিনন্দন টেলিগ্রাফ পেয়েছে ফিন্। এই তার পরিণাম! লোকটা লবডঙ্কা দেখিয়ে জার্মানিতে ফিরে যাবে?

এটর্নি জেনারেলের মত—তাই যাবে! উপায় নেই। আইন হচ্ছে আইন!

সেদিনই জেমস্ ফিন্ দেখা করল বড়কর্তার সঙ্গে। বললে, স্যার আমি ছুটি চাইছি। জন ছ্য কিডন্যাপারকে ধরেছি, এবার কেস্‌টা কণ্ডাক্ট করার ব্যাপারে···

বাধা দিয়ে বড়-কর্তা বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও! কী বল্‌লে? জন ছ্য কিডন্যাপারকে ধরেছ? কে বললে? তুমি ধরেছ রিচার্ড হাউম্যানকে। তোমার কাজ তো শেষ হয়নি ফিন্।

মাথা নেড়ে ফিন্ বলল, স্যার, এ নিতান্তই আমার দুর্ভাগ্য! এ হবার নয়! আমি ও আশা ত্যাগ করেছি। এবার অন্য কারও উপর এ দায়িত্ব দিন। আমি ক্লান্ত।

চেয়ারে এলিয়ে দিলেন দেহটা। একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে

বড়-কর্তা বললেন, বেশ ! হার যখন স্বীকার করছ তখন ছুটিই দেব তোমাকে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ছে —সেটা শুনিয়ে দিই। না, অনেকদিন আগেকার কথা নয়। ১৯২৭-এর ঘটনা। পনের হাজার ডলারে পছন্দমত একটা প্লেন যোগাড় করতে না পেরে এই শহরেই একজন ডাকহরকরা পাইলট এসেছিল গ্লোব-ডেমক্রাট কাগজে হ্যারী নাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বলেছিল, এ হবার নয় স্যার! আমি ও আশা ত্যাগ করেছি! এবার আপনারা আমাকে রেহাই দিন!

বড়সাহেব থামলেন। সিগারের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। জেমস্ ফিন্-এর কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। চেয়ারের হাতল দুটো বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে সে। পুরো এক মিনিট কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর ফিন্ বললে, স্যার ·

: একটু অপেক্ষা কর। আমি ডক্টর শোয়েনফেল্ডের সঙ্গে প্রথমে ফোনে কথা বলে নিই।

বড়কর্তা ফোনটা তুলে নিয়ে প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর ডাড্‌লে শোয়েনফেল্ডকে তাঁর চেম্বারে ফোন করলেন। সংক্ষেপে বললেন, ডক্টর, আজ লাঞ্চে তোমার কোনও প্রোগ্রাম আছে? · _ নেই? ভালই হল। শোন, জেমস্ ফিন্ আমার সামনে বসে আছে। বেচারি ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে। এস, আজ আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করি। অনেক কথা আছে থ্যাঙ্কস্!

চোখে জল এসে গিয়েছিল জেমস্ ফিন্-এর। আবার বললে, স্যার ··?

: আই নো, আই নো! আগেই তো বলেছি! ইতিহাস কেন পড়ি?

ডক্টর ডাড্‌লে শোয়েনফেল্ড কেসটা দেখে বললেন, একেবারে নিরাশ হবার কিছু নেই। বৃদ্ধ আদৌ পাগল হন নি, স্মৃতিশক্তিও

ওঁর ঠিক আছে—শুধু বিশেষ কোনও আঘাতে মানসিক ভারকেন্দ্রটা একটু সরে গেছে। কেমন জান? ধর একটা সিনেমা প্রজেক্টার। ফিল্ম্ ঠিক আছে, রীলগুলো পর পর সাজানো আছে, লেন্স্‌ও নি-দাগ—শুধু ফোকাস-নবটা একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গেছে। স্ক্রীনে ছবি পড়ছে, কিন্তু সবই ঝাপসা। আমাদের একমাত্র কাজ ঐ ফোকাসিং-নবটাকে খুঁজে বার করা। ঠিকমত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এ্যাডজাস্ট করলেই পঁচাত্তর বছরের মেসিনটা আবার ঠিক চল্‌তে থাকবে। ওঁর অসংখ্য ছাত্র বলেছে—স্মৃতিশক্তি ওঁর অসাধারণ ছিল!

: কোর্টে ওঁর ডাক পড়তে এখনও চার-পাঁচ মাস! এই অল্প-দিনে কি হবে স্যার?

: একদিনেও হতে পারে। যদি ঐ ফোকাসিং নবটা খুঁজে পাই। পারব কিনা গ্যারান্টি দিচ্ছি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি!

: তবে তাই দেখুন!

ডক্টর শোয়েনফেল্ড ডুবে গেলেন তাঁর নিরলস সাধনায়। ঐ বৃদ্ধের স্মৃতিশক্তিকে ঠিকমত গিয়ারে ফিরিয়ে আনতে। বৃদ্ধ এমনিতে স্বাভাবিক—শুধু মানুষজন চিনতে পারেন না। শোয়েনফেল্ড কদিনের ভিতরেই বুঝে নিলেন, ঐ মানুষজন চিন্‌তে না পারার একটা বিশেষ ছন্দ আছে। পাড়ার লোকদের চিনতে পারেন। শোয়েনফেল্ডকে চিনতে পারেন। গত দু-তিন বছরের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাদের চিনতে পারেন—পারেন না শুধু ওঁর প্রাক্তন ছাত্রদের। সিদ্ধান্তে এলেন শোয়েনফেল্ড—একটা অপরাধবোধ থেকে এভাবে মনের ভারসাম্য হারিয়েছেন বৃদ্ধ। যে আদর্শে সারা জীবন-ভোর উদ্বুদ্ধ করেছেন ছাত্রদের সেই আদর্শচ্যুতি থেকেই ওঁর এ অবস্থা। একটু খোঁজ খবর নিতেই জানতে পারলেন ব্যাপারটা। কর্ণেল ব্রেকিংরিজ জানালেন তত্ত্বটা। কীভাবে ডক্টর কগুন পথে পথে খুঁজছিলেন একটা হারানো ম্যাক্সিম:

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!"

সমস্যাটা বুঝলেন মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত। সমাধানটাও আন্দাজ করলেন। এসে উপস্থিত হলেন কর্ণেল লিণ্ডবার্গের আবাসে। সব কিছু খুলে বললেন। লিণ্ডবার্গ এবং এ্যান ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনলেন। সহানুভূতি জানালেন। বলেন, আমরা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

: আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আপনারা দু-জন সৌজন্য সাক্ষাতে ডক্টর কণ্ডনের সঙ্গে দেখা করতে আসুন!

: কিন্তু উনি তো আমাদের চিনতে পারবেন না।

: না! আপনাদের দু-জনকে হয়তো চিনতে পারবেন না। কিন্তু যেহেতু চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ জুনিয়ারকে উনি কখনও দেখেননি, তাই তাকে হয়তো চিনতে পারবেন। আপনারা 'জন'কে নিয়েই যাবেন।

'জন' হচ্ছে মিসেস্ এ্যান লিণ্ডবার্গের দ্বিতীয় সন্তান। পুত্র-সন্তান। বর্তমানে তার বয়স বিশ মাস!

অদ্ভুত পরীক্ষা! অদ্ভুত ফলাফল!

ভ্রূকুঞ্চিত করে বৃদ্ধ অনেকক্ষণ দেখলেন এ্যানকে। বললেন, তুমি কে?

এ্যান কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। তাকে জবাব দিতে হল না। পাশ থেকে ডক্টর শোয়েনফেল্ড বৃদ্ধের কানে কানে বলেন, তুমি কেমনতর মানুষ হে ডক্টর কণ্ডন! তুমি জান না, মাতৃস্নেহ এমন একটা স্বর্গীয় জিনিস যা এইসব কিডন্যাপিং, র‍্যানসম-মানির অনেক অনেক ঊর্ধ্বে? আমাদের মত চোর-জোচ্চোর-মিথ্যাবাদীর ক্ষমতা কি মা মেরীকে বাধা দিই? ও যে মা!

শোয়েনফেল্ড-এর দিকে ফিরে বৃদ্ধ বললেন, য়ু আর পার্ফেক্টলি রাইট্ মাই বয়! ঠিক বলেছ তুমি। ফুল মার্কস্!—তারপর এ্যানের দিকে ফিরে বলেন: তুমি মা?

: ইয়েস্ !

: এ তোমার ছেলে ?

: ইয়েস !

: তুমি কি মা মেরী ?

এ্যান এবারও বলতে যাচ্ছিল—'ইয়েস'; কিন্তু তার পূর্বেই শোয়েনফেল্ড বলে ওঠেন, নো ! উনি হচ্ছেন মিসেস্ এ্যান লিণ্ডবার্গ ! সেই বিখ্যাত চার্লস্ অগস্টাস লিণ্ডবার্গের স্ত্রী ! মনে নেই তোমার ?

ভ্রূকুঞ্চিত করে বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কি ভাবেন। তারপর এ্যানের কোলে বিশ-মাসের শিশুটির বাঁ চোখটা দেখিয়ে বললেন, ওর চোখটা ভাল হয়ে গেল কেমন করে ?

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে এ্যান। না ! কাঁদবে না, কিছুতেই নয় !

শোয়েনফেল্ড পুনরায় চাপা ধমক দিয়ে ওঠেন : তুমি কেমনতর মানুষ হে কণ্ডন ! তুমি জান না ঈশ্বর করুণাময় ? জান না যীশাস কত অন্ধ মানুষকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, কত মৃতবৎসা নারীকে সন্তান ফিরিয়ে দিয়েছেন ?

অমলিন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বৃদ্ধের মুখ : য়ু আর এগেন রাইট মাই বয় ! ফুল-মার্কস্ ! —এবার লিণ্ডবার্গ-এর দিকে ফিরে বলেন : তুমি এর বাবা ?

: ইয়েস !

: তুমি তো সেই কর্ণেল, চার্লস্ অগস্টাস লিণ্ডবার্গ, সিনিয়ার ?

: ইয়েস !

: এই বাচ্চাটা তাহলে চার্লস্ অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গ দ্য জুনিয়ার ?

অধোবদন হলেন লিণ্ডবার্গ। সজ্ঞান মিথ্যা বলতে পারলেন না।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। লিণ্ডির হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, এই তো চাই ! মিথ্যার সঙ্গে কখনও আপস কর না ! আমি বুঝতে পেরেছি—এ তোমার সেই হারানো ছেলে নয় ! এ তোমার নতুন

সন্তান! মায়ের কোল শূন্য থাকেনি!··ও ক্রাইস্ট! তুমি আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছিলাম!

হুহু করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ!

সোফায় বসে পড়ল এ্যান। বাচ্ছাটাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বুকে!

রিচার্ড হাউম্যানের বিচার এ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত বিচার; কিন্তু সে বিবরণ বিস্তারিত শোনাব না। স্টেটের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল ডেভিড উইলেন্‌জ এবং আসামী পক্ষের এ্যাটর্নি এডওয়ার্ড রেইলির সে দ্বৈরথ-সমর নাটকীয় সন্দেহ নেই—কিন্তু লিণ্ডবার্গের জীবন কাহিনীতে সেটা অপ্রয়োজনীয়। তবু কয়েকটি তথ্য সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে :

প্রথম কথা—মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর শোয়েনফেল্ডের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। ব্রুনো রিচার্ড হাউম্যান এ দুষ্কার্য করেছিল টাকার জন্য ততটা নয়, যতটা ঈর্ষার বশীভূত হয়ে—মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে। ১৯১৮ সালে পরাজিত জার্মানির সৈনিক হাউম্যান সেদিন উপার্জনের রাস্তা খুঁজে না পেয়ে আঁধারের কারবারী হয়ে পড়েছিল। ধরা পড়ে। জেলে যায়। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া সে। চার চারটে ডাকাতির কেস যার কাঁধে ঝুলছে সে জেলখানার পাঁচিল টপকে পালায়। আবার ধরা পড়ে। সশ্রম কারাদণ্ড, চার বছরের। আবার পালায়। জার্মানি থেকেই সরে পড়ে—জাল পাসপোর্ট নিয়ে। দেশত্যাগের দিন ওর জেলখানার অফিসারকে একটি অভিনন্দনপত্রও লিখে যায়।

আমেরিকায় এসে বিবাহ করে, একটি সন্তানও হয়। ওর স্ত্রী ঘুণাক্ষরেও জানে না স্বামীর অতীত জীবন কথা। চার্লস লিণ্ডবার্গ যখন সাফল্য লাভ করেন তখন একদিন স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়েছিল। স্ত্রী ছিল লিণ্ডি-ফ্যান, তাই "ঐ লিণ্ডি ছোকরা আমার কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়"—এ বিদ্রূপ সে সইতে পারেনি।

হঠাৎ হাউম্যান কি করে বড়লোক হয়ে গেল এটাও জানতে পারেনি ওর স্ত্রী। প্রশ্ন করলেই ধমক খেতে হত।

বিচার চলেছিল দীর্ঘদিন। এদেশে ভাওয়াল সন্ন্যাসী, পাকুড় হত্যা মামলা, বা সাম্প্রতিককালে সুজাতা হত্যা মামলার মত সারা দেশব্যাপী আলোড়ন জেগেছিল। নানান জনের সাক্ষ্য নেওয়া হল—নার্স বেটি, আর্থার কোয়েলার, ডেড্‌লি শোয়েনফেল্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মামলার মোড় ঘুরে গেল ডক্টর জন কণ্ডনের সাক্ষ্যে। বাদী পক্ষের প্রশ্নের জবাবে তিনি নিখুঁত জবানবন্দী দিয়ে গেলেন। শেষে এ্যাটর্নি জেনারেল প্রশ্ন করলেন : আপনার বর্ণিত ঐ 'জন দ্য কিড্‌ন্যাপার' লোকটাকে পরে কোনদিন দেখেছেন ?

ডক্টর কণ্ডন বললেন, এখনও দেখছি। ঐ তো ! আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মানুষটা ! ব্রুনো রিচার্ড হাউম্যান !

পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রের শিরোনামা ছিল : জাফ্‌সি সনাক্ত করলেন ! হাউম্যানই জন ! কিন্তু ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল ডক্টর জন কণ্ডন নাকি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই জেরায় আসামীর পক্ষের এক তরুণ উকিল প্রশ্ন করলেন, ডক্টর কণ্ডন, বলতে পারেন দশের লগেরথিম্‌ কত ?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন সরকার পক্ষের এ্যাটর্নি : অব্‌জেকশন য়োর অনার। প্রশ্নটি অবৈধ—কারণ অপ্রাসঙ্গিক, বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত।

তরুণ উকিল হেসে বলেন, য়োর অনার, আমি ডক্টর কণ্ডনের স্মৃতিশক্তিটা যাচাই করে দেখতে চাই। উনি আসামীকে সেই 'জন দ্য কিড্‌ন্যাপার' বলে চিহ্নিত করেছেন—আমি দেখাতে চাই তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। দশের লগেরথিম কত তা প্রাক্তন হেডমাষ্টার-মশায়ের মনে থাকার কথা।

বিচারক গম্ভীর হয়ে বলেন, অবজেকশান ওভাররুল্‌ড্‌। নাউ আন্সার দ্যাট কোশ্চেন, ডক্টর কণ্ডন।

সাক্ষী তাঁর প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরে বললেন, দশের লগেরথিম্ জানতে চান ? কিন্তু বেস্ কি ? হাইপারবোলিক অর্থাৎ নেপিরিয়ান লগেরথিম্, না···?

হঠাৎ ছাত্রের বিহ্বল দৃষ্টিটা নজরে পড়ায় বলেন, আপনি বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারছেন না, নয় ?

উকিল তখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি।

: যা বোঝেন না তা নিয়ে প্রশ্ন করেন কেন ? অঙ্কের ক্লাসে কি শুধু প্রক্সিরই ব্যবস্থা ছিল ?

কোর্টে প্রচণ্ড হাস্যরোল। বিচারক হাতুড়ি পিটিয়ে নিস্তব্ধতা ফিরিয়ে আনেন। সাক্ষীকে বলেন, আপনি এখনও প্রশ্নটার জবাব দেননি ডক্টর কণ্ডন।

: রাইট ! দিলেও উনি বুঝতেন না, তাই দিইনি। আপনাকে দিচ্ছি : লগ্ টেন হচ্ছে ওয়ান্ ; কিন্তু নেপিরিয়ান লগেরথিম টেব্লে দশ-এর লগেরথিম হচ্ছে ২.৩০২৬···

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬। দীর্ঘ এগারো ঘণ্টা ধরে জুরীরা আলোচনা করছেন রুদ্ধদ্বার কক্ষে। রাস্তায় অগণিত মানুষ, মানুষ, আর মানুষ। এই মামলার জন্য একটা নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসানো হয়েছিল—নতুন লাইন বসানো হয়েছিল। হাজার-হাজার প্রেস রিপোর্টার মাসের পর মাস ওখানে থেকেছেন। রাত এগারোটায় জুরীরা ঘরে ঢুকেছেন। সারারাত তাঁরা আলোচনা করেছেন। ফেব্রুয়ারির শীত অগ্রাহ্য করে সমস্ত রাত হাজার হাজার মানুষ প্রতীক্ষা করেছে পথের উপর দাঁড়িয়ে। ক্রমে সকাল হয়েছে। আলো ফুটেছে। বেলা হয়েছে। হাজার হয়েছে লক্ষ। কৌতূহলী মানুষ এসে জুটেছে নতুন করে। বেলা দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে খবর পাওয়া গেল জুরীর দল রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। জনতা

উৎসাহে ফেটে পড়তে চায়। তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে কোর্ট-রুমের অলিন্দে একজন অফিসার এসে দাঁড়ালেন। হাতে মাইক্রোফোনের মাউথপীস্। কিছু বলবার আগেই লক্ষ কণ্ঠে জনতা চীৎকার করে উঠ্ল: মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড! শিশু হত্যাকারীকে আমরা ক্ষমা করব না!

অফিসার হাত তুলে জনতাকে শান্ত হতে বললেন। নিস্তব্ধ হল অশান্ত জনতা।

: লেডিস্ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন! ফোরম্যান অফ দ্য জুরী স্বয়ং ঘোষণা করছেন তাঁদের সম্মিলিত সুপারিশ। আপনারা শুনুন।

পার্শ্ববর্তী একজন, জুরী দলের মুখপাত্র, ওঁর হাত থেকে মাউথ-পীসটা নিয়ে ঘোষণা করলেন: "উই, দ্য জুরী, ফাউণ্ড দ্য ডিফেণ্ডাণ্ট গিল্‌টি অফ্ মার্ডার ইন দ্য ফার্স্ট ডিগ্রি!"

চীৎকার করে উঠ্ল জনতা!

বিচারক মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো হবে হাউম্যানকে—১৮ই মার্চ ১৯৩৫ তারিখে। একমাস পরে।

সে-রাত্রে হাউম্যান কেঁদেছিল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল,

: Little men, little pieces of wood, little scraps of paper···[ছোট ছোট কাঠের টুকরো, ছোট ছোট চিরকুট কাগজ আর খুদে-খুদে মানুষ! ··]

মৃত্যুর পূর্বে ওর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলে সে বলেছিল সে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। কে সে? ওর স্ত্রী? ওর একমাত্র সন্তান? না! প্রায় অপরিচিত এক বৃদ্ধ। কোন একটা স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুজনের কী কথাবার্তা হয়েছিল জানা যায় না। শুধু শুনেছি, বৃদ্ধ যখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর সঙ্গে নির্জন সাক্ষাৎ সেরে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চাপছেন তখন

পিছন পিছন ছুটে এসেছিল একজন পুলিশ। বলেছিল, স্যার, লাঠিটা আপনি ফেলে যাচ্ছেন!

হেডমাস্টারমশাই আসবার সময় লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ সেরে ফিরে যাওয়ার সময় স্টিকস্ট্যাণ্ড থেকে লাঠিটা তুলে নিতে ভুলেছেন। সেপাইটা এবার বাড়িয়ে ধরে সেটাই।

ম্লান হেসে ডক্টর জন কণ্ডন বলেছিলেন, থাক, ওটার আর দরকার হবে না।

॥ সতের ॥

'হোয়াট প্রাইস্ গ্লোরি ?'

খ্যাতির কী মূল্য ? মনে হয়েছিল, প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে কর্নেল লিণ্ডবার্গ বুঝি সে মূল্য পাই-পয়সা হিসাবে মিটিয়ে দিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাও হল না। কথা সাহিত্যিক হিসাবে আমরা একটা জিনিসকে ডরাই : অতিশয়োক্তি। ঔপন্যাসিককে সর্বদা মনে রাখতে হয় : লেবু বেশি কচলাতে নেই। কিন্তু ঐ যে অন্তরীক্ষবাসী এক ঔপন্যাসিক আছেন না, যাঁর নায়ক-নায়িকা কলমের মুখে জন্মায় না, জন্মায় মাতৃগর্ভে, সে ভদ্রলোকের এটুকুও রসবোধ নেই। তাই উপন্যাস লিখলে যে-কথা আমি কদাচ লিখতাম না, বাস্তব মানুষের জীবনী লিখতে সেই অতিভাষণ লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে :

৬ই আগস্ট, ১৯৩২ এ্যান মরো লিণ্ডবার্গের দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এবারও পুত্র। ওর নাম দেওয়া হল জন (Jon)। এই খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার ঠিক পরেই কর্নেল লিণ্ডবার্গ বড় বড় পত্রিকায় যে বিবৃতিটি ছাপিয়ে ছিলেন সেটি প্রণিধানযোগ্য :

"মিসেস্ লিণ্ডবার্গ এবং আমি নিউ জার্সিতে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছি। আমরা যে সেখানে আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছেই থাকতে চাইব এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের বিশ্বাস : প্রথম সন্তানটির শোচনীয় মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ পাব্লিসিটি—প্রচার; সুতরাং দ্বিতীয় সন্তানটির বিষয়ে আমরা প্রচারবিমুখ। আমাদের বিশ্বাস : আর পাঁচটা শিশুর মত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্মগত অধিকার আমাদের সন্তানদেরও আছে। সুতরাং 'প্রেস'এর কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমাদের সন্তানদের স্বাভাবিক আমেরিকান শিশুর মত বেঁচে থাকতে দিন।"

মনে রাখা দরকার, এ আবেদন প্রচারিত হয়েছিল ব্রুনো হাউম্যান ধরা পড়ার আগে। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে। হাউম্যান ধরা পড়েছে, তার বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। চার্লস এবং এ্যান তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র জনকে নিয়ে ফিরে গেছেন নিউ জার্সির বাড়িতে। স্বাভাবিক জীবনের সন্ধানে। ছেলেটিকে ভর্তি করেছেন নার্সারি স্কুলে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিজ নিজ কর্মজীবনে ফিরে গেছেন। স্মিথ কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাক্তন ছাত্রী অ্যান মরো লিণ্ডবার্গকে অনাবারী মাস্টার অব আর্টস্ ডিগ্রিতে ভূষিত করেছে। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যরূপে ঐ উপাধি দান করার সময় বলেছিলেন : Poet, pilot, navigator, radio operator, co-explorer with her husband of the unflown air-routes of five continents and two oceans —she is the pride of her college, the glory of her country [কবি, বিমানচালক, ন্যাভিগেটর, রেডিও অপারেটর রূপে তিনি স্বামীর সহ-অভিযাত্রিণী হিসাবে পাঁচটি মহাদেশে এবং দুইটি মহাসমুদ্রে নানান পথপরিক্রমা করেছেন—যে পথে ইতিপূর্বে কোন বিমান-চালক যাননি ; তাই তিনি তাঁর শিক্ষায়তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাঁর দেশের গর্ব।]

স্বামীও কম যান না। স্মিথ কলেজের সমাবর্তন উৎসবের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সংবাদপত্রে ঘোষিত হল : "রকফেলার ইন্স্টিট্যুট অব মেডিকেল রিসার্চ সানন্দে ঘোষণা করেছেন যে, বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডক্টর অ্যালেক্সি ক্যারেল একটি রোগীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সময় কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে রোগীকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার এক যুগান্তকারী উত্তরণ। জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসককে এ বিষয়ে সাহায্য করতে একজন অতি দক্ষ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের একটি পরিপূরক আবিষ্কার আবশ্যিক হয়ে পড়ে—এ কথা বলাই

বাহুল্য। সেই যান্ত্রিক আবিষ্কারটি করেছেন অতলান্তিক-বিজয়ী কর্নেল চার্লস লিণ্ডবার্গ।"

বস্তুত ১৯১২ সালের পূর্বেই ডক্টর অ্যালেক্সি ক্যারেল নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। বর্তমান আবিষ্কারের সঙ্গে ডক্টর ক্যারেল সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তাঁর সাফল্যের সিংহভাগ কর্নেল লিণ্ডবার্গের প্রাপ্য।

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে ওরা সুখী-দম্পতি হতে পারেনি। সুখী-দম্পতি না হতে পারার কতই তো কারণ থাকে—স্বামীর দোষ, স্ত্রীর দোষ, অথবা উভয়েই আংশিকভাবে দায়ী। এ-ক্ষেত্রে দোষ ওদের দুজনের কারও নয়, দোষ ওদের ভাগ্যের—ওদের অপরাধ : ওরা সাফল্যলাভ করেছে জীবনে।

প্রতি সপ্তাহেই ডাকবাক্সে বেনামী চিঠি আসতে থাকে—ওদেব নানানভাবে শাসিয়ে, আর বিভীষিকার মূল লক্ষ্য ওদের সাড়ে তিন বছরের পুত্র জন! কেন? তা কেউ জানে না! পুলিশে কোন হদিস দিতে পারে না। প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ কোনও সূত্র খুঁজে পায় না। ছেলেধরার গোষ্ঠী কি প্রতিশোধ নিতে চাইছে? তাহলে তারা এভাবে ওদের সাবধান করবে কেন? কোন নৃশংস মানুষের অহৈতুকী পৈশাচিক উল্লাস? এগুলো কি শুধুই ফাঁকা আওয়াজ? পুলিশ তাই বলছে; কিন্তু ঘরপোড়া গরু অ্যানের মন মানে না।

তারপরেই একদিন ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। বাড়ির গাড়িতে করে জন ফিরছিল তার নার্সারি স্কুল থেকে। বাড়ির ড্রাইভার চালাচ্ছে গাড়ি। মোড়ের মাথায় লালবাতির নির্দেশ পেয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ ড্রাইভারের লক্ষ্য হল ঠিক সামনে দাঁড়ানো একটা ট্রাকে কারা যেন ঝুপ করে তারপলিনের পর্দা ফেলে দিল আর অতি সন্তর্পণে সেই পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এল একজোড়া কালো নল। ড্রাইভার চীৎকার করে উঠল! জন ভয় পেয়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল গাড়ির পাপোশে মুখ গুঁজে। অন্যান্য গাড়ির

লোকেরাও দেখতে পেয়েছে, হৈহৈ করে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ লাল-বাতির সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে সামনের ট্রাকটা বিদ্যুদ্‌গতিতে রওনা হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই মোড়ের পুলিশটা ছুটে এল। ড্রাইভারের কাছে ব্যাপারটা শুনে পুলিশটি তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে ফোন করে দিল। ট্রাকটা ধরা পড়ল। তাজ্জব ব্যাপার। ট্রাকে ধরা পড়ল দুজন ক্যামেরাম্যান! প্রেসের লোক! ওরা লুকিয়ে জনের ফটো তুলছিল। যে কালো নল দেখে ড্রাইভারটি চিৎকার করেছিল সেটা টেলিফটো ক্যামেরার!

পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হল ঘটনাটা। ছবিসমেত।

এবং তারপর দিন ডাকবাক্সে পাওয়া গেল একটি বেনামী চিঠি: এবার আর টেলিফটো ক্যামেরা নয়। দেখতে পাবে রাইফেলের নল!

অ্যান তার স্বামীকে বললে, যা হয় কিছু কর! আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব!

কর্নেল লিণ্ডি বললেন, উপায় একটাই আছে হনি! যে পাপ করেছি তার অনিবার্য দণ্ড মাথা পেতে নেওয়া! প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে আমাদের,—তোমাকে, আমাকে, জনকে!

: প্রায়শ্চিত্ত! দণ্ড! কী দণ্ড?

: নির্বাসন দণ্ড, অ্যান! আমেরিকা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে!

কয়েকটি খণ্ডমুহূর্ত অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। ক্রমে বুঝল। হ্যাঁ, এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমেরিকান প্রেস ওদের স্বাধীন স্বাভাবিক দম্পতি হিসাবে বেঁচে থাকতে দেবে না! চলে যেতে হবে দেশান্তরী হয়ে—য়ুরোপে, এশিয়ায়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অখ্যাত দ্বীপপুঞ্জে—স্টিভেন্সনের মতো, গঁ্যগার মতো। কিন্তু অপরাধটা কী? কোন পাপের এ প্রায়শ্চিত্ত? জানতে চাইল হতভাগিনী। ম্লান হাসলেন কর্নেল

লিণ্ডবার্গ: পাপ দুজনেই করেছি। আমেরিকার উপকার করেছি দেশকে ভালবেসেছি!

১২শে ডিসেম্বর একান্ত গোপনে—ঠিক যেভাবে হনিমুনে পালিয়েছিলেন সত্থবিবাহিত দম্পতি, তেমনিভাবে অনাড়ম্বর বিদায় নিলেন ওঁরা তিনজন। প্রায় ছদ্মবেশে! প্লেনে নয় এবার, জাহাজে। ওঁরা যখন মাঝসমুদ্রে তখন খবরটা আমেরিকায় জানাজানি হল। য়ুরোপ এবং আমেরিকা দুই দেশে একই সঙ্গে খবরটা ছাপা হল। নিউইয়র্কের হেরাল্ড ট্রিবিউন সম্পাদকীয়তে লিখল: The departure of Colonel and Mrs. Lindbergh for England, to find a tolerable home there in a safer and more civilized land than ours has shown itself to be its own commentary upon the American social scene. Nations have exiled their heroes before; they have broken them with meanness. But when has a nation made life unbearable to one of its most distinguished men through a sheer inability to protect him from its criminals and lunatics and the vast vulgarity of its sensationalists, publicity-seekers, petty politicians and yellow newspaper men? It seems as incredible as it is shocking. Yet everyone knows that this is exactly what has happened···[কর্নেল এবং মিসেস্ লিণ্ডবার্গের এই নীরব প্রস্থান—আমাদের দেশের তুলনায় সভ্যতর এবং নিরাপদ কোন দেশে আশ্রয় নেবার এই প্রচেষ্টাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমেরিকান সমাজ কোথায় পৌঁচেছে। দেশ থেকে তার বীর-সন্তানদের বিতাড়িত করাটা কিছু নতুন কথা নয়: নীচতা দিয়ে দেশের সুসন্তানদের ভগ্নহৃদয় করাও অশ্রুতপূর্ব নয়। কিন্তু কে কবে কোথায় শুনেছে, একটা গোটা জাতি তার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

সন্তানের জীবন এভাবে দুঃসহ করে তুলেছে? অপরাধী এবং উন্মাদদের হাত থেকে সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে রক্ষা করতে এভাবে ব্যর্থ হতে? শুধু ক্রিমিনাল এবং পাগল নয়—দেশজোড়া উন্মত্ত জনতা, প্রচার-কামুক, রাজনীতি-ব্যবসায়ী, এবং নীতিজ্ঞানবিবর্জিত তথাকথিত সাংবাদিকদের হাত থেকে! এ দুর্ঘটনা নিতান্ত অবিশ্বাস্য এবং মর্মবিদারক। অথচ প্রত্যেকটি আমেরিকান জানেন এই হচ্ছে আসল ঘটনা·].

অতলান্তিক মহাসাগরের ও-প্রান্তে লণ্ডনের 'ডেলি-মিরর' এ খবরটা ছাপল একেবারে নতুন ঢঙে। সাংবাদিকতার একটা চরম চমক। প্রথম পাতায় আধ ইঞ্চি হরফে প্রকাণ্ড হেডলাইন: THE LINDBERGHS : IN ENGLAND : LEAVE THEM ALONE. [লিণ্ডবার্গ পরিবার : ইংল্যাণ্ডে উপনীত : তাঁদের বিরক্ত করবেন না] ব্যস্! আর কোনও খবর নেই। অতবড় হেড-লাইনের নিচে পরিপূরক কোন বিস্তারিত সংবাদ না ছেপে বার্তা-সাংবাদিক একটা নতুন রেকর্ড করলেন! ইংরাজ জাতটা নাকি আত্মকেন্দ্রিক. অ-মিশুকে, রক্ষণশীল। তা হবে। সেগুলো যে গাল নয়, প্রশংসা, তা বোঝা গেল এবার। গোটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসী সংবাদপত্রের ঐ হেডলাইনটুকু পড়ে বললে: দ্যাটস্ করেক্ট! লেট্‌স্ মাইণ্ড আওয়ার ওন বিজ্‌নেস্!

কেউ জানতেও চাইল না ওঁরা কবে রওনা হলেন, কবে পৌঁছালেন, কোথায় আছেন, কী করেন।

ওঁরা ছিলেন লণ্ডনের অনতিদূরে, কেণ্টে, 'লং বার্ন' ভিলায়। প্রতিবেশীরা জানত ওঁদের পরিচয়। গায়ে পড়ে কেউ দেখা করতে এল না। পথে-ঘাটে দেখা হলে হাসে, টুপি খোলে; বলে, সুপ্রভাত, বাড়ির সব খবর ভাল তো? কোন প্রয়োজন হলে বলবেন। আমি তো আপনার পাশের বাড়িতেই থাকি!

ব্যস্! আর কিছু নয়!

জনকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুল টীচার তাকে বললেন না, তোমার বাবাই তো সেই বিখ্যাত কর্নেল লিণ্ডবার্গ? বরং বললেন, ওয়েলকাম জন!

লিণ্ডি আর অ্যান লং বার্নের নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল ১৯৩৬ সালের প্রথম সূর্যোদয় হচ্ছে!

॥ আঠারো ॥

আবার সেই একই কথা বলতে হচ্ছে :

এটা উপন্যাস নয়, জীবনী। উপন্যাস হলে ঐ সতেরো নম্বর অধ্যায়ের নিচে আর দুটি পঙ্‌ক্তি যোগ করে দিলেই আমার ছুটির ঘণ্টা বাজত : "And they lived happily ever after."

THE END.

কিন্তু তা হবার নয়। ১৯৩৬এ আমার নায়কের বয়স চৌত্রিশ, তাঁর কর্মময় জীবনের অর্ধেক তখনও অনুত্তীর্ণ। তাই এখনই ছুটি পাবার আশা নেই আমার। প্রথমেই সেই ১৯৩৬-এর দুনিয়াটাকে একনজর চিনে নিতে হবে। পূর্ব বৎসর কিং জর্জ দ্য ফিফ্‌থ মারা গেছেন, অষ্টম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা, যদিও আনুষ্ঠানিক অভিষেক এখনও হয়নি। ইটালির ডিক্‌টেটার বেনিতো মুশোলিনী ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং লীগ অব নেশন্‌স্‌কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আবিসিনিয়ার উপর—হাইলে সেলাসি পলাতক। মুসোলিনীর এই আগ্রাসী নির্লজ্জতার প্রতি তথাকথিত মহান শক্তিশালী গণতন্ত্রী শান্তিকামী দেশগুলি উদাসীন। দজ্জাল ভাদ্দরবউয়ের কাঁচা খিস্তি শুনে ভাশুরঠাকুর যেমন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে না-শোনার ভান করেন, সেই ভঙ্গিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং লীগ অব নেশন্‌স্‌ নির্লিপ্ত! ফলে হিটলারও একধাপ এগিয়ে এল—রাইনল্যাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ন্যাশনাল স্যোসালিস্ট রাইখ্‌এর ব্লিৎস্‌ক্রীগ বাহিনী!

ব্রিটেনের টোরি প্রধানমন্ত্রী স্ট্যান্‌লি বল্ডউইনের ভাবখানা : বাইরের দিকে চোখ দেবার আমার সময় আছে নাকি? ঘরের ভিতরেই যে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে!

তা গেছে। রক্ষণশীল ইংরাজের কাছে। হবু-ইংলণ্ডেশ্বর কোন একজন বিবাহিতা আমেরিকান মহিলার সঙ্গে বড় বেশি মাখামাখি করছেন। অবিবাহিত হবু-সম্রাটের সেই বান্ধবীটির নাম: মিসেস্ ওয়ালিস্ সিম্পসন!

সিংহাসনে আরোহণ করে ২৭শে মে সম্রাট অষ্টম এড্ওয়ার্ড প্রথম রাজকীয় ব্যাঙ্কোয়েের আয়োজন করলেন। খানদানী ডিনারপার্টি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখা গেল হাজির আছেন কর্নেল ও মিসেস্ লিণ্ডবার্গ। পরদিন সংবাদপত্রে নিমন্ত্রিত অতিথিদের দীর্ঘ নামেব তালিকা প্রকাশিত হল: সর্বসস্ত্রীক বল্ডউইন, মাউণ্টব্যাটেন, উইগরাম, কুপার, লে, ব্যাটফিণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের নামের পূর্বে হয় ছাপা হয়েছে 'লর্ড', অথবা 'রাইট অনারেবল' প্রভৃতি খানদানী বিশেষণ। সেই তা-বড় তা-বড় উপাধিধারীদের হংস-মিথুনে দু-জোড়া ক্রৌঞ্চ-মিথুন: মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ লিণ্ডবার্গ এবং মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ সিম্প্সন। এদের সাদৃশ্য: তাঁরা মার্কিন দম্পতি, লর্ড-লেডি নন, নিতান্ত সাধারণ নাগরিক। বৈসাদৃশ্য: মিসেস্ লিণ্ডবার্গ আমন্ত্রিত, তাঁর স্বামীর পরিচয়ে—বংশপরিচয়ে নয়, বীরত্বের পরিচয়ে, তাঁর স্বামী ইতিমধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত। মিস্টার সিম্প্সন আমন্ত্রিত তাঁর স্ত্রীব পরিচয়ে—অতনুর কৌতুকে তাঁর সুতনুকা স্ত্রী অচিরেই বিশ্ববিখ্যাত হতে চলেছেন।

ইংলণ্ডে আসার পর প্রথম দু'মাস যেন ওঁদের জীবনে—দ্বিতীয় হনিমুন। বরং বলব—এবার মধুযামিনী আরও নিরুপদ্রব। প্রথমবার মার্কিন সাংবাদিকদের নজর এড়াতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হত—সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়া, ব্যালে-নাচের আসরে যাওয়া, প্রকাশ্যে বেড়াতে যাওয়ার সাহস ছিল না; সে-যেন অজ্ঞাতবাসে সদাশঙ্কিত পার্থ-পাঞ্চালী। এবার ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পঞ্চবটীতে ওঁরা রাঘব-জানকী—এ জনারণ্যে যেন দর্শক নেই! ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছে ওঁদের বিরক্ত করবে না—তাই

পিকাডেলি-সার্কাসের দণ্ডকবনে সহস্র দর্শকের চোখে ওঁরা দেখতে পান শুধু সরল সারঙ্গ দৃষ্টি ! কৌতুক আছে, কৌতূহল নেই !

তারপরেই ওঁদের নিরুপদ্রব জীবনের রথচক্র আবার পাক খেল

বার্লিনস্থিত মার্কিন এম্ব্যাসী থেকে মিলিটারী অ্যাটাচি মেজর টুম্যান স্মিথ হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলেন কর্নেল ও মিসেস্ লিণ্ডবার্গকে। জানালেন, জার্মান সরকারের স্তম্ভ স্বয়ং জেনারেল গোয়েরিং ওঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন জার্মানীতে বিমান-প্রকল্পের অধুনাতন আবিষ্কার দেখে যেতে। লিখলেন, General Göering has particularly exerted himself for friendly relations with the United States. From a purely American point of view, I consider that your visit here would be of high patriotic benefit. I am certain they will go out of their way to show you even more than they show us. [জেনারেল গোয়েরিঙ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ; নিছক মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি—আমার মতে আপনাদের এ ভ্রমণ উচ্চ পর্যায়ের দেশসেবার নামান্তর বলে পরিগণিত হবে। কারণ আমরা যা বুঝতে পারি না আপনি আপনার বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে তা বুঝে নেবেন। ওরা আমাদের যেটুকু দেখতে দেয়, আপনাকে নিশ্চয়ই তার অনেক বেশি দেখাবে।]

লিণ্ডবার্গ সানন্দে রাজী হলেন। না হবেন কেন ? নিমন্ত্রণ আসছে মার্কিন দূতাবাস থেকে ; মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা বলছেন তাঁর নাৎসী জার্মানী ভ্রমণ দেশসেবাই। সত্যই তো, জার্মানীর সাম্প্রতিক বিমানশক্তির অভ্যুন্নতির মূলটা জেনে বুঝে নেবার এমন সুযোগ মার্কিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর গ্রহণ করাই উচিত। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত কৌতূহলও ছিল। জেনারেল গোয়েরিং শুধু নবীন জার্মানীর অন্যতম নিয়ামক নন, তিনি একজন 'এস্-পাইলট'। যে-সময়ে স্লিম লিণ্ডি আমেরিকায় বার্নস্টর্মিং দেখিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করত

সেই আমলে গোয়েরিংও তাই করত জার্মানীতে। সেদিক থেকে ওঁরা এক গোত্রের, এক প্রবরের! তৃতীয় কথা, সে-বছর বার্লিনে অলিম্পিক হচ্ছে।

একবার নয়, বার-বার তিনবার কর্নেল লিণ্ডবার্গ জার্মানীতে গিয়েছিলেন। প্রতিবারই গোয়েরিং-এর ব্যক্তিগত উৎসাহে। লিণ্ডি জার্মান ভাষা জানতেন না, কিন্তু দো-ভাষীর সাহায্যে ওদের বড় বড় বিমানপোত নির্মাণের কারখানাগুলি ঘুরে দেখলেন। বিমান মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন—বিশেষ করে উইলী মেসার্‌স্‌মিট (Messerschmitt)-এর সঙ্গে, যাঁর নামে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে জার্মানীর Me 109 এবং Me 110 ফাইটার প্লেন তৈরী হয়। লাফ্‌তাফের (Luftwaffe) সর্বাধিনায়ক জেনারেল এরহার্ড মিল্‌চ (Erhard Milch) লিণ্ডিকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান।

আজ পিছন ফিরে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না—সরল বিশ্বাসে কর্নেল লিণ্ডবার্গ নাৎসী ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। গোয়েরিং চেয়েছিল, লিণ্ডবার্গের মাধ্যমে পশ্চিম দুনিয়াতে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে। লিণ্ডবার্গ যদি বলে—'জার্মান বিমান-বাহিনী অজেয়', তবে তার চেয়ে ভাল প্রচার আর হতে পারে না। লিণ্ডবার্গ যদি বলে, 'নাৎসী দর্শনের মধ্যে কিছু সারবস্তু আছে', তাহলে তার প্রভাব সুদূর প্রসারী। দুর্ভাগ্যবশত লিণ্ডবার্গ ফিরে এসে ঠিক ঐ জাতের কথাই বলেছিলেন!

কর্নেল লিণ্ডবার্গের অনেক জীবনীকার এজন্য লিণ্ডির 'সারল্য'কেই দায়ী করেছেন—অর্থাৎ ভদ্র ভাষায়: লিণ্ডির 'মূর্খামি'কে। কিন্তু আমার মনে হয়, জীবনীকারেরা এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় খুঁটিয়ে দেখেননি। একই সময়ে আরও একজন অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রভাব পড়েছিল কর্নেল লিণ্ডবার্গের চিন্তাধারায়। তিনি ডক্টর অ্যালেক্সি ক্যারেল।

জার্মানী থেকে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তনের সময় কর্নেল লিণ্ডবার্গ

সস্ত্রীক এসেছিলেন কোপেনহেগেন-এ ; তাঁর বন্ধু ডক্টর ক্যারেলের আমন্ত্রণে। উনিশ শ' ছত্রিশে ডক্টর ক্যারেল চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ। ১৯১২তে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের ব্যবহারে 'হার্ট অপারেশন' কিভাবে করা সম্ভব তা তিনি আমেরিকায় দেখিয়েছেন, সে-কথা আগেই বলেছি। লিণ্ডি যখন জার্মানীতে তখন ডক্টর ক্যারেল তাঁকে জানালেন, কোপেনহেগেন-এ এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত—তিনি খুশী হবেন যদি কর্নেল লিণ্ডবার্গ তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি স্বয়ং চালিয়ে দেখান। লিণ্ডবার্গ স্বীকৃত হন। নীল্‌স্ বোহ্‌র প্রমুখ বহু বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের সে সভায় উপস্থিত হওয়ার কথা।

এই প্রসঙ্গে লিণ্ডি আবার ডক্টর ক্যারেলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। এবার ঐ ডক্টর ক্যারেলের জীবন-দর্শনটা বুঝে নিতে হবে। এঁর লেখা 'ম্যান, দ্য আন্‌নোন' গ্রন্থ ঘটনার পূর্ব বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেস্ট-সেলার বই। তাতে তিনি বিবর্তনবাদের এক বিচিত্র ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগামী যুগের মানুষের স্বার্থে মানব-জাতির দুর্বল ও পঙ্গু অংশকে বাদ দেওয়ার ভিতর কোনও নৈতিক অপরাধ নেই। তাঁর ভাষায় : Those who have murdered, robbed while armed with automatic pistol or machine gun kidnapped children, despoiled the poor of their savings, misled the public on important matters, should be humanely and economically disposed of in small euthanistic institutions supplied with proper gases. A similar treatment could be advantageously applied to the insane guilty of criminal acts. Modern society should not hesitate to organize itself with reference to the normal individual. Philosophical systems and sentimental prejudices must give way before such a necessity.

[যারা খুনী, ডাকাত্‌, বিকৃত মস্তিষ্ক, অপরাধপ্রবণ—শিশু-

অপহরণকারী বা ডাকাত, অর্থাৎ যারা জনসাধারণের সর্বস্বাপহরণ করছে, মনুষ্যজাতির সেইসব কলঙ্ককে শান্ত উপায়ে খতম করে দেওয়াই কল্যাণ। মনুষ্যসমাজের এ জাতীয় কলঙ্কদের গ্যাসপ্রয়োগে খতম করে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। বিশ্বমানবের কল্যাণে এ ব্যবস্থায় যেন কোন ভ্রান্ত দর্শন, ভাবালুতা বা সংস্কার বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।]

বিচক্ষণ পাঠক সহজেই বুঝবেন, ১৯৩৫-এ লেখা এ তত্ত্বের ঠিক পরের ধাপেই আছে নাৎসীদর্শন! 'যারা দরিদ্রের সর্বস্বাপহরণ করেছে' বলতে ইহুদীদের চিহ্নিত করা, অথবা 'বিকৃত-মস্তিষ্ক, অপরাধ-প্রবণ জাতি' কথাগুলিকে সম্প্রসারণ করে 'অনার্য, কৃষ্ণকায়, এশিয়া-বাসীদের' অন্তর্ভুক্ত করা উনিশ-বিশের তফাৎ। ফলে ডক্টর ক্যারেলের থিওরি থেকে নিজের অজান্তেই যদি লিণ্ডবার্গ নাৎসীদর্শনের দিকে ঝুঁকে থাকেন তবে সেটা অবাঞ্ছনীয় হতে পারে, অপ্রত্যাশিত নয়। লিণ্ডবার্গ ইংলণ্ডে ফিরে এসে জার্মানীর বিমানশক্তির বিষয়ে যে বিবৃতি দেন, পরে জানা গেছে তা ভ্রান্ত, সেগুলি সুকৌশলী নাৎসী প্রচারের মাহাত্ম্য। বস্তুত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তিনি এসব লেখেননি। মার্কিন অ্যাম্বাসাডার কেনেডির সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আলাপ হয় ২১শে সেপ্টেম্বর এবং রাষ্ট্রদূত-মশাই কর্নেল লিণ্ডবার্গকে অনুরোধ করেন জার্মানীর বিমানশক্তি সম্বন্ধে একটি লিখিত বক্তব্য তাঁর হাতে দিতে। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই কেনেডির উদ্যোগেই হিটলার-চেম্বারলেন-মুসোলিনী এবং দালাদিয়েরের মধ্যে তখন সাময়িক সমঝোতা হয়েছিল। পরের দিন ২২শে সেপ্টেম্বর কর্নেল লিণ্ডবার্গ সেই লিখিত রিপোর্টে যা বলেন তার আক্ষরিক আংশিক অনুবাদ : "আপনার অনুরোধক্রমে গতকাল সন্ধ্যায় ইয়োরোপের সামরিক বিমানশক্তি বিষয়ে যা বলেছি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করে দিলাম :

"নিঃসন্দেহে জার্মানী এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিমানবাহিনীর অধিকারী। গত কয়েক বছরে তাদের ও-বিষয়ে উন্নতি অভূতপূর্ব—যে কোন যুগে

যে কোন দেশের তুলনায়। আমি নিশ্চিত যে, জার্মানীর বিমানশক্তি আজ ইয়োরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও বেশি।...আমার ধারণা, মানব-সভ্যতা এতবড় বিপদের সম্মুখীন ইতিপূর্বে হয়নি। জার্মানী আজ ইচ্ছে করলে লণ্ডন, প্যারিস, প্রাগ প্রভৃতিকে ধ্বংস করতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণরোধ করতে পারবে না ..

১৯৩৮-এর গ্রীষ্মকালে লণ্ডবার্ন-ভিলার লীজ শেষ হল। ঐ সময় ডক্টর অ্যালেক্সি ক্যারেল ওঁদের আমন্ত্রণ জানালেন ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে। ব্রিটানী-সাগরবেলায় একটি ভিলায় গিয়ে বসবাস করতে। লিণ্ডবার্গ সপরিবারে ফ্রান্সে চলে আসেন। এখানে কয়েক মাস ওঁরা বেশ আনন্দেই ছিলেন—লিণ্ডবার্গ, অ্যান, জন, ডক্টর এবং মিসেস ক্যারেল এবং লিণ্ডির দুই পোষা কুকুর : থর আর স্কীন।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে আবার নিমন্ত্রণ এল জার্মানী থেকে। মনে রাখা দরকার, এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার মাত্র বছর-খানেক আগেকার কথা এবং মিউনিক-চুক্তির মাত্র একপক্ষকাল পরের ঘটনা। এবারও যথারীতি নানান সংবর্ধনা, ভোজ, পরিদর্শন, সৌজন্যসাক্ষাৎ ইত্যাদি ইত্যাদির আয়োজন হল।

১১ই অক্টোবর পটস্ড্যামের এক আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভায় তিন হাজার মোমবাতির আলোয় কর্নেল এবং মিসেস্ লিণ্ডবার্গ জার্মান এয়ার-মন্ত্রকের দ্বারা আপ্যায়িত হলেন। সভার কেন্দ্রস্থলে পাশাপাশি দুটি আসন, একটিতে বসলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গ, অপরটিতে স্টেট-সেক্রেটারি জেনারেল এরহাড মিল্চ্। নৈশাহারের অবকাশে জেনারেল মিল্চ্ জনান্তিকে লিণ্ডবার্গকে জানালেন যে, দিন সাতেক পরে, ১৮ই অক্টোবর, তাঁর বড়কর্তা হেরম্যান গোয়েরিং মার্কিন দূতাবাসে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আসবেন। হেরম্যান গোয়েরিং-এর ইচ্ছা সে-সভায় লিণ্ডবার্গের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হতে। স্বভাব-

সৌজন্যে লিণ্ডবার্গ বলেন, এ তো আনন্দের কথা। মূলত আমরা দুজনেই বৈমানিক। আমি সেদিন তাঁর প্রতীক্ষা করব।

ঘটনাচক্রে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইতিমধ্যে বদল হয়েছেন। নবীন রাষ্ট্রদূত উইলসন সবে বার্লিনে এসেছেন। ১৮ই রাত্রে তাঁর আগমন উদ্দেশ্যে প্রথম ভোজসভা। ঐ দিন বিকালে জার্মান বিমান দপ্তর থেকে মার্কিন দূতাবাসে একটি টেলিফোন এল। বড়কর্তারা কেউ নেই শুনে ও-প্রান্তবাসী বললে, তাহলে একটা মেসেজ লিখে রাখুন, অ্যাম্বাসাডার ফিরে এলে তাঁকে দয়া করে মেসেজটা দেবেন: "অনুগ্রহ করে অবহিত হবেন কি যে, অদ্য রাত্রিতে রাইখ-মন্ত্রী গোয়েরিং যখন রাষ্ট্রদূতাবাসে নিমন্ত্রণ রাখতে যাবেন তখন একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হবে—জেনারেল গোয়েরিং কর্নেল লিণ্ডবার্গকে অভিনন্দন জানাতে কিছু উপহার প্রদান করবেন।"

এই সামান্য সংবাদটুকুর পিছনে যে কতবড় বিপর্যয় লুকিয়ে আছে তা কেউ তখন বুঝতে পারেনি।

ডিনার পার্টিতে সকলের শেষে এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল গোয়েরিং। প্রথমে নবাগত রাষ্ট্রদূত, তদীয় পত্নী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি এগিয়ে গেলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গের দিকে। নবীন রাষ্ট্রদূত উইলসন ঠিক তাঁর পাশে পাশে। লিণ্ডবার্গের মুখোমুখি হতেই হের গোয়েরিং-এর এডি-কং আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িয়ে ধরল একটি ভেলভেটের আসনে সুন্দর একটি মঞ্জুষা। গম্ভীর মুখে জেনারেল গোয়েরিং জার্মানভাষায় কি বলে গেলেন তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝল না লিণ্ডি; কিন্তু দেখল পরমুহূর্তেই ঐ কাঠের বাক্স থেকে একটি সোনার মেডেল তুলে নিয়ে গোয়েরিং সেটি ওর গলায় পরিয়ে দিলেন।

লিণ্ডবার্গ, মিলিটারী অ্যাটাচি ট্রুম্যান স্মিথ এবং রাষ্ট্রদূত সবিস্ময়ে দেখলেন—গোয়েরিং যে মেডেলটা ঝুলিয়ে দিলেন বিদেশীরাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকের গলায় সেটি Verdienstkrenz der Dents-

cher Adler—স্বর্ণ-ঈগলের মূর্তিখচিত একটি সার্ভিস-ক্রশ; বৈমানিকদের প্রতি দেয় সর্বোচ্চ সম্মান!

স্বাধীনদেশের নাগরিক হিসাবে জার্মান সরকারের ঐ মেডেল গ্রহণ করা উচিত কিনা বুঝে উঠতে পারেন না লিণ্ডবার্গ। তিনি জার্মান নন, নাৎসী তো ননই। চকিতে একবার তিনি তাকিয়ে দেখলেন রাষ্ট্রদূতের দিকে। রাষ্ট্রদূত প্রস্তরমূর্তি। লিণ্ডি অগত্যা ধন্যবাদ জানালেন গোয়েরিংকে।

পরে জানতে পারেন, জার্মান ভাষায় গোয়েরিং বলেছিলেন:

"মানবসভ্যতায় আকাশজয়ের ইতিহাসে আপনার অবদান, বিশেষ করে ১৯২৭-এ আপনার একক অভিযানের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপ্রধান ফুরারের নির্দেশে আমি আপনাকে স্বর্ণ-ঈগল পদকে ভূষিত করছি।"

রাষ্ট্রদূত উইলসনও পরে লিণ্ডবার্গকে চিঠিতে লিখেছিলেন: "আপনি, আমি, বা মার্কিন দূতাবাসের কেউই পূর্বমুহূর্তে জানতাম না যে, আপনাকে ঐভাবে জার্মান-পদকে সম্মানিত করা হবে। সে-অবস্থায় আমরা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। আমি আজও বিশ্বাস করি—সম্মান পদকটা প্রত্যাখ্যান না করা আপনার পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়কই হয়েছিল। প্রত্যাখ্যান করাটা আপনার পক্ষে সুরুচির পরিচায়ক হত না, এবং আমি চরম বিড়ম্বনায় পড়তাম—কারণ ঘটনাস্থল মার্কিন রাষ্ট্রদূতাবাস, এবং হের গোয়েরিং ছিলেন আমার আমন্ত্রিত প্রধান-অতিথি!"

কিন্তু সেই খণ্ড-মুহূর্তটিই কর্নেল লিণ্ডবার্গের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিল। ঐ ঘটনার তিন সপ্তাহের ভিতরেই বার্লিনে শুরু হল ব্যাপক-ভাবে ইহুদি নিধন পর্ব। লিণ্ডবার্গ তখন লিখেছিলেন, "স্বীকার করি, জার্মানীর পক্ষে ইহুদি সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠিন। কিন্তু ঐ অলৌকিক পদ্ধতিতে তার সমাধান করাটার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল?"

তখনও কিন্তু সেই পদকটি তিনি প্রত্যর্পণ করেননি।

বাস্তবিকপক্ষে সারাজীবনেই সে পদক প্রত্যাখ্যানের সুযো'
পাননি লিণ্ডি।

ট্রুম্যান স্মিথ তাঁর স্মৃতিচারণে এ প্রসঙ্গে যা লিখে গেছেন সেটু
এবার উপহার দিই : "ভোজসভায় মিসেস্ লিণ্ডবার্গ উপস্থিত হ'
পারেননি। অসুস্থতার জন্য। সে-রাত্রে যখন কর্নেল লিণ্ডবার্গে
আমি তাঁর ডেরায় পৌঁছে দিলাম তখনও মিসেস্ লিণ্ডবার্গ জে'
ছিলেন। কর্নেল আমার সামনেই তাঁর স্ত্রীকে সেই পদকটি দিলেন
কেন, কীভাবে, কার হাত থেকে পেয়েছেন তা বললেন না—নীর'
রত্নখচিত সুদৃশ্য মঞ্জুষা থেকে স্বর্ণ-ঈগলের মূর্তিলাঞ্ছিত পদকটি ধ'
পত্নীর হাতে তুলে দিলেন। মিসেস্ লিণ্ডবার্গ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—মু'
কিছুই বললেন না। হাত বাড়িয়ে পদকটা নিলেন। আমি বললুম
হের গোয়েরিং আপনার স্বামীকে সম্মানিত করেছেন ঐ পদকে–
সোনার-ঈগল!

মিসেস লিণ্ডবার্গ এতক্ষণে কথা বললেন। বলেন, "আজ্ঞে ন
ঈগল নয়—এটা অ্যাল্‌বাট্রস্।"

মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গ যে মূলত কবি, এখানেই তার পরিচয়
একটি মাত্র শব্দে তিনি অনাগত দিনের ইতিহাসকে বিস্তারিতভা'
বর্ণনা করলেন। কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর ভবিষ্যৎ মর্মযন্ত্রণা
উপর মহাকাব্য রচনা করলেন একটি মাত্র শব্দে : অ্যাল্‌বাট্রস!

অ্যানের দৃষ্টিতে স্বর্ণপদকলাঞ্ছিত কর্নেল লিণ্ডবার্গ সে রাত্রে
অ্যানসেণ্ট মেরিনার!*

* বহুপরে কর্নেল লিণ্ডবার্গ এই ঘটনাটির বিষয়ে লিখেছিলেন "The decora
tion Göering gave me that night never caused me any worry
and I doubt that it caused me much additional difficulty
It turned out to be a convenient object of attack for ou
political opposition, but if there had been no decoratio
they would have found something else. I always regarde

ফ্রান্সে ফিরে আসার পর কিছুদিনের মধ্যেই জার্মানী থেকে কর্নেল লিণ্ডবার্গ পুনরায় একটি আমন্ত্রণ পেলেন। এবার তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে স্থায়ীভাবে বার্লিনে গিয়ে থাকতে। বার্লিন শহরের নগর নৃপতি হের আলবার্ট স্পীয়ারকে নাকি আদেশ দেওয়া হয়েছে—শহরের যে কোন প্রান্তে কর্নেল লিণ্ডবার্গের পছন্দ-মত একটি বাড়ি তৈয়ারী করে দিতে। লোভনীয় প্রস্তাব—কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন এবার।

পরিবর্তে ওঁরা সিদ্ধান্তে এলেন—এবার আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, এ কথা সন্দেহাতীতরূপে বোঝা যাচ্ছে। এবং এ-কথাও নিশ্চিত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হারা-জেতা নির্ভর করবে—ভূপৃষ্ঠে নয়, সমুদ্রবক্ষে নয়, আকাশমার্গে। কর্নেল লিণ্ডবার্গের মত দক্ষ বৈমানিকের পক্ষে এসময় নিজ দেশে থাকাই বাঞ্ছনীয়। ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯ সালে, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হবার মাত্র মাস কয়েক আগে লিণ্ডি 'অ্যাকুইটানিয়া' জাহাজযোগে নিউ-ইয়র্কের পথে যাত্রা করলেন। অ্যান, তাঁর দুই পুত্র—হ্যাঁ এতদিনে তাঁর তৃতীয় সন্তানও জন্মলাভ করেছে, এবারও পুত্রসন্তান—এবং দুটি কুকুর রয়ে গেল ইউরোপে।

নিউ-ইয়র্কের জাহাজঘাটায় নেমেই কর্নেল লিণ্ডবার্গ দেখলেন কয়েক ডজন উদ্যত-ক্যামেরা প্রেস-ফটোগ্রাফার তাঁকে ছেঁকাবান করে ধরেছে। ভ্রূক্ষেপও করলেন না তিনি। তাদের 'সুপ্রভাত, স্বাগত' ইত্যাদি সম্ভাষণের জবাবে নীরব রইলেন। কদিন পরেই

the fuss about it as a sort of teapot tempest. May 31, 1955."—[সেরাত্রে গোয়েরিং আমাকে যে সম্মানপদক উপহার দেন তাতে আমি কোনদিনই বিব্রত বোধ করিনি; এবং সেজন্য যে আমার বিড়ম্বনাবৃদ্ধি হয়েছিল এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি না। রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের একটা হাতিয়াররূপে সেটি গৃহীত হয়েছিল বটে, কিন্তু ও-সম্মান না-পেলেও ওরা অন্য কোন অজুহাত খুঁজে নিতই। ব্যাপারটা আমার চোখে চিরকালই: চায়ের পেয়ালায় তুফান। ৩১শে মে ১৯৫৫।]

তাঁর ডাক এল হোয়াইট হাউস থেকে—প্রাক্‌যুদ্ধ প্রস্তুতি। 'ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কমিটি ফর অ্যায়ারোনটিক্স'-এর এক সভায় তাঁকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হল। লিণ্ডবার্গ এলেন ওয়াশিংটনে। 'মিটিং-হলে' পৌঁছে দেখলেন শত শত প্রেস-ফটোগ্রাফার। ডজন-ডজন ফ্ল্যাস বাম্বে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সভার উদ্যোক্তার দল সসম্মানে ওঁকে হাত ধরে এগিয়ে নিতে এল। কর্নেল বললেন, মাপ করবেন, মিটিঙে প্রেস-ফটোগ্রাফার থাকলে আমি থাকতে পারব না। আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি। আপনারা স্থির করুন—মিটিঙে কে থাকবে, আমি না প্রেস-ফটোগ্রাফার।

অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। সমস্ত অধিবেশনটাই ফিল্মে তোলা হবে। সরকারী ক্যামেরাম্যান পূর্বদিন নানান জায়গায় আলো ও ক্যামেরা সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু লিণ্ডবার্গও তাঁর সঙ্কল্পে দৃঢ়। শেষে প্রেসের পক্ষ থেকে একজন মাতব্বর এসে বললেন, স্যার, এ-বারের মত ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নিন। ভবিষ্যতে আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি—ওয়ার্ড অব অনার!

বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়েছিলেন লিণ্ডবার্গ : What! Do you mean to tell me that *press photographers* are talking to me about their *word of honour*? The type of men who broke through the window of a Trenton morgue to open my baby's casket and photograph its body—they talk to me of *honour*? I refuse to come to the meeting until you get them out!" [কী! আপনি আমাকে প্রেস-ফটোগ্রাফারদের 'কথার দামের' কথা শোনাতে এসেছেন? সেই লোকগুলো যারা জানালার শার্সি ভেঙে মরা-কাটা ঘরে ঢুকে আমার সন্তানের মৃতদেহের ফটো নেবার জন্যে চুরি করে বাক্স খুলেছিল—তারা আজ আমাকে 'ওয়ার্ড অব্ অনারের' কথা বলতে এসেছে! সোজা কথা শুনুন : ওদের ঘর থেকে বার করে না দিলে আমি এ অধিবেশনে যোগ দেব না।]

তাই হয়েছিল। কাকে ঠোকরানো সেই অসহায় দু-বছরের শিশুটির প্রতি যে অপমান করেছিল আমেরিকান প্রেস, তার প্রতিশোধ নিলেন এতদিনে তার পিতৃদেব। মাথা নিচু করে একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সাংবাদিকের দল। শেষ ফটোগ্রাফার বিদায় হলে কর্নেল লিণ্ডবার্গ সে ঘরে ঢুকলেন। উপায় নেই—আসন্ন যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রেস-ফটোগ্রাফারের চেয়ে সেদিন আমেরিকার অনেক বেশি প্রয়োজন কর্নেল লিণ্ডবার্গকে।

তার পরেই ওঁকে যেতে হল মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে। দুজনের সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। মাত্র পনের মিনিট কাল। দুজনেই বোধকরি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের মতের মিল হবে না। ধূর্ত রুজভেল্ট তার কোনও প্রমাণ রেখে যাননি। সরল প্রকৃতির লিণ্ডি দিনপঞ্জিকায় লিখেছিলেন : "I liked him and feel that I could get along with him well ··It is better to work together as long as we can. Yet, somehow I have a feeling that it may not be for long." [ওঁকে আমার পছন্দ হল, মনে হল আমরা মানিয়ে নিতে পারব···যতদিন হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায় ততদিনই মঙ্গল, কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হচ্ছে বেশিদিন সেটা করা যাবে না]।

এ-কথা সেদিন তাঁর কেন মনে হয়েছিল সে-কথা পরে বলছি। আপাতত বলি, ঐ সাক্ষাৎকারের পরেই তিনি মিসেস্ লিণ্ডবার্গকে তারবার্তা পাঠান আমেরিকায় ফিরে আসতে। তাঁরা সপরিবারে ফিরে এলেন। তার দু-সপ্তাহ পরেই ২রা এপ্রিল ১৯৩৯ তারিখে অর্থাৎ লিণ্ডির সেই ঐতিহাসিক অভিযানের এক যুগ পরে ওঁরা সপরিবারে উপস্থিত হলেন লং বীচের বিমানপোতাশ্রয়ে : দেখতে, মার্কিন ভূখণ্ড থেকে এয়ারমেল নিয়ে ইউরোপের দিকে উড়ে গেল একটি প্যান আমেরিকান ক্লিপার প্লেন। বিশ্ব-ইতিহাসে প্রথমবার।

২রা জুন লিণ্ডবার্গ ডায়েরিতে লিখলেন: আমেরিকায় ফিরে এলাম একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—যে প্রতিজ্ঞা ছিল আমার বাবার, আমারও তাই। বাবা আপ্রাণ লড়াই করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, আমিও তাই করব—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। আমিই তো আজ: চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ, সিনিয়ার!

॥ উনিশ ॥

লিণ্ডির বয়স এখন উনচল্লিশ। বয়স অনুপাতে তাকে একটু বুড়োটে দেখায়। দু-দশক আগে 'লিণ্ডি-স্মাইল' নামে কী একটা জিনিস ছিল না?—ওর পরিচিত মানুষেরা ভাবে। তার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল এবার আমেরিকায় ফিরে আসার পর; কারণ এবার তাকে এমন একজন মানুষের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হতে হল যে লোকটা অতলান্তিকের আকাশের দুর্জ্ঞেয় আবহাওয়ার চেয়েও রহস্যময়, যে প্রকৃতির চেয়েও ক্ষমতাবান, নিয়তির চেয়েও নির্মম। ওর সেই প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট: ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট!

লিণ্ডবার্গ এয়ার-ফোর্সের রিসার্ভ অফিসার—কর্নেল। ফলে, রুজভেল্ট শুধু রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবেই তার উপরওয়ালা নন, সেনা-বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত বলেও পদাধিকার বলে ওর 'বস্'। জুন ১৯৩৯-এ আমেরিকায় ফিরে এসে ওঁর কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল আর্নল্ড-এর কাছে যখন রিপোর্ট করলেন, তখন জেনারেল ওঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করব?

লিণ্ডবার্গের সম্মতি পেয়ে তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, ঠিক করে বল তো সত্যি তুমি কি চাও? সেনাবাহিনীতে থাকবে না সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেবে?

লিণ্ডবার্গ সেদিন সরাসরি এ প্রশ্নের জবাব দেননি। এড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রশ্নটা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে আবার আসতে হল সমর দপ্তরে। জানালেন, তিনি এয়ার-ফোর্সের রিজার্ভে থাকতে চান আপাতত। বে-সরকারী বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির পরামর্শদাতা হিসাবে। এ সময়ে তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "আমেরিকাকে

ওরা কোণঠাসা করে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলবে সেটা আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। রাজনীতিকে আমি এড়িয়ে চলতেই চাই, কিন্তু যুদ্ধের আওতা থেকে আমেরিকাকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে হয়তো রাজনীতিতে নামতে হবে।"

প্রথমেই লিণ্ডবার্গ ও রুজভেল্টের দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝে নিলে ব্যাপারটা প্রণিধান করা সহজ হবে। রুজভেল্টও চান না আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। সম্প্রতি সে দেশে 'গ্যালপ-পোল' বা গণভোট নেওয়া হয়েছে। শতকরা ৭০ জন মার্কিন নাগরিক ভোট দিয়েছে— আমেরিকা যুদ্ধ চায় না। জনমতকে অগ্রাহ্য করতে চান না ধুরন্ধর রাজনীতিক রুজভেল্ট। ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত এই—লিণ্ডবার্গ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, মুখে স্বীকার করতেন না যে, জার্মানী জিতবে, ফলে বিজিতের পক্ষ নেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। অপরপক্ষে রুজভেল্ট আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন মিত্রপক্ষ জিতবে—তাই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ না নিলেও ওদের পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করলে আখেরে আমেরিকা লাভবান হবে। দ্বিতীয় কথা, লিণ্ডবার্গ নাৎসী মতবাদের মূল কথাটা—'শক্তিমান জাতিই পৃথিবী শাসন করবে' এই তত্ত্বটা অবিশ্বাস করতেন না, রুজভেল্ট করতেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, লিণ্ডবার্গ হিটলারের আত্মজীবনী Mein Kampf পড়েননি, রুজভেল্ট শুধু পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, রীতিমত দাগ দিয়ে বারে বারে পড়েছেন! আরও একটি কথা স্মর্তব্য— ১৯৩৩ সালে, অর্থাৎ বছর দুয়েক আগে রুজভেল্টের সঙ্গে কর্নেল লিণ্ডবার্গের মতবিরোধ প্রখর হয়ে উঠেছিল একটি কারণে: সরকার ডাকবহন ব্যবস্থা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারী আওতায় আনতে চান, বেসরকারী বিমান-সংস্থার উপদেষ্টা হিসাবে লিণ্ডবার্গ জেহাদ ঘোষণা করেন। সে যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্টই জয়যুক্ত হন—'এয়ার-মেল সার্ভিস' ব্যাপারটা পুরোপুরি সরকারী আওতায় চলে আসে।

রুজভেল্ট বুঝতে পেরেছিলেন, ঐ অত্যন্ত জনপ্রিয় বৈমানিকটিই তাঁর বিরুদ্ধ ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে পড়তে পারে—এমন কি পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তিনি সুন্দর একটি কৌশল করলেন—লিণ্ডবার্গকে তাঁর শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে ফেলতে চাইলেন। সরকারী সংস্থার কর্ণধার হলে আর সরকারকে সমালোচনা করা চলে না। তাই এই বিচিত্র ব্যবস্থা।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ রুজভেল্টের ইচ্ছানুসারে সেক্রেটারী উড্‌রিং ডেকে পাঠালেন বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আর্নল্ডকে বললেন, প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা—কর্নেল লিণ্ডবার্গ মন্ত্রিসভায় যোগদান করুন। এজন্য প্রেসিডেন্ট একটি নূতন পদ সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক: 'সেক্রেটারী ফর এয়ার'—বিমান-সচিব। জেনারেল আর্নল্ডকে বলা হল—অবিলম্বে এ বিষয়ে লিণ্ডবার্গের মতামত সংগ্রহ করতে।

এখান থেকেই রহস্যের শুরু। আর সেই রহস্যের মূলটা ঠিক মত প্রণিধান করতে হলে ব্যাপারটা অত্যন্ত গভীর অভিনিবেশ দিয়ে বুঝে নিতে হবে—কেন, কি করে, কার ইচ্ছায় বা গাফিলতিতে লিণ্ডবার্গকে ঐ সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা গেল না।

জেনারেল আর্নল্ড নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন (১) প্রেসিডেন্টের মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ লিণ্ডবার্গকে বিপক্ষ শিবির থেকে স্বদলে আনা (২) লিণ্ডবার্গ বিমান দপ্তরের সচিব হলে বৈমানিক-মহলে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়বে—কারণ লিণ্ডি তাদের 'হিরো'। (৩) পৃথক 'বিমান-মন্ত্রক' হলে আর্নল্ডের পদোন্নতি হবে—'এয়ার-কোরের চীপ' থেকে 'কমাণ্ডার ইন চীফ অব এয়ার-ফোর্স'। (৪) কিন্তু যে লিণ্ডি আজও আছে তাঁর নিচে সে বসবে তাঁর উপরের ধাপে—মন্ত্রকের সচিব। (৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—যার নাকি আকাশমার্গেই চূড়ান্ত মীমাংসা হবে—প্রত্যাসন্ন; চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ এ-সময়ে মার্কিন বিমান বহরের সচিব হওয়ার অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির উপযুক্ত কর্ণধার লাভ।

তাই অবাক হয়ে যাই যখন দেখি—এতবড় সংবাদটা জানাতে জেনারেল আর্নল্ড আদৌ তড়িঘড়ি করলেন না! স্বয়ং প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করেছেন—অর্থাৎ আদেশ করেছেন—তবু আর্নল্ড কালহরণ করছেন। আর একটি কথাও স্মর্তব্য : ঠিক ঐ সময়েই মার্কিন বেতার ঘোষণা করেছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর কর্নেল লিণ্ডবার্গ 'আসন্ন বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা' নামে একটি রেডিও ব্রডকাস্ট জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করবেন। তার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে সেক্রেটারী উড্‌রিং-এর এই জরুরী আদেশ যে কতটা জরুরী তা কি জেনারেল আর্নল্ড বুঝতে পারেন না? অসম্ভব! তাহলে?

পরিবর্তে জেনারেল আর্নল্ড ডেকে পাঠালেন লেঃ কর্নেল ট্রুম্যান স্মিথকে। তাকে বললেন কর্নেল লিণ্ডবার্গের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে এবং তার মতামত জেনে আসতে। ট্রুম্যান স্মিথ লিণ্ডবার্গের অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয়, তিনিই তাকে বার্লিনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন লিণ্ডবার্গের সরকার-বিরোধী মনোভাবের পরামর্শদাতা!

স্মিথ নাকি বারকয়েক টেলিফোন করেও লিণ্ডবার্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। চব্বিশ ঘণ্টার আট-দশ ঘণ্টা এভাবেই কেটে গেল। যা হোক শেষ পর্যন্ত রাত্রে ট্রুম্যান এলেন লিণ্ডবার্গের বাসায়। ঘরে আরও কয়েকজন অতিথি ছিলেন। ট্রুম্যান একটি গোপনীয় কথা বলবার ইচ্ছা জানিয়ে লিণ্ডবার্গকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেলেন। তারপর কী হল তা জানাতে লিণ্ডবার্গের দিনলিপির একটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরা যাক "Truman and I went into the bedroom, where we could talk alone. He told me he had a message which he must deliver, *although he knew in advance what my answer would be.* [My italies N.S]. He said the administration was very much worried by my intention of speaking over the radio and opposing actively this country's entry into a European war. Smith said that if I

would not do this, a Secretariship for air would be created in the Cabinet and given to me! Truman laughed and said, 'So you see, they're worried!" [ট্রুম্যান আর আমি পাশের শয়নকক্ষে চলে এলাম, যাতে নির্জনে কথা বলা যায়। ও বললে, ও একটি বিশেষ সংবাদ জানাতে এসেছে, **যদিও সে আগেভাগেই জানে আমার জবাবটা কী-জাতের হবে** (আণ্ডার লাইন ডায়েরিতে নেই, আমার দেওয়া)। ও আরও বলল—আমি যে কাল রেডিও-তে 'টক' দেব, আমেরিকা যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে এ বিষয়ে ভাষণ দেব, সে-ব্যাপারে নাকি কর্তৃপক্ষ রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। স্মিথ বললে, আমি যদি ঐ বক্তৃতাটা না দিই তাহলে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে একটি নূতন মন্ত্রক খোলা হবে—বিমানমন্ত্রক, এবং আমাকে তার সচিব করা হবে। ট্রুম্যান হাসতে হাসতে বললে, দেখলে তো, ওরা কী ভীষণ ঘাবড়ে গেছে !]

পরদিন যথারীতি লিণ্ডবার্গ আকাশবাণী থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। বললেন, এ যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়। য়ুরোপে ওরা মারামারি কাটাকাটি করতে চায় করুক—আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকব : 'We must be as impersonal as a surgeon with his knife [অস্ত্র-চিকিৎসক যেমন নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় ছুরি চালান আমরাও তাই চালাব] অনেকের ধারণা : এই অনবদ্য পঙ্‌ক্তিটি তাঁর ভাষণে যুক্ত করেছিলেন মিসেস্ লিণ্ডবার্গ ! এমন ভাষা কাঠখোট্টা চার্লস্-এর কলম নাকি বলতে পারে না। হয়তো কথাটা মিথ্যা নয়, কারণ মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গ এ অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করেননি।

এই বেতারভাষণে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ততটা মনঃক্ষুণ্ণ হননি যতটা অপমানিত বোধ করেছিলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গের বিমান-মন্ত্রক সচিবের পদ প্রত্যাখ্যানে। আরও বড় কথা লিণ্ডবার্গ সৌজন্যের

খাতিরে এ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যানটাও ভদ্রভাবে জানালেন না! রুজভেল্ট স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি সেজন্য লিণ্ডবার্গ একান্তভাবে দায়ী নন—দায়ী তাঁর কর্মচারীরাই। প্রস্তাবটা তাঁর কাছে পেশ করা হয়েছিল রীতিমত অপমানকর ভাষায়! প্রায় ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব: তুমি যদি রেডিও-ভাষণ দেওয়া বন্ধ রাখ তবে তোমাকে একটি ভাল চাকরি দেওয়া হবে।

রুজভেল্ট লিণ্ডবার্গ দ্বৈরথ-সমরের নাটক দ্বিতীয় অঙ্কে পৌঁছালো।

ইতিমধ্যে গোয়েরিং-এর বিমানবাহিনী পোলাণ্ডকে নতজানু করেছে। পোলাণ্ড দু-টুকরো হয়ে গেছে—একভাগ গ্রাস করেছে রাশিয়ান ভালুক, বাকি মৃতদেহ ভক্ষণ করেছে, নাৎসী ঈগল!

শুধু বাইরে নয়, ঘরেও শান্তি নেই।

লিণ্ডবার্গ যে বাড়িটা লীজ নিয়েছিলেন সেই লীজটা শেষ হয়ে যাওয়ায় ওঁরা এখন আছেন এঙ্গেলউডের 'নেক্সট-ডে-হিল' ভিলায়, অর্থাৎ মিসেস্ মরোর ডেরায়। ইতিমধ্যে অ্যানের বাবা অকালে মারা গেছেন; তাঁর বিধবা বেটি মরো সংসারের কর্ত্রী। প্রকাণ্ড বড় 'ভিলা', প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন স্বর্গত রাষ্ট্রদূত। বেটি মরো মেয়ে-জামাইকে তাঁর কাছেই এনে রেখেছেন। তাঁর বড় মেয়েও ইতিমধ্যে মারা গেছে; ছোট মেয়ে কন্সটান্স বিবাহ করেছে ঐ বড় জামাইকেই—অব্রে মরগানকে। তারা দুজনেও আছে ঐ একই প্রাসাদে। মর্গান আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ ইনফরমেসনের অফিসার। মোট কথা—ঐ পরিবারের সকলেই মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। বেটি মরো, কন্সটান্স, মর্গান এবং তাদের বন্ধুবান্ধব সবাই। ফলে চার্লস লিণ্ডবার্গ এবং তাঁর স্ত্রী একটা বিপরীত মানসিকতার মধ্যে অস্বস্তি বোধ করেন। অ্যান এবং চার্লস-এর যেসব বন্ধু ছিল তারা দেখা করতে আসে—কথাবার্তায় তারা পরিষ্কার জানিয়ে দেয়—লিণ্ডির চিন্তাধারা তারা মেনে নিতে পারছে না। আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে নেমে পড়ুক এটা তারাও চায় না, কিন্তু চিন্তার জগতে তারা নিরপেক্ষ-

থাকতেও গররাজী—মনে মনে তারা সবাই মিত্রপক্ষের জয়লাভ কামনা করে। অবস্থা চরমে উঠল যেদিন অ্যান অস্বীকার করল তার মাকে সাহায্য করতে তাঁর মিশনে: ওঁরা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে কিছু টিনড খাবার, জামাকাপড় ইত্যাদি পাঠাতে চাইছিলেন। অ্যান যুক্তি দেখায়: এভাবে সাহায্য পাঠানো নিরপেক্ষ আমেরিকার পক্ষে অন্যায়। বেটি মরো রুখে উঠলেন; তুমি এবং চার্লস কী চাও? হিটলার তার নাৎসীবাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করুক? দুনিয়া থেকে ইহুদী জাতটাকে মুছে দিক? বিশ্বকে দাসজাতিতে রূপান্তরিত করুক?

অ্যান গম্ভীরভাবে বলেছিল, আমরা নিরপেক্ষ থাকতে চাই—খেলায় রেফারীর মত।

: তাই নাকি? কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম নিরপেক্ষ রেফারীর মুখে একটা বাঁশী থাকে; আর একপক্ষ 'ফাউল' করলে সে তার বাঁশীটা বাজায়—নিরপেক্ষতার ভান করে চোখ বুজে থাকে না!

সাংবাদিক হ্যারাল্ড নিকলসন এই সময়ে 'দি স্পেক্‌টেটার' কাগজে কর্নেল লিণ্ডবার্গকে কঠোর সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। নিউ ইয়র্ক 'টাইম' সেটি পুনর্মুদ্রণ করে। প্রবন্ধের শেষ পঙ্‌ক্তিটায় মর্মাহত হয়েছিলেন কর্নেল লিণ্ডবার্গ। সাংবাদিক নিকলসন লিণ্ডবার্গের থিয়োরীকে নস্যাৎ করে উপসংহারে বলেছেন: "Let us not allow this incident to blind us to the great qualities of Charles Lindbergh. He is and always will be not merely a schoolbog hero, but a school boy." [এই সব চপলতার জন্য আমরা যেন চার্লস লিণ্ডবার্গের প্রশংসনীয় গুণাবলীর কথা বিস্মৃত না হই। তিনি বর্তমানকালের এবং ভবিষ্যতের শাশ্বত কিশোর কল্পনার রাজপুত্ররূপেই বেঁচে থাকবেন, শুধু তাই নয় তিনি নিজেও ঐ কৈশোরকালকে অতিক্রম করতে পারবেন না।]

লিণ্ডবার্গের তখনও এই ধারণা যে, জার্মানীই এ যুদ্ধে জয়লাভ করবে, আমেরিকা বিজিতের সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে নিজ দেশের সর্বনাশ যেন ডেকে না আনে এ জন্যেই তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি কিন্তু প্রকাশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সরাসরি আক্রমণ করেননি। তা করতেও পারেন না, কারণ তখনও কর্নেল লিণ্ডবার্গ 'এয়ার-কোর-রিসার্ভের' অফিসার—যুদ্ধ বাধলেই তাঁকে যোগ দিতে হবে। পদাধিকারবলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সামরিক-বাহিনীর প্রধান, অর্থাৎ লিণ্ডবার্গের 'বস্'।

রেডিও-ভাষণে লিণ্ডবার্গ বললেন: "আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁরা আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার জন্য তৎপর। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুর্দশায় মর্মাহত, আবার কেউ কেউ অন্য কারণে—ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠিগত লাভের আশায় আমেরিকাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।··ঐ সব যুদ্ধবাজেরা তাঁদের মারণাস্ত্র ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব, আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবন বন্ধক রেখেও।··তারা যদি সফলকাম হন তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারে দু-একজন যুবককে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে, অথবা পঙ্গু হয়ে ফিরে আসতে হবে।"

পরদিনই বোস্টনে ত্রিশ হাজার লোকের উপস্থিতিতে 'মিত্রপক্ষ দরদী সংস্থা' নামে এক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করল। তার অন্যতম সংগঠক মিসেস্ মরো। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে একজন বিশিষ্ট বক্তা বললেন, "রক্তলোলুপ হিটলার আমাদের দরজার সামনে এসে পৌঁচেছে, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কোন কোন প্রাক্তন বন্ধু তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে চায়··কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড নতজানু হবার পর আমেরিকাকে সেই একনায়কতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এ কথা চিন্তাই করা যায় না যে তখন, সেই একচ্ছত্র অত্যাচারী শাসকদের দুনিয়ায় আমেরিকা তার নিরপেক্ষ-নীতি নিয়ে স্বাধীন জাত হিসাবে টিকে থাকতে পারবে।"

সংবাদপত্রে এ বিবৃতি পাঠ করে লিণ্ডবার্গের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। কারণ, বক্তা আর কেউ নয়—কর্নেল হেনরি ব্রেকেনরিজ! সেই অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু—যে ছিল তাঁর হারানো সন্তানের সন্ধান প্রচেষ্টায় ওঁর নিরলস পার্শ্বচর!

অস্বীকার করব না—ঐ সময়ে কর্নেল লিণ্ডবার্গের ডায়েরি পড়লে মনে হয় তিনি আন্তরিকভাবে নাৎসী জার্মানীর সমর্থক ছিলেন। যদিও কোনও বক্তৃতায়, বিবৃতিতে বা বেতার ভাষণে স্পষ্টাক্ষরে সে কথা বলেননি, এমনকি দিনপঞ্জিকার একান্ত-গোপন পৃষ্ঠাতেও সে কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখে যাননি, তবু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা যে অভিযোগ এনেছেন তার সমর্থন যেন পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতে। কর্নেল লিণ্ডবার্গ দোষেগুণে মানুষ, তাঁর গুণকীর্তন করতেই বসিনি আমরা—বরং আমরা বুঝে নিতে চাই মানুষটিকে।

দিনপঞ্জিকায় দেখাই—'ব্যাটল্ অব ব্রিটেনে'র প্রসঙ্গ একেবারেই ওঠেনি। লিণ্ডবার্গ মূলতঃ বৈজ্ঞানিক এবং ১৯৪০-৪১-এর ব্রিটেনের প্রতিরোধ 'অ্যাভিয়েশন-ইতিহাসে' একটি শাশ্বত অধ্যায়। যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক বলবে: প্রবল জার্মান লাফতাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে চার্চিলের এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ—ব্রিটিশ এয়ার-ফোর্সের মনোবল, তাদের রুখে দাঁড়ানোর স্পর্ধা বিমানযুদ্ধের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। অথচ, আশ্চর্য! লিণ্ডবার্গের দিন পঞ্জিকায় এ-বিষয়ে একটা প্রশংসার কথা নেই। শুধু তাই নয়, উল্লেখমাত্র নেই!

কারণটা কী? বৈমানিক উড্ডয়ন-শিল্প এবং বিমানযুদ্ধের বিষয়ে চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ বিশ্বইতিহাসে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি। কেমন করে তিনি এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেন—এমন কি জনান্তিক ডায়েরির পৃষ্ঠাতেও?

জবাবটা পাওয়া যায় ওঁর ভাষা খুঁটিয়ে বিচার করলে। উনি লিখছেন "It seems probable that the Germans are losing a few more planes than the English, because

they are attacking.···Also, the English save every man who jumps from his plane over England, while all the Germans who jump are naturally put in *concentration camps*" (My italies) [ইংরাজদের চেয়ে জার্মান বিমান বহরের যে বেশী প্লেন খোয়া যাচ্ছে তার একটা কারণ হয়তো এই : জার্মানী আক্রমণ করছে, ইংল্যাণ্ড আত্মরক্ষা করছে। ···তাছাড়া, ইংরাজ বৈমানিক প্যারাস্যুট-ল্যাণ্ডিং-এ নামছে স্বদেশে, তাদের প্রত্যেককেই বাঁচানো যাচ্ছে, অপরপক্ষে জার্মান বৈমানিক অবতরণ করছে শত্রুরাজ্যে—তার স্থান হচ্ছে 'কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে'।]

সমস্ত যুক্তিটাতেই একদেশদর্শিতার নিদর্শন। শুধু তাই নয়, শেষ শব্দটার ব্যবহারেও ওঁর মানসিকতার পরিচয়। 'কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্প' শব্দটায় আমরা সচরাচর বুঝি জার্মান বন্দীশিবির : Auschwitz, Belsen, Buchenwald প্রভৃতি তথাকথিত বন্দী-আবাস, যেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের প্রতিদিন গ্যাস-চেম্বারে পাঠাচ্ছে আইকম্যান প্রমুখ নাৎসী কর্মকর্তারা। অপরপক্ষে 'ফার্ম হল', 'গ্রিসডেল হল' প্রভৃতি বন্দী-আবাসে ব্রিটিশ সমর দপ্তর বন্দীদের রেখেছিল জেনিভা চুক্তি হিসাবে P. O. W. রূপে। লিণ্ডবার্গ সেই বন্দী শিবিরগুলিকেই ডায়েরিতে বলেছেন 'কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্প'; অথচ বেলসেন প্রভৃতি সত্যিকারের কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পকে বলেছে 'নাৎসী প্রিজন্ ক্যাম্পস্'।

* * *

১৯৪০-এর শরৎকালে মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গ দু-দুবার জননী হলেন! না—যমজ সন্তান নয় ; একটি কন্যাসন্তান—প্রথম কন্যা, এবং দ্বিতীয়টি একটি গ্রন্থ : The Wave of the future। রুজভেল্টপন্থীদের পত্রিকায় তার কঠোর সমালোচনা বার হল। রুজভেল্টের কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের অন্তর্বিভাগীয় সেক্রেটারী হ্যারল্ড আইক্‌স্ সমালোচনায় লিখলেন "দ্য ওয়েভ অব দ্য ফিউচার হচ্ছে আমেরিকার একটি বিশেষ

শ্রেণীভুক্ত চিন্তাশীলদের বাইবেল—তারা হচ্ছে আমেরিকান-নাৎসী, ফ্যাসিস্ট মার্কিন-ডাকাত !”

কিন্তু ইতিমধ্যে কর্নেল লিণ্ডবার্গের একদল সমর্থক জুটে গেল। ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছিল আর একটি সংস্থা; ‘আমেরিকা ফার্স্ট কমিটি’—যাদের মূলমন্ত্র: এ বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমেরিকাই প্রধান, তাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে, কোনক্রমেই আমেরিকা যাতে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে তাই তাদের দেখতে হবে। “মিত্রপক্ষ দরদী-সংস্থার” বিরোধী দল হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বেই কাজ করে যাচ্ছিল; সস্ত্রীক চার্লস লিণ্ডবার্গ ঐ সংস্থায় যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তার সভ্যসংখ্যা তিন লক্ষ থেকে আট লক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। রুজভেল্ট চিন্তিত হলেন—অসামান্য জনপ্রিয় কর্নেল চার্লস লিণ্ডবার্গ যে তিল তিল করে তাঁর জনপ্রিয়তার বনিয়াদটাই ধসিয়ে ফেলতে চাইছেন তা বুঝতে পারলেন ধুরন্ধর রাজনীতিক রুজভেল্ট। তিনি সংকল্প করলেন লিণ্ডবার্গকে শেষ করতে হবে।

এবং সেটা তিনি করলেন নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে !

২৫শে এপ্রিল ১৯৪১। তার দুদিন আগে লিণ্ডবার্গ মানহাট্টান সেণ্টারে জ্বালাময়ী ভাষায় রুজভেল্ট-নীতিকে সমালোচনা করছেন। ঐ দিন প্রেস কনফারেন্সে একজন সাংবাদিক প্রেসিডেণ্টকে প্রশ্ন করলেন, “প্রেসিডেন্ট কি অনুগ্রহ করে জানাবেন—কর্নেল লিণ্ডবার্গ, যিনি একজন রিসার্ভ অফিসার, তাঁকে কেন সামরিক বাহিনীতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে ডাকা হচ্ছে না ?

জবাবে প্রেসিডেণ্ট বললেন, “আমেরিকার ইতিহাস খুঁজে দেখবেন —বিগত যুগে অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বাধীনতাকামীরা একজাতের বিশ্বাসঘাতককে যুদ্ধ করতে ডাকেনি, তাদের বলে “Vallandigham”! সে সময় টমাস পেইন্ ঐ ‘ভ্যালাণ্ডিঘাম’দের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন তা পড়ে দেখতে পারেন।”

যেন তৈরী জবাব। সাংবাদিকেরা তৎক্ষণাৎ দৌড়ালো লাই-

ব্রেরীতে। 'ভ্যালাণ্ডিঘাম'দের ইতিহাস কী? কে তারা? পেইন্ কী বলেছিলেন তাদের সম্বন্ধে? পরদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সে তথ্য—প্রেসিডেণ্টের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে।

সেনেটর ক্লিমেণ্ট ভ্যালাণ্ডিঘাম জর্জ ওয়াশিংটনকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে, তাঁর বক্তব্য ছিল: ইংরাজ অজেয় (এখন যেমন লিণ্ডবার্গ মনে করছেন হিটলার অজেয়)। ওয়াশিংটন স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিশ্বাসঘাতক ভ্যালাণ্ডিঘাম-এর বিচার হয়। চিন্তানায়ক টম পেইন্ তাকে বলেছিলেন "কপারহেড"। কপারহেড এক জাতের বিষাক্ত সাপ!

ফলে পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রের শিরোনামায় ছাপা হল: "PRESIDENT CALLS LINDY A COPPERHEAD"
[প্রেসিডেণ্ট বলেছেন—লিণ্ডি বিষাক্ত সাপ!]

আটচল্লিশ ঘণ্টা কর্নেল লিণ্ডি ঘর ছেড়ে বের হলেন না। কারও সঙ্গে কথাবার্তা, দেখাসাক্ষাৎ করলেন না। তারপর মনস্থির করলেন। ২৭শে এপ্রিল রাত্রে তিনি একটি চিঠি লিখলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে। তার আক্ষরিক অনুবাদ:

"মাই ডিয়ার মিস্টার প্রেসিডেণ্ট,

২৫শে এপ্রিল হোয়াইট-হাউস প্রেস কন্‌ফারেন্সে ইউ. এস. এর আর্মি এয়ার-কোরে আমার রিজার্ভ কমিশন সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য আমাকে অত্যন্ত আহত করেছে। আমার ধারণা ছিল: স্বাধীন নাগরিক হিসাবে শান্তির সময়ে আমার বক্তব্য স্বদেশবাসীর কাছে রাখবার অধিকার আমার আছে; তাতে যুদ্ধের সময়ে বৈমানিক অফিসার হিসাবে দেশকে সেবা করার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

কিন্তু আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে এবং সামরিক-বাহিনীর প্রধানরূপে বলেছেন যে, রিজার্ভ-অফিসার হিসাবে আমেরিকা আমাকে চায় না; তা ছাড়াও আমার প্রেসিডেণ্ট এবং উপরওয়ালা হিসাবে আপনি আমার সততা, দেশপ্রেম, চরিত্রের প্রতি

যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে আমি দ্বিতীয় কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। অর্থাৎ বাধ্য হয়ে আমি ইউ. এস. আর্মি এয়ার-কোরের 'কর্নেল' পদ থেকে অব্যাহতি চাইছি। এটি বস্তুত আমার পদত্যাগ পত্র। জীবনে আমি যে কটি জিনিসকে মূল্যবান মনে করতাম—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৈমানিক হিসাবে সেবা করার অধিকার তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল আমার, তাই এ পদত্যাগে বাধ্য হওয়ায় আমি মর্মাহত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ নয়, এ ছিল আমার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মুক্ত মার্কিন নাগরিক হিসাবে চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতা।

সাধারণ নাগরিক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেবা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে সশ্রদ্ধ বিদায় নিচ্ছি :

রেস্পেক্টফুলি, চার্লস্ অ লিণ্ডবার্গ।"

সেন্টিমেণ্টাল চিঠি। সংবাদপত্র জগৎ কিন্তু সমর্থন করল প্রেসিডেন্টকেই। লিণ্ডির এক বাজি হার হল। নিউইয়র্ক টাইমস্ সম্পাদকীয় লিখল—"গত শুক্রবার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্নেল লিণ্ডবার্গ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছেন তা অবাঞ্ছনীয় ·মিস্টার এখন আর তিনি কর্নেল নন, তাই মিস্টার লিণ্ডবার্গের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সেনেটার ভ্যালাণ্ডিঘামের তুলনা করার কোনও যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাইনি। Nor is any American, from private to general officer, in service or in reserve, big enough to take the position that he will not serve his country because he has been, as he belives, unjustly reprimanded by his Commander-in-Chief or any other superior." [অপরপক্ষে কোন আমেরিকান—যে সামরিক অথবা বেসামরিক যাই হোক, 'অ্যাক্টিভ সার্ভিসে' থাকুন অথবা 'রিজার্ভেই' থাকুক নিজেকে এতবড় ভাবতে পারে না যাতে তার সামরিক বড়কর্তা বা কমাণ্ডার-ইন-চীফ ধমক দিলে—হোক তার

উইলিয়াম বুলিট লিখলেন: হিটলারের স্বর্ণ ঈগল মেডেল পাওয়া 'নাইট' বলতে চান, আমরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে সাহায্য করব না; 'শান্তি' আমাদের কিনতেই হয়। দাম যদি 'দাসত্ব' দিয়ে দিতে হয় তাতেই সই! হিটলারের ঐ তাঁবেদারের মনে রাখা উচিত তাঁর জন্মগ্রহণের বহু পূর্বেই আমেরিকায় একটা জিনিস জন্মেছিল। তার নাম: স্বাধীনতা!

লিণ্ডবার্গের প্রাক্তন বন্ধু অভিন্নহৃদয় কর্নেল হেনরী ব্রেকেনরিজ লিখলেন: "নরওয়ের আছে কুইস্‌লিং। ফ্রান্সের আছে লাভাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার বিশ্বাসঘাতককে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে। হিটলারের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই ভদ্রলোক সম্প্রতি জানিয়েছেন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না!"

ঐ সময় থেকেই সরকারী গোয়েন্দা-সংস্থা এফ. বি. আই. মিস্টার লিণ্ডবার্গকে নজরবন্দী করে রাখে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লেখা হতে থাকে গোয়েন্দার ডায়েরিতে। তাঁর টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়। লিণ্ডবার্গ তা জানতেন না, জানলেও হয়তো ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি তখন রুজভেল্টের বিরুদ্ধে প্রায় প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন—অন্তত রুজভেল্টের নীতির বিরুদ্ধে।

রুজভেল্ট অত্যন্ত বিচলিত! কীভাবে ঐ পাগলকে রোখা যায়? ইতিহাস বলে—টমাস বেকেটের অবিমৃষ্যকারিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইংলণ্ডেশ্বর একবার চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন। আমার পার্শ্বচরদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমাকে ঐ লোকটার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে? শ্রবণমাত্র এগিয়ে এসেছিলেন ইংলণ্ডেশ্বরের চারজন নাইট।

এবারও তাই হল। 'সেক্রেটারী অব দ্য ইন্টিরিয়ার' হ্যারল্ড আইক্‌স্ গোপনে রুজভেল্টকে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি দেখছি!'

॥ কুড়ি ॥

হ্যারল্ড আইক্‌স্ অতি ধুরন্ধর রাজনীতিক।

ইতিপূর্বেই ফ্র্যাঙ্ক রুজভেল্টের এক সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেছে সে—ক্লীন নক-আউট! 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড'-এর লেখক অতি জনপ্রিয় ওয়েণ্ডেল উইল্‌কিকে। তাই রুজভেল্টের বিশ্বাস ছিল এবারও আইক্‌স্ সাফল্যমণ্ডিত হবে। তিনি আইক্‌স্‌কে খোলা চেক লিখে দিলেন।

হ্যারল্ড আইক্‌স্ বুঝে নিয়েছিল—লিণ্ডির পতন হবে তাকে উত্ত্যক্ত করে তুলতে পারলে। লোকটার আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর—ঐটাই তার দুর্বলতম স্থান—অ্যাকিলিস্-এর গোড়ালি! সেখানে আঘাত লাগাতেই সে প্রথম বাজি হার স্বীকার করেছে—পদত্যাগ করেছে। ক্রমাগত ঐ দুর্বলস্থানে আঘাত করতে থাকলে লোকটা আবার ভ্রান্ত পদক্ষেপ করবে, এবং তখনই তাকে 'নক্-আউট' করতে হবে!

হলও ঠিক তাই!

আইক্‌স্-এর প্ররোচনায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিণ্ডবার্গের নামে কুৎসা রটনা হতে থাকে। লোকটা মদ খায় না, 'ম'-কারান্ত অন্য দোষ নেই, প্রখর আত্মাভিমানী, মাথা খাড়া করে চলতে অভ্যস্ত! ফলে, নানারকম কুৎসা রটনা করলেই লোকটা ক্ষিপ্ত হয়ে বেমক্কা বেচাল কিছু করে বসবে। আইকস্-এর সাংবাদিকরা তাদের প্রবন্ধে লিণ্ডবার্গকে কখনও স্বনামে উল্লেখ করে না। করে নানান বিশেষণে: The Knight of the German Eagle, Mr. Quisling, Mr. Copperhead, ইত্যাদি! শেষ পর্যন্ত সে যা চাইছিল তাই ঘটল। ১৬ই জুলাই ১৯৪১ লিণ্ডবার্গ একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখল মার্কিন প্রেসিডেন্টকে!

"মাই ডিয়ার মিস্টার প্রেসিডেন্ট: আপনাকে এ পত্র লিখছি স্বাধীন মার্কিন নাগরিক হিসাবে। লিখছি, আপনার মন্ত্রিমণ্ডলীর আভ্যন্তরিণ মন্ত্রকের সচিবের প্রসঙ্গে।

"আপনার ঐ সচিব কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত প্রচার করে যাচ্ছেন যে, আমি একটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত ১৯৩৮ সালে জার্মান সরকার আমাকে যে পদক দান করেন সেজন্যই আমাকে তিনি অভিযুক্ত করছেন।

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনাকে কি আমি এ অনুরোধ করতে পারি যে, আপনার ঐ সচিবকে জানিয়ে দেবেন—আমি ঐ পদক গ্রহণ করেছিলাম মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে, তাঁরই আবাসে এবং পরে তিনি আমার এ পদক গ্রহণ কার্যটি লিখিতভাবে সমর্থনও করেছেন? আমি জার্মানীতে গিয়েছিলাম সেই রাষ্ট্রদূতের দ্বারাই আমন্ত্রিত হয়ে—মার্কিন বিমান বিশেষজ্ঞ হিসাবে জার্মান বিমান শক্তির মূল্যায়ন করতে?

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার সচিব ক্রমাগত অভিযোগ আনছেন যে, আমি একটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তা যদি সত্য হয় তাহলে আমেরিকার সাধারণ মানুষের অধিকার আছে সে কথা জানবার।…এমন সম্ভাবনায় যদি আপনার বিশ্বাস থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে আপনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করুন। আমি আমার যাবতীয় ফাইল, কাগজপত্র সেই কমিটির সামনে উপস্থিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু তা যদি না করা হয়, তাহলে এভাবে অযথা দুর্নাম প্রচার ও গালাগাল করা থেকে আপনি আপনার ঐ সচিবকে বিরত থাকতে বলবেন কি?

ইতি—শ্রদ্ধাবনম্র চার্লস. এ. লিণ্ডবার্গ।"

ফাঁদে পা দিলেন লিণ্ডবার্গ!

প্রথমত মার্কিন প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখাটাই উচিত হয়নি। উনি আইক্‌স্‌কে লিখতে পারতেন, সংবাদপত্রে 'লেটার্স টু দি এডিটার'

লিখতে পারতেন, সচিবের উদ্দেশে কাগজে 'খোলা চিঠি'ও লিখতে পারতেন। পরিবর্তে তিনি যা করলেন তা নিতান্ত ছেলেমানুষী : চিঠিখানা ডাকে দিয়েই তার একটি কপি পাঠিয়েছিলেন সংবাদপত্রে। এটা আইনবিরুদ্ধ! মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ঐ চিঠিখানা পৌছানোর পূর্বেই তা সংবাদপত্রে ছাপা হল। ফলে ঐ পত্রের একটি রূঢ় জবাব পেলেন লিণ্ডবার্গ। প্রেসিডেন্ট নন, লিখছেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব!

"জুলাই ১৯, ১৯৪১।

"প্রিয় মিস্টার লিণ্ডবার্গ . ষোলোই জুলাই তারিখে লেখা আপনার চিঠি হোয়াইট হাউসে পৌছায় আঠারই তারিখে সকাল এগারোটা বাইশ মিনিটে। অবশ্য তার আগের দিনের সংবাদপত্রেই আপনার চিঠি সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল।

"গতকালই সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়—প্রেসিডেন্ট ঐ চিঠি পাঠ করে কী বুঝছেন। তাদের আমি বলেছিলাম, চিঠির মাথায় প্রেসিডেন্টের নাম থাকলেও বস্তুত ওটি 'প্রেস'-এর জন্য লেখা। প্রেসিডেন্টকে জবাব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

"প্রেসিডেন্টের তরফে আপনাকে যে জবাব লিখছি এটি অবশ্য আমরা প্রেসে পাঠাচ্ছি না, কারণ এ চিঠি 'প্রেস'কে লেখা নয়, আপনাকেই লেখা। তাই চিরাচরিত ভদ্রতার নির্দেশে আপনার অনুমতি ছাড়া এ পত্র প্রেসে পাঠানো হবে না।

"ভেরি সিন্সিয়ার্লি য়োর্স,

স্টিফেন আর্লি, প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারী।"

ফলে, আর এক বাজি হার হল লিণ্ডির।

আমেরিকা যুদ্ধ চায় না, চাইছে না, অধিকাংশ লোকই সে-হিসাবে লিণ্ডির পক্ষে—কিন্তু পাকেচক্রে বারে বারে অপদস্ত হচ্ছে সে। একটি ঘটনার কথা বলি :

নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর এক সংবাদদাতা লিখছে: সেদিন লাফায়েৎ হোটেলে ডিনাররুমে খেতে খেতে নজর হল সামনের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড ছবি ছিল, সেটা নেই। কী ছবি ছিল যেন? হঠাৎ মনে পড়ল ১৯২৭ সালে লিণ্ডবার্গ অর্টেগ প্রাইজ পাচ্ছেন! ছবিটি কেন অপসারিত হল জানতে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং অর্টেগ-সাহেবের দ্বারস্থ হতে হল। উনি বললেন, "ওটা যখন টাঙিয়েছিলাম তখন লিণ্ডি ছিল একজন বৈমানিক—গোটা আমেরিকার হিরো! আজ সে একজন রাজনীতিক। ছবিটা থাকলেই দেখেছি ভোজনকক্ষে নানান জাতের তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়! তাই ওটা সরিয়ে ফেলেছি! বুঝলেন না, লিণ্ডি যতই বলুক—আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেই। আর তখনই ও বুঝতে পারবে নিজের ভুলটা।"

ঘটলও তাই। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১—জাপান আক্রমণ করল পার্ল হারবার! তৎক্ষণাৎ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

*　　　　　　　*

এ এমনই একটা জাতীয় সংকটের মুহূর্ত যখন রাজনীতিকেরা তাদের ছোটখাটো দ্বন্দ্ব, মতভেদ, ক্ষুদ্রতা ভুলে যায়। যুধিষ্ঠিরের ভাষায়: সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত / তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তরশত // সকলেই আশা করেছিল, লিণ্ডি-রুজভেল্ট বিরোধ এমন একটা চরম মুহূর্তে মিটে যাবে।

গেল না! তার জন্য দুজনেই দায়ী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এ-কথা শোনামাত্র স্লিম লিণ্ডি যদি সেই সংবাদপত্র হাতে ছুটে যেত নিকটতম রিক্রুটিং সেণ্টারে, বলত '—আমি যুদ্ধে নাম লেখাতে চাই!' তাহলে ঘটনা নিশ্চয়ই অন্য খাতে বইত। কোন রিক্রুটিং অফিসারের ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে, সাধারণ সৈনিক হিসাবে নাম লেখাতে গেলে চার্লস অগস্টাস্‌ লিণ্ডবার্গকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে; করবার

কোনও যুক্তিও নেই। এবং তা হলে হিসাবে দেখা যেত সামরিক-বিভাগের উচ্চতম অফিসারের ঘাড়েও ঐ একটাই মাথা! স্লিম লিণ্ডবার্গকে সাধারণ এয়ার-ক্যাডার হিসাবে লেফ্‌ট্-রাইট করানো, মাল বহানো, বা হ্যাঙ্গারে কলকব্জা মেরামত করানোর কাজে ব্যাপৃত রাখা যেত না। প্রাক্তন কর্নেল ফিরে পেতেন তাঁর কাঁধের তারকা-গুচ্ছ—খুঁজে পেতেন নিজের ঠাঁই, সামরিক বিমান দপ্তরে।

চার্লস লিণ্ডবার্গ তা করেননি। একপক্ষকাল ধরে তিনি শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন—সেই প্রেসিডেণ্ট-বিরোধী 'আমেরিকা-ফার্স্ট সোসাইটির' কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে। তারপর তিনি মস্ত এক চিঠি লিখলেন তাঁর প্রাক্তন-বস বিমান-বাহিনীর জেনারেল আর্নল্ডকে; লিখলেন—যেহেতু আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তাই তিনি বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে চান। ২০শে ডিসেম্বর এ-চিঠি পাঠিয়ে পাক্কা দশ দিন অপেক্ষা করলেন। চিঠির জবাব নেই। ৩০শে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল খবরটা—গোটা আমেরিকা জানল: প্রাক্তন-কর্নেল চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ও-পক্ষ নীরব!

আরও দিন-দশেক অপেক্ষা করলেন লিণ্ডবার্গ, তারপর তিতিবিরক্ত হয়ে জেনারেলকে ফোন করলেন ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪২ তারিখে। ফোন ধরল মেজর বীবি; বললে—কেন বলুন তো? কী প্রয়োজনে আপনি জেনারেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চান?

ওর নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে লিণ্ডবার্গ বুঝতে পারেন, ভিতরে গণ্ডগোল আছে—এভাবে ফোনে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ হতে কখনও বাধা পাননি জীবনে। বস্তুত বিমান ইতিহাসে জেনারেল আর্নল্ড একজন অখ্যাত ব্যক্তি, চার্লস. এ. লিণ্ডবার্গ স্বনামধন্য। তিনি বললেন, বিমান-দপ্তরে যোগদানের জন্য দিন কুড়ি আগে আমি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম জেনারেলকে, জবাব পাইনি—সে বিষয়েই কথা বলতে চাই।

তৎক্ষণাৎ জবাব : এ বিষয়ে আপনি 'সেক্রেটারী অব ওয়ার'এর সঙ্গে বরং কথা বলুন।

'সেক্রেটারী অব ওয়ার' হেনরি এল. স্টিমসন একজন স্বনামখ্যাত রাজনীতিক। এঁর কথা আমার পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'বিশ্বাসঘাতকে' বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশ্বাসভাজন দক্ষ অফিসার। অতঃপর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই লিণ্ডবার্গ ছুটলেন ওয়াশিংটনে।

বেচারী লিণ্ডবার্গ। সে জানত না ইতিমধ্যে গোপনে অনেক কিছু ঘটে গেছে।

৩০শে ডিসেম্বর—অর্থাৎ যেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, লিণ্ডবার্গ সামরিক বিমান সংস্থায় দরখাস্ত করে জবাবের প্রতীক্ষা করছে—সেইদিনই হ্যারল্ড আইক্স্ রুজভেল্টকে একটি গোপন পত্র পাঠিয়েছিল :

"মাই ডিয়ার মিস্টার প্রেসিডেন্ট : কাগজে দেখলাম লিণ্ডবার্গ বিমান-দপ্তরে কাজের জন্য দরখাস্ত করেছে। আমার পরামর্শ : এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হোক।

"তার কাগজপত্র বিচার করে দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি—সে ফ্যাসিস্ট, ক্ষমতা হাত করতে চায়, সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এবং সেজন্যই তার কিছু জঙ্গী-খেতাবের দরকার। একটু বুঝিয়ে বলি :

"ইতিহাসচর্চা করলে দেখা যায়, দুনিয়ার একনায়ক মাত্রেরই আছে কোন জঙ্গী-ইতিহাস। মুসোলিনী একজন জঙ্গী মানুষ, কামালপাশাও তাই, পিলসুডস্কি, হর্থি প্রভৃতির আছে জঙ্গী ইতিহাস। বলাবাহুল্য হিটলারও তাই। সুতরাং হিটলার-মুসোলিনী-কামাল-পাশার এই উত্তরসূরীও চাইছে কিছু জঙ্গীসম্মান! আমি আন্তরিক-ভাবে বিশ্বাস করি, আপনি তাকে সে সুযোগ দেবেন না—ঐ অস্থি-মজ্জায় মেশানো ফ্যাসিস্টের গায়ে চড়তে দেবেন না মার্কিন তারকা-চিহ্নিত কোনও পোশাক।

He should be buried in merciful oblivion [বিস্মরণের কবরের তলায় তাকে শান্তিতে শুয়ে থাকতে দিন] শ্রদ্ধাবনম্র ইতি হ্যারল্ড আইক্‌স্!"

রুজভেল্ট এই চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সমর-সচিব হেনরি স্টিমসনের কাছে, জানিয়েছিলেন : এ বিষয়ে আমি হ্যারল্ড আইক্‌স্-এর সঙ্গে একমত।

ফলে লিণ্ডবার্গ যখন এসে উপস্থিত হলেন সমর সচিবের কাছে তার পূর্বেই তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ সমর-সচিব অবশ্য খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন। পুরোনো দিনের গল্প শোনালেন, কফি খাওয়ালেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জানাতে হল যে, সমর বিভাগে চার্লস অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গের ঠাঁই হবে না!

লিণ্ডবার্গ ফিরে এলেন নিজের ডেরায়। এত বড় অপমান কল্পনাতীত! কী হীন ওরা! কাগজে-কলমে প্রমাণ করতে চায়—লিণ্ডবার্গ = ভ্যালাণ্ডিঘাম = কপারহেড = বিশ্বাসঘাতক!!

তখনও জানেন না—ওদের আঘাতটা আরও বড় জাতের—'বিলো দ্য বেল্ট!' সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হবার পর দুদিন উনি ঘর থেকে বার হননি। তারপর এল টেলিফোন—প্যান আমেরিকান থেকে, ইউনাইটেড এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্ থেকে, কার্টিস-রাইট থেকে! ওরা সবাই জানালো—কাগজে দেখলাম, আপনি সামরিক বিভাগে যোগদান করছেন না—তাহলে আমাদের উপদেষ্টা হয়ে কাজে যোগদান দেবেন কি?

হাসি ফুটল লিণ্ডবার্গের মুখে—তিনি রাজনীতিবিদ নন—তিনি টেক্‌নিশিয়ান। ভোটে হেরে যাবার পর তাঁর পিতৃদেবের মুখের উপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর দরজা—বিকল্প কোন পথ জানা ছিল না তার। স্লিম লিণ্ডির ক্ষেত্রে তা হবে না। রাজনীতি ছাড়াও তার আর একটা হাতিয়ার আছে—সে দক্ষ বৈমানিক, বিশ্রুতকীর্তি মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, এয়ারোনটিক্স-বিজ্ঞান সে গুলে খেয়েছে। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা—বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে!

হায়রে বৈজ্ঞানিকের অভিমান! হায়রে বিদ্বানের সান্ত্বনা! কোন দেশে, কোন যুগে তুমি রাজার উপরে উঠেছ? দেশের রাজার কাছে ছাড়পত্র পেলে তবেই না তোমার পূজার আয়োজন? রাজা চাইলে ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়, গ্যালিলিওকে নতজানু হতে হয়, আইনস্টাইনকে দেশান্তরী হতে হয়—তুমি কে হে হরিদাস পাল, এয়ারোনটিক্স বিজ্ঞানের অভিমান নিয়ে রাজার সঙ্গে টেক্কা দিতে চাইছ?

একান্তবাসী লিণ্ডবার্গ এসে দেখা করলেন ওঁদের সঙ্গে—প্যান আমেরিকান এরারওয়েজের জোয়ান ট্রিপ, ইউনাইটেড এয়ার-ক্র্যাফট্ আর কার্টিস-রাইট কোম্পানির বড়কর্তার সঙ্গে। সকলেই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন: সরি! ভিতরের কথাটা জানতাম না স্যার; তাই কষ্ট দিলাম!

: মানে? কী ভিতরের কথা?—অবাক হয়ে জানতে চান লিণ্ডবার্গ।

: আপনাকে আমরা ডেকেছি এ খবর পেয়ে আমাদের উপর থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে! মানে—ইয়ে, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে এলে সরকারি অর্ডার পাব না!

: উপর থেকে মানে? কে বলছে একথা?

: মাপ করবেন, নামটা কেমন করে বলি?

অর্থাৎ কোনও আমলাকুলচূড়ামণি, কোনও কংগ্রেসের হর্তাকর্তা, কোনও সেনেটের হোমরা-চোমরা। আভাসে ইঙ্গিতে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন বড়কর্তার ইচ্ছাটা।

: কিন্তু আপনারা যে আমাকে ডেকেছেন তা ওরা জানল কী ভাবে?

: তা কেমন করে জানব? হয়তো আপনার টেলিফোন ট্যাপ হচ্ছে!

রাগে-দুঃখে-অপমানে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে লিণ্ডির

কিন্তু না! তিমির উপরে আছে তিমিঙ্গিল—রাজাই কোন শেষ কথা নয়! ঘরে-বাইরে যখন আর মুখ দেখাবার ঠাঁই নেই তখন অমন একটি তিমিঙ্গিলই টেলিগ্রাম পাঠালেন লিণ্ডিকে: অবিলম্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আমার প্রতিষ্ঠান তোমাকে চাইছে!

কোন আমলাকুলচূড়ামণি 'কাঠের ঘোড়ো', কংগ্রেসের হর্তাকর্তা কিংবা সেনেটের হোমরা-চোমরার হিম্মৎ হল না তাঁকে গিয়ে বলে: কাজটা ভাল করছেন না স্যার, বড়কর্তা বিরক্ত হবেন!

কারণ সবাই জানত—তিনি থোড়াই কেয়ার করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্ক রুজভেল্টকে। বরং রুজভেল্টের মন্ত্রিসভাই তটস্থ—ভদ্রলোক না চটে যান!

সেই অসীম প্রভাবশালী ভদ্রলোকের নাম: হেনরি ফোর্ড!

১৯২৭ থেকেই দুজনে দুজনকে চেনেন, ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। লিণ্ডির মুখের সামনে সরকারী বে-সরকারী দরজাগুলি কী-ভাবে একে একে বন্ধ হয়ে গেছে তা তিনি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন—ধনকুবেরের নিজস্ব চরবাহিনী আছে—তাই তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন চার্লস লিণ্ডবার্গকে। লক্ষ লক্ষ মোটরগাড়ি তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীময়, কোটি কোটি ডলার খাটছে তাঁর ব্যবসায়ে—এখন স্থির করেছেন: মোটরগাড়ি নয়, বিমান তৈরী করতে হবে। তাঁর প্রয়োজন এয়ারোনটিক্স-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাই এই তারবার্তা।

হেনরি ফোর্ড আর চার্লস লিণ্ডবার্গ। দুজনের চরিত্রে অনেক মিল আছে কিন্তু—দুজনেই ধূমপান করেন না, মদ্যপান করেন না, নিয়মানুবর্তিতাকে কঠোরভাবে মেনে চলেন এবং দুজনেই চরম একরোখা, একগুঁয়ে। প্রথম সাক্ষাতেই লিণ্ডবার্গ বললেন, শুনেছি আপনি নাকি জীবনে কখনও প্লেনে চাপেন নি? এ কথা সত্য?

মিতভাষ হেনরি ফোর্ড বললেন: সত্য!

মিতভাষ লিণ্ডি বললেন: কেন?

এবার হাসলেন। অনেকগুলি কথা একসঙ্গে বলে ফেললেন: তার তুটি কারণ। প্রথম: আমি মোটরগাড়ি বানাই—তা আকাশে ওড়ে না—

লিণ্ডি বলেন, ও যুক্তি এখন টেকসই নয়। এখন আপনি প্লেন বানাতে চলেছেন। দ্বিতীয় কারণটা—?

মিটিমিটি হাসছেন ফোর্ড: হেনরি ফোর্ড-এর জীবনটা গচ্ছিৎ রাখার মত উপযুক্ত বৈমানিকের সাক্ষাৎ এতদিন পাইনি—

সৌজন্য বোধে চার্লস লিণ্ডবার্গ নীরব রইলেন। এবার হেনরি ফোর্ড নিজেই হেসে বললেন, এ যুক্তিটাও এখন টেকসই নয়, কি বলেন? যখন তেমন একজন বৈমানিকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, স্নুতরাং—

হ্যাঁ, লিণ্ডিব সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ধনকুবের হেনরি ফোড-এর জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হল। জীবনে প্রথম পৃথিবী ছেড়ে আকাশে উড়লেন।

॥ একুশ ॥

শুরু হল নতুন অধ্যায়। ডেট্রয়েটে 'উইলো রান বমার প্ল্যাণ্ট' কারখানায় প্রযুক্তি-পরামর্শদাতা হিসাবে যোগদান করলেন চার্লস লিণ্ডবার্গ, মাসিক ৬৬৬ ডলারে—ধরুন মাসিক পাঁচ-সাড়ে-পাঁচ হাজার টাকায়। ওঁর মতো বিশেষজ্ঞের পক্ষে মাহিনাটা খুব বেশী নয়, তবে মনে রাখতে হবে ঘটনা চল্লিশের দশকের—টাকার দাম তখন অনেক বেশী, আজকের তুলনায়। ওঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতেন ফোর্ড-সাহেবের যুগল দক্ষিণ হস্ত—হ্যারী বেনেট এবং চার্লস সোরেনসেন। সেই দুজন সহকারীকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করাতে লিণ্ডবার্গের জীবনীকার দুটি বিশেষণ যুক্ত করেছেন, যা প্রণিধান-যোগ্য। বেনেট প্রসঙ্গে বলেছেন 'Villain of some of the bloodiest anti-union battles in the history of American industry' [আমেরিকার শ্রমিক ইতিহাসে য়ুনিয়ান-বিরোধী কয়েকটি রক্তস্রাবী সংগ্রামের কুখ্যাত গুণ্ডা] এবং সোরেনসেন সম্বন্ধে বলেছেন 'a mass-production expert who ate nuts and botls, and inefficient workman for breakfast' [ব্যাপক উৎপাদনের বিষয়ে অভিজ্ঞ এক ধুরন্ধর, যিনি প্রাতরাশের টেবিলে কড়মড় করে চিবিয়ে খেতেন—নাট, বোল্ট, এবং অকর্মণ্য শ্রমিকের মুণ্ডু!]

এমন পরিবেশে অধূমপায়ী, অমদ্যপায়ী, শ্রমিক-দরদী সেই বিমান বিশেষজ্ঞটি কী-ভাবে কাজ করতেন জানতে কৌতূহল হয়। দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন—'ফোর্ডের কারখানায় যেন সেই স্কুলের জীবনে ফিরে গেলাম। সবাই উদ্দাম, প্রাণচঞ্চল—ডিজাইনই বল,

হিসাব-নিকাশই বল, অথবা এয়ারো-ডাইনামিক্সের অঙ্কই বল—এক দফা হাতাহাতি না হলে কোন প্রতর্কের মীমাংসাই হয় না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন সাজ সাজ রব পড়ে গেল কারখানায়। কী ব্যাপার? শোনা গেল, স্বয়ং ফ্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট কারখানা পরিদর্শনে আসছেন! খানদানী ব্যবস্থা—হোস্ট: স্বয়ং হেনরি ফোর্ড, প্রধান অতিথি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এলাহী কাণ্ড! সমস্ত কারখানার সেদিন একটিমাত্র কর্মী অনুপস্থিত—সে নাকি আছে 'ক্যাসুয়াল লীভ'-এ। কোম্পানির প্রধান উপদেষ্টা: চার্লস লিণ্ডি!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একদিন কারখানা থেকে বার হয়ে এল নতুন জাতের জঙ্গী বিমান: Corsair.

ততদিনে প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধ রীতিমত ঘনিয়ে উঠেছে। জাপান ক্রমাগত জিতছে। মালয়, বর্মা, ইন্দোচীন, জাভা, বোর্নিও সব হাত ছাড়া হয়ে গেছে। মিত্রপক্ষ ক্রমাগত পিছু হটছে। ফোর্ড-সাহেবের কারখানায় তৈরী নতুন জাতের ফাইটার ও বোমারু বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে রওনা দিল সেই প্রশান্ত মহাসাগরের রণাঙ্গনে।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রিপোর্ট আসতে শুরু করল। না! যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, তা হয়নি। পেট্রোল বেশি খরচ হচ্ছে, জাপানি ফাইটার প্লেন ওদের সহজেই কাবু করে ফেলছে। ব্যাপার কি? ত্রুটি কোথায়? ফোর্ড-সাহেবের বিমান বিশেষজ্ঞ দেখা করতে এলেন নিউইয়র্কে সামরিক-উপদেষ্টার সঙ্গে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লুই. ই. উড। একান্ত গোপন সাক্ষাৎকার।

রিপোর্টগুলি উল্টে-পাল্টে দেখে লিণ্ডবার্গ বললেন, না! আপনাদের ভুল হচ্ছে। ত্রুটি বিমানের নয়, বৈমানিকের। যন্ত্রটা ঠিকমত বাবহার করা হচ্ছে না!

ভ্রূ-কুঞ্চিত হল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উড-এর। বলেন, তার মানে? বুঝিয়ে বলুন? বৈমানিকের কী ত্রুটি?

লিণ্ডবার্গ অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, বুঝিয়ে আবার কী বলব ? এ কি অঙ্ক যে, হিসাবের ভুলটা আঁক কষে বুঝিয়ে দেব ? এ বুঝিয়ে দেখাতে হলে প্লেন চালিয়ে দেখাতে হয়। আপনার কোন দক্ষ বৈমানিককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন—আমি প্লেনটা চালিয়ে তাকে ভুলটা সমঝিয়ে দেব—

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্রিগেডিয়ার বলেন, কিন্তু এখানে একটা লোককে বুঝিয়ে দিলে কী লাভ ? তার সেই জ্ঞান প্রশান্ত মহাসাগরের রণাঙ্গনে আমরা প্রেরণ করব কীভাবে ?

: তাহলে এখানে একটা ট্রেনিং য়ুনিট খুলুন। আমি ব্যাচ-বাই-ব্যাচ ওদের শিখিয়ে দেব।

: তার চেয়ে ঐ শিক্ষণ-শিবিরটা প্রশান্ত মহাসাগরের রণাঙ্গনে হলে ভাল হত না ?

: নিশ্চয় হত ; কিন্তু আমি তো 'সার্ভিসে' নেই। আমাকে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে যেতে দেবে কে ?

: যদি বলি—আমি ?

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন লিণ্ডবার্গ। তারপর বলেন, বুঝলাম না। আপনি কী জানেন না হোয়াইট-হাউসের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?

: জানি ! অতবড় খবরটা না জেনেই কি এ প্রস্তাব দিচ্ছি ?

: তাহলে ? আপনি কি ভাবছেন—হোয়াইট-হাউস আমাকে রণাঙ্গনে যেতে অনুমতি দেবে ? সমরক্ষেত্রে বিমান চালাতে ?

: না, অনুমতি দেবে না ! আপনাকে আমেরিকান ভূ-খণ্ডের বাইরে যাবার পাসপোর্টই দেবে না।

: তাহলে ওসব কথা কেন বলছেন ?

: বলছি এজন্য যে—হোয়াইট-হাউস জানতেও পারবে না !

স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন, লুক হিয়ার জেনারেল—

আপনি কি বলতে চাইছেন—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অজ্ঞাতে, যুদ্ধ-মন্ত্রকের অজ্ঞাতে আমাকে গোপনে যুদ্ধক্ষেত্রে পাচার করতে চান ?

: ইয়েস্।

: ধরা পড়লে শুধু আমার নয়, আপনার কি পরিণাম হবে তা জানেন ?

: মিস্টার লিণ্ডবার্গ ! আমি একটা বাহিনীর জেনারেল—রাস্তার চ্যাংড়া ছোঁড়া নই। পূর্বাপর না ভেবে আমি কাজ করি না। না—প্রেসিডেন্টের সম্মতি নেই এ ব্যবস্থায়। তিনি জানেনই না · কিন্তু পরিকল্পনাটা যাঁর মস্তিষ্ক থেকে বার হয়েছে তাঁর ক্ষমতা আমেরিকায় কারও চেয়ে কম নয়। তিনি বলেছেন এ ব্যবস্থা করতে—সব দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন সেই ছোট্টখাট্ট মানুষটি : হেনরি ফোর্ড!

১৪শে এপ্রিল ১৯৪৪। ক্যালিফোর্নিয়ার নর্থ-আইল্যাণ্ড বেস থেকে গোপনে রওনা হল একটি ডগল্যাস DC-৩ প্লেন। বিমান চালকের পরিধানে সামরিক পোশাক, যদিও তাঁর কাঁধে র‍্যাঙ্ক-এর পরিচয় নেই। সঙ্গে একটা হ্যাভারস্যাক, তাতে ওঁর নিজস্ব জিনিস-পত্র—জামা-কাপড়, বাড়তি য়ুনিফর্ম, টুথব্রাশ, পেস্ট, দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম, কিছু বই, বাইবেল, চকলেট বার—কী নেই ? হ্যাঁ, নেই শুধু একটি জিনিস—বৈমানিকের পরিচয়। আইডেন্টিটি কার্ড।

চার মাস আছেন সাউথ প্যাসিফিকে। পরিচয় ট্রেনার। দাড়ি-গোঁফ রেখেছেন—এ চেহারায় সহজে তাঁকে কেউ চিনবে না। ঐ সময় দিনপঞ্জিকার একটি পঙ্‌ক্তিতে পাই তাঁর পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিত : I used to go out on pigion shoots with the pilots after aperation, but found myself bird-watching instead of using my gun. [বৈমানিকদের নিয়ে কাজের অবকাশে বুনো-পায়রা শিকার করতে প্রায়ই যেতাম ; কিন্তু মনে

আছে, বন্দুক চালানোর বদলে চুপচাপ পাখ-পাখালির জীবন দেখতেই ভাল লাগতো।]

২১শে মে গ্রীন আইল্যাণ্ডে তিনি অফিসার্স মেস-এ ডিনার টেবিলে একজন ফ্লাইট কমাণ্ডারকে কথাচ্ছলে বললেন, প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে আমার প্লেন কী-ভাবে কাজ করছে তা দেখতে পারলে হত। কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

ব্যবস্থা করা গেল। পরদিন এক ঝাঁক বোমারু বিমান যাচ্ছে জাপান অধিকৃত 'রাবাউল' দ্বীপে বোমা-বর্ষণের শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে, চারটি 'করসেয়ার' ফাইটার প্লেনের ছত্রচ্ছায়ায়। সেনাপতির নির্দেশে তার একটি চালিয়ে নিয়ে গেলেন সিভিলিয়ান লিণ্ডবার্গ। যাত্রা-মুহূর্তে সেনাপতি সাবধান করে দিলেন, আপনি সামরিক-বাহিনীর লোক নন, আপনি শুধু পরিচালক। স্বয়ং মেশিনগান চালাবেন না যেন। ভোর রাত্রে নিরাপদে ফিরে এল সব কয়টি বিমান। সেনাপতি ঐ বেসামরিক মানুষটিকে ডেকে জনান্তিকে প্রশ্ন করেন, মেশিনগান চালানোব প্রয়োজন নিশ্চয় হয়নি!

: নিশ্চয় হয়েছিল!

: বলেন কি! কীভাবে?

: জাপ-বেটারা বোধহয় চিনতে পারেনি যে এটার চালক জঙ্গী নয়—ওদের দোষ দিতে পারি না! শুনুন, কি হয়েছিল বলি—

বাধা দিয়ে এয়ার-কমাণ্ডার বলেন, থাক মিস্টার লিণ্ডবার্গ! ওটা না জানাই আমার পক্ষে মঙ্গল! আমি ধরে নেব, আপনি সামরিক বিমান চালিয়েছেন বটে তবে বন্দুক চালাননি। ওটা জানার পরেও ··বুঝলেন না·· ?

বহু-বহুদিন পরে লিণ্ডি-স্মাইল ফিরে এল চল্লিশোর্ধ্ব মানুষটির মুখে: বুঝেছি!

ঐ সময়ের একটি ঘটনার বর্ণনা পাচ্ছি ওঁর দিনলিপিতে। দু-দিন

পরের কথা। আবার যেতে হয়েছিল তাঁকে, বৈমানিকদের বুঝিয়ে দিতে। 'নিউ আয়ারল্যাণ্ড' দ্বীপের কাছে সমুদ্রতীরে দেখতে পেলেন একটি জাপ-সৈনিক একা সমুদ্র স্নান করছে। সমুদ্রতীর সম্পূর্ণ নির্জন —ত্রিসীমানায় লোকজন নেই। সৈনিকটি তার জামা-কাপড় খুলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে নগ্ন স্নান করছে। হঠাৎ আকাশ ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা ফাইটার প্লেন। লোকটা চোখ তুলে তাকালো। নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতে থাকে। ঈগলপাখির মতো সোঁ করে নেমে এল লিণ্ডবার্গের প্লেনটা—লোকটার দূরত্ব হাজার গজও হবে না। অব্যর্থ লক্ষ্যে মেশিনগানটা তাক্ করলেন। তারপর কি জানি কেন ট্রিগার থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন। প্লেনটা মিলিয়ে গেল নীল আকাশে—হত্যা উৎসবে না মেতেই। দিনান্তে দিনপঞ্জীতে লিণ্ডবার্গ লিখছেন :

"I shall never know who he was—Jap or native. But I realize that the life of this unknown stranger —probably an enemy—is worth a thousand times more to me than his death. I should never forgive myself if I had shot him—naked, courageous, defenceless, yet so unmistakably a man.'

[আমি কোনদিন জানতে পারব না লোকটা কে ছিল—জাপানী না স্থানীয় আদিবাসী। কিন্তু অনুভব করলাম, ঐ অজ্ঞাত মানুষটার—হয়তো সে শত্রুপক্ষের—জীবন আমার কাছে তার মৃত্যুর চেয়ে সহস্রগুণ মূল্যবান। ওকে যদি সেই মুহূর্তে হত্যা করতাম তাহলে সারাজীবনে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না। একটা নগ্ন, দুঃসাহসী, আত্মরক্ষায় অপারগ মানুষ—কিন্তু সন্দেহাতীতরূপে সে মানুষই।]

কানাঘুষায় খবরটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল পূর্ব-রণাঙ্গনের হেড-কোয়ার্টারে—স্বয়ং জেনারেল ম্যাক আর্থারের দপ্তরে। কে ঐ অজ্ঞাত-

নামা বিমান শিক্ষক? বৈমানিকদের মধ্যে এত কিসের গুজগুজ-ফুস্‌ফুস? তলব পড়ল তাঁর। চার্লস অগস্টাস্ লিণ্ডবার্গকে হাজিরা দিতে হল ব্রিস্‌বেনে, পূর্ব-রণাঙ্গনের সদর দপ্তরে।

দর্শনমাত্র জেনারেল ম্যাক আর্থার ওঁকে চিনতে পারলেন। কিভাবে উনি এসেছেন তা ধৈর্য ধরে শুনলেন। শেষে বললেন, কর্নেল,* ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক! আপনি যদি মারা যান তাহলে আমাদের কোনও কৈফিয়ত থাকবে না। যদি বাধ্য হয়ে প্যারাশুট ল্যাণ্ডিং-এ শত্রু-সীমানায় অবতরণ করতে হয় তাহলে আপনি 'বন্দী' হিসাবে ব্যবহার আশা করতে পারেন না—যেহেতু আপনি সামরিক অফিসারই নন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে অথবা আমাদের বাঁচাতে পারবে না—স্বয়ং হেনরি ফোর্ডও নন!

: আপনি কি তাহলে আমাকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন?

অশান্তভাবে মাথা নাড়েন জেনারেল ম্যাক আর্থার: তাই বা বলি কোন্ আক্কেলে? আপনি আসাব পর বৈমানিক-মহলেব চেহারাটাই যে পালটে গেছে তা—আমি সেনাপতি—আমি কি বুঝি না বলতে চান?

: তাহলে?

: দেখি ভেবে!

হিসাবে দেখছি, ১৭৯ ঘণ্টা তিনি বিমানযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, পঞ্চাশটি ডগ্-ফাইটে। একাধিক শত্রুবিমান ভূপতিত করেছেন। ২৮শে জুলাই একটি বড় জাতের আকাশযুদ্ধে তাঁকে অংশ নিতে হয়—অল্পের জন্য বেঁচে যান। উনি আসার আগে ফাইটার-বিমানের রেঞ্জ ছিল ৫৭০ মাইল; ওঁর পরামর্শমত কাজ করায় সেটা বেড়ে গিয়ে হল ৭০০ মাইল। যুদ্ধের গতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল।

* লিণ্ডবার্গ এখন 'কর্নেল' নন, কিন্তু ঐ নামেই তাঁকে ম্যাক আর্থার সম্বোধন করেছেন দেখছি।

ম্যাক আর্থার আর ঝুঁকি নিতে সাহস পেলেন না। হোয়াইট-হাউস আজও জানে না বে-সামরিক চার্লস লিণ্ডবার্গ এখানে যুদ্ধ করছেন! বাধ্য হয়ে ওঁকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আশ্চর্য! ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে এল সাংবাদিকের দল, অনেকদিন বাইরে ছিলেন স্যার, কোথায় ছিলেন এতদিন?

: নো কমেণ্টস্!

: এ কথা কি সত্য যে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে জেনারেল ম্যাক আর্থারের সঙ্গে···

: নো কমেণ্টস্!

যবনিকপাত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে—ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট মারা যাওয়ায়।

॥ বাইশ ॥

১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪—দীর্ঘ ২৯ বৎসর !

চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গের জীবনের এই শেষ পর্যায়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করছি না—তাতে নাটকীয়তার অবদান অল্প—সেটা বিপ্লব নয়, বিবর্তন ; রেভলিশন নয়, এভলিউশান ! সে-কাহিনী রচনার ভিন্ন সুর, সে-কাহিনী পড়ার অন্য মেজাজ। তাই কিছু ইঙ্গিত দিয়েই যবনিকাপাত করব :

শুধু দেহে নয়, মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে—জীবনের মূল্য-বোধই যেন পরিবর্তিত।

যুদ্ধান্তে রণবিধ্বস্ত জার্মানীতে আবার এলেন। বোমা-বিধ্বস্ত বিমান-কারখানায় এসে কেমন যেন একটা নির্বেদ আচ্ছন্ন করল তাঁকে —এখানেই ১৯৩৮ সালে দেখেছিলেন হাজার হাজার নিয়মনিষ্ঠকর্মী, জার্মান-যুবকদের চোখে বিশ্বজয়ের বাসনা ! আজ তা শ্মশান ! দিনপঞ্জীতে লিখলেন, যুদ্ধ মানুষের জীবনের মূল্যবোধটাই পাল্‌টে দিয়ে গেছে—মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে শিখেছে, ভালবাসা ভুলে গেছে ! এ ভাঙা শহর আবার গড়ে উঠ্‌বে, কিন্তু প্রাকযুদ্ধ সেই ভালবাসাটাকে কি পুনরুজ্জীবিত করতে পারব আমরা ?

বিমান-নির্মাণ সংস্থাগুলির পরামর্শদাতার কাজ থেকে অব্যাহতি পাননি, কিন্তু ঝুঁকেছেন অন্যান্য দিকে—আকাশ নয়, মেদিনীর দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি এবার। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, ক্যামেরা কাঁধে—বন্দুক ব্যবহার করেন না, বন্যজীবনের ছবি তুলে বেড়ান। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ-সংস্থার এক কর্ণধার হয়ে পড়লেন লিণ্ডবার্গ। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান—যে সব প্রাণী মানুষের অত্যাচারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে

তাদের রক্ষা করতে হবে! তাই জঙ্গলে জঙ্গলে জীবন কাটে। বাড়িতে ফিরে আসেন যখন তখন সেখানেও দেখেন অরণ্যের স্তব্ধতা! ছয়টি সন্তানের জননী অ্যান এখন বৃদ্ধা। প্রথম সন্তানটির অকাল-মৃত্যুর কথা ভুলতে পেরেছিলেন কিনা বোঝা যায় না, তার প্রথম জন্মদিনের একটি ফটোগ্রাফ টাঙানো আছে অ্যানের ঘরে। টেবিলের উপর বার্থ-ডে-কেকের উপর একটিমাত্র মোমবাতিতে জ্বলছে জীবন-প্রদীপ—চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ জুনিয়ার বাড়িয়ে দিয়েছে বাঁ-হাতটা কেক-এর দিকে। প্রথম সন্তানের ঐ ফটোখানাই আছে মায়ের কাছে—বাদ বাকি পাঁচটি সন্তান থাকে অন্যত্র। জন বিয়ে করেছে, সে এখন সমুদ্রবিদ—'ওশানোগ্রাফার'। ল্যাণ্ড বিয়ে করেছে তার সহপাঠিনীকে, মনটানায় খামার বাড়িতে চাষবাস নিয়ে আছে। অ্যান—প্রথম কন্যাও বিবাহিত, থাকে তার ফরাসী-স্বামীর বাড়িতে। স্কট আছে ইউরোপে, তার বউ ফরাসী চিত্রকর। শেষ সন্তান রীভ অবশ্য অবিবাহিতা, কিন্তু সেও বাড়িতে বড় একটা থাকে না। মায়ের মত সেও সাহিত্যসেবা করে, বাইরে বাইরেই কাটায়।

বুড়ো-বুড়ি তাই একা। বুড়ো মেতে আছে গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি নিয়ে; বুড়ি বই নিয়ে। ক্রমে আবার সক্রিয় জীবনে ফিরে এলেন লিণ্ডবার্গ—নিখিলবিশ্ব সংস্থাগুলির সভা থেকে কর্ণধার হয়ে ওঠেন—বন্যজন্তু সংরক্ষণ, সামুদ্রিকজীব সংরক্ষণ, আবহাওয়া দূষিত যাতে না হয় তার সংস্থা, নানান জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। শুরু হল ছোটাছুটি, লেখা-লেখি, মিটিং-সেমিনার-লেকচার।

মিসেস্ লিণ্ডবার্গ লিখছেন: "I have not seen Charles so happy or excited for years. He is enjoying himself as much as he did when he flew his first airplane. His whole outlook has changed too (1955)." [চার্লসকে এতটা খুশিয়াল, এতটা উত্তেজিত হতে কখনও দেখিনি। প্রথমবার বিমান চালনায় সে যেমন উৎফুল্ল হয়েছিল এখনও যেন তেমনভাবেই

জীবনকে ভোগ করছে। ওর জীবনদর্শনের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে (১৯২৭)।]

একবার আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সালামির আমন্ত্রণে কেনিয়াতে গিয়ে শুনলেন ফিলিমানজেরোর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একজন শিকারী গণ্ডারের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। নিমন্ত্রণ খাওয়া মাথায় উঠল। রাজার একটি প্লেন নিয়ে উড়ে গেলেন অকুস্থলে। সঙ্গে চিকিৎসক ডক্টর মাইকেল উড্। দেখা গেল গণ্ডারে শিকারীর পেট ফুটো করে দিয়েছে। তাঁবুতে লণ্ঠনের আলোয় ডক্টর উড্ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন, ক্ষতস্থান সেলাই করে দিলেন ; রুগীটি প্রাণে বেঁচে গেল। ডক্টর উড্ তখন একটা রাইফেল ঝুলিয়ে নিলেন নিজের কাঁধে, লিণ্ডবার্গের দিকে আর একটি রাইফেল বাড়িয়ে ধরে বললেন, একটা কর্তব্য শেষ হয়েছে, এবার দ্বিতীয়টা সারতে হবে। চলুন, এবার সেই গণ্ডারটাকে শেষ করব। আপনি তো বিখ্যাত শিকারী !

লিণ্ডবার্গ জবাবে বলেছিলেন, I' ve changed my mind. If would just be an eye for an eye, and a tooth for a tooth and I gave that up after World War II. [আমার মন বদলে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐ মন্ত্রটাকে আমি পরিহার করে চলি—ঐ যাকে আপনারা বলেন : দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।]

সত্যিই অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। দিন পঞ্জিকায় লিখছেন, "Lying under an acaciatree, with the sounds of dawn around me, I realized more clearly, in fact, what man should never overlook : that the construction of an airplane, for instance, is simple when compared with the evolutionery achievement of a bird, that airplanes depend upon advanced civilization,

and that were civilization is most advanced, few birds exist···I realized that if I had to choose, I would rather have birds than airplanes." [সেদিন সেই অরণ্যে বাব্‌লা-গাছের নিচে রাত্রিযাপনের শেষে যখন উষালগ্নের কাকলিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন পরিষ্কারভাবে অনুভব করলাম এক নূতন জীবন-সত্য—যা মানুষের ভোলা উচিত নয় : বিবর্তনের জটিল পথে একটা পাখির যা সাফল্য তার তুলনায় এয়ারোপ্লেন-তৈরী অকিঞ্চিৎকর। এয়ারোপ্লেন তো অত্যুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল—আর সেই প্রযুক্তিবিদ্যা যে যে এলাকায় এগিয়ে গেছে সেই সেই অঞ্চলে পাখির দল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ··আমি সিদ্ধান্তে এলাম . আমাকে যদি বেছে নিতে বলা হয়, তবে বলব—এ দুনিয়ায় বরং পাখিই থাকুক, এয়ারোপ্লেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।]

কর্নেল লিণ্ডবার্গ—না 'কর্নেল' নন, 'জেনারেল' লিণ্ডবার্গ—হ্যাঁ, যুদ্ধান্তে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে—তখনও নভশ্চর-সংস্থার পরামর্শদাতা। ১৯২৩ সালে হঠাৎ পেলেন এক জরুরী আমন্ত্রণ—প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন তাঁকে একটি ভোজসভায় উপস্থিত থাকতে নিমন্ত্রণ করছেন। চন্দ্র-অভিযাত্রীদের রওনা হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেণ্ট-আয়োজিত ভোজসভা। লিণ্ডবার্গ সস্ত্রীক যোগ দিলেন এবং কেপ্-কেনেডি থেকে যেদিন মনুষ্যবাহী প্রথম রকেট রওনা হল সেদিন বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

এগুলো বাধ্য হয়ে, কিছুটা লোকলজ্জায় তাঁকে করতে হত। তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র ছিল অন্যত্র—তিনি আলাস্কায় ছুটে গেলেন শ্বেতভল্লুক হত্যা উৎসব বন্ধ করতে, জাভা দ্বীপে উড়ে গেলেন এক সিংওয়ালা গণ্ডার হত্যা উৎসব বন্ধ করতে, নীল-তিমি শিকার স্থগিত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

নভশ্চর মাইকেল কলিন্স এসেছিলেন লিণ্ডবার্গের কাছে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা "Carrying the Fire." গ্রন্থের ভূমিকা লেখাতে।

লিখে দিলেন, আর বললেন, তুমি এমন একটি নির্জনতার মুখোমুখি হয়েছ যা মানবসভ্যতায় কেউ কখনও হয়নি। তাই হয়তো জীবনসত্যকে নির্জনে বুঝে নেবার সুযোগ তুমিই প্রথম পেলে।

ইতিমধ্যে আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। ওঁর এক বন্ধু হ্যারিসন একবার ওঁকে এসে বলল, ফিলিপাইন দ্বীপের তামাক'র কথা।

'তামাক' এক জাতের বন্যমহিষ। ফিলিপাইন দ্বীপের জঙ্গলে তাদের পাওয়া যায়—অর্থাৎ যেত। জীববিজ্ঞানী হ্যারিসন বললেন, হয় তো এখনও কয়েক শ' তামাক আছে ঐ জঙ্গলে। তবে যে-হারে তাদের হত্যা করা হচ্ছে, তাতে আর বছর দশ-পনের পরে তারা মরিশাসেব ডেকো-পাখির সগোত্র হয়ে যাবে।

চঞ্চল হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ লিণ্ডবার্গ : ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট কিছু করতে পারেন না ?

: তিনি শিক্ষিত। আধুনিকমনা। চেষ্টাও করছেন। পারছেন না। আসলে জনমত গঠন করে উঠ্‌তে পারছি না আমরা !

উঠে বসলেন লিণ্ডবার্গ ইজিচেয়ার থেকে। বললেন, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি নিজে যাব। যেমন করে হোক এ সর্বনাশ ঠেকাতে হবে।

পাগলকে রোখা গেল না। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে লিণ্ডবার্গ এলেন ফিলিপাইন দ্বীপে। তাঁর এ অভিযানের কথা ছাপা হল সব কাগজে—পৃথিবীর সর্বত্র। ফলে রাতারাতি জনমত তৈরী হয়ে গেল। ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল লিণ্ডবার্গের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন। বন্ধ হল 'তামারু'-হত্যা। কে জানে এজন্যই ইতিহাস আগামী শতাব্দীতে চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গকে মনে রাখবে কিনা।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট বললেন, আপনাকে তাহলে আরও একটি কথা বলি। আমার এই দ্বীপে একটি জাতি আছে—তাদের

নাম 'তামাদে'। আদিম নিগ্রয়েড আদিবাসী—বিশ-পঁচিশ হাজার বছর আগে ওরা নাকি আফ্রিকা-অঞ্চল থেকে এই দ্বীপে আসে। সংখ্যায় ওরা ছিল অনেক, বর্তমানে 'মিন্দানাও' দ্বীপে মাত্র কয়েক শ' ঘর আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, আগুনের ব্যবহার জানে, ধাতুর ব্যবহার জানে না। আশপাশের উন্নত গ্রামবাসীর অত্যাচারে এই অসভ্য-জাতটাও জীবন-সংগ্রামে শেষ হয়ে যেতে বসেছে।

দুরন্ত কৌতূহল হল লিণ্ডবার্গের। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন, এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

তাই করেছিলেন। বস্তুত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বলা যায়।

১৯৭৩ সালে ওঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। শরৎকাল-নাগাদ। ফিরতে হল নিউ ইয়র্কে। ১০৪° ডিগ্রি জ্বর নিয়ে। ভর্তি করা হল নিউ-ইয়র্কের হাসপাতালে। দু-সপ্তাহ পবে নানানরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এলেন ডাক্তারবাবুরা। বৃদ্ধা মিসেস্ অ্যান লিণ্ডবার্গকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, আমরা দুঃখিত ম্যাডাম। উনি এখন চিকিৎসার বাইরে! ক্যান্সার! মাস ছয়েক বাঁচতে পারেন!

অ্যান লিণ্ডবার্গ জবাব দিতে পারেন নি।

ডাক্তারবাবু বলেন, আমার মনে হয়, এ-কথাটা ওঁকে না জানানোই ভাল। যে কদিন বাঁচবেন আনন্দেই থাকুন না কেন?

মাথা নাড়লেন অ্যান। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে কয়েক মুহূর্ত নীরবে সামলে নিলেন। তারপর বললেন, মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। তা হবে না। আমি জীবনে ওর কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করিনি। আর···তাছাড়া, আমি ওকে চিনি! এ খবরটা শুনলেও ও ভেঙে পড়বে না। বরং ওর যা বাকি কাজ তা মাস ছয়েকে শেষ করে যেতে পারবে!

অনুমতি দিলেন ডাক্তারবাবু: বেশ! যা ভালো বোঝেন করুন!

নিদারুণ সংবাদটা দেওয়া হল মৃত্যুপথযাত্রীকে। তৎক্ষণাৎ ফুটে

উঠ্‌ল ওঁর মুখে—অনেক-অনেকদিন আগে—সেই যুদ্ধের আমলে হারিয়ে-যাওয়া লিণ্ডি-স্মাইল। বললেন, খুব ভাল করেছ খবরটা বলে! তুমি তো জান, 'প্ল্যান' না করে আমি কখনও 'ফ্লাই' করি না! ছয় মাস যথেষ্ট সময়—এর মধ্যে গুছিয়ে নিতে পারব। তুমি ভেঙে পড়নি তো?

সাদা-চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে অ্যান জানালেন, তিনি স্বাভাবিক।

: আমার একটা শেষ অনুরোধ রাখবে?

: বল!

: Let me accept the inevitable in my own way! [অনিবার্য পরিণামটাকে আমার ইচ্ছামত গ্রহণ করার সুযোগ দাও।]

: কী বলতে চাইছ তুমি!

: ছেলেমেয়েদের খবর দাও! ওরা আসুক—একটা বিদায় ভোজ দাও। তারপর আমি একটা প্লেন নিয়ে রওনা হব—সমুদ্রের উপর—রেডিওতে আমার কণ্ঠস্বর শুনবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত! পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে অতলান্তিকে মিশে যাব—অতলান্তিক! সেই ১৯২৭ থেকে সে আমাকে ডাকছে!

দু-হাতে মুখ ঢেকে অ্যান দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়েন। এ ব্যবস্থায় তিনি রাজী নন!

অগত্যা বিকল্প ব্যবস্থা হল। লিণ্ডবার্গ চান না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে তিনি যাবেন সেই সুদূর ফিলিপাইন দ্বীপে—সেই তামাদে-গ্রামে! এ প্রস্তাবে রাজী হলেন অ্যান। ব্যবস্থা হল।

দুই মেয়ে এসে দেখা করে গেল। তিন ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন একে একে। ল্যাণ্ড খবরটা শুনে ছুটে এল। কারও কথা শুনল না, বাবা-মার সঙ্গে সেও যাবে হাওয়াই পর্যন্ত। লিণ্ডবার্গ

মার্কিন ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়ার আগে একবার নিউ ইয়র্কের সেই বিখ্যাত সংগ্রহশালায়—যেখানে প্রকাণ্ড হলে পাশাপাশি ঝুলছে তিন যুগের তিন প্রতিভূ—১৭.১২.১৯০৩ তারিখের স্মৃতি-বিজড়িত রাইট-ব্রাদার্সের প্রথম প্লেন 'ফ্লায়ার'। · তারিখের প্রথম শব্দভেদী বিমান 'কঁকড', এবং দুইয়ের মাঝখানে ২০.৫.১৯১৭-এর স্মৃতিমণ্ডিত 'দ্য স্পিরিট অব সেণ্ট লুই'। পলকহীন দৃষ্টিতে লিণ্ডবার্গ দেখলেন—ঐ থ্রি-মার্সেটিয়ার্সকে। মাথার টুপি খুলে তিনজনের কাছেই বিদায় নিলেন!

*　　　*　　　*

২৫শে আগস্ট ১৯৭৪। প্রশান্ত মহাসাগরের এক অখ্যাত দ্বীপে অনাড়ম্বর শয্যায় শুয়ে আছেন সেই বৃদ্ধ মানুষটি। পাশের টিপয়ে অসমাপ্ত আত্মজীবনী : An Autobiography of Values। ঘরে উপস্থিত শুধু ওঁর ধর্মপত্নী, স্থানীয় চিকিৎসক, আর পাদরী রেভারেণ্ট জন চিঞ্চার। স্থানীয় ছেলেরা ইউক্যালিপটাস্ কাঠের একটি কফিন বানিয়ে রেখেছে—সেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা আছে। গ্রামবাসীরাও অনেকে এসেছে—ভিড় করেনি, আছে দূরে দূরে, ছিটিয়ে ছড়িয়ে। ক্যামেরাধারী কোন সাংবাদিক নেই!

সন্ধ্যাবেলায় অবস্থা খারাপের দিকে গেল।

তখনও জ্ঞান আছে। হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন অ্যানকে। হাতটা টেনে নিলেন। অস্ফুটে বললেন, ওরা যদি মৃতদেহটা আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়, তুমি আপত্তি কর, কেমন? আর · আর কবরটা যেন গাছের ছায়ায় না হয়, একেবারে খোলা-আকাশের তলায়।···আকাশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে!

অ্যান নীরবে চোখ দুটি বন্ধ করলেন।

এর পরেই বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

পরদিন সকাল ৭. ১৫ মিনিটে 'টেক্-অফ্' করলেন তিনি! শেষ যাত্রায়!

চার্লস অগস্টাস লিণ্ডবার্গ জীবনে অনেক ভুল করেছেন—বৈমানিক হিসাবে কখনও ভুল করেননি। এই শেষযাত্রাতেও একক বৈমানিক নির্ভুল 'পাইলটিং' করলেন। মহাসমুদ্র তিনি এবারও নিরাপদে অতিক্রম করেছিলেন—এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য—তফাত এই খবরটা আজও আমরা জানি।